নিষিদ্ধ প্রান্তর

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

দ্বিতীয় সংস্করণ : মে, ১৯৬৪

প্রকাশক :
শ্রীপরাণচন্দ্র মণ্ডল
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট্
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস
বাণীরূপা প্রেস
৯এ, মনমোহন বসু স্ট্রীট্
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ : সুবোধ দাশগুপ্ত

এটি নিছক একটি উপন্যাস। সমাজের প্রতি কোন বিশেষ বক্তব্য বা প্রস্তাব উত্থাপনের উদ্দেশ্যে লেখা হয়নি। কোন ধর্ম বা সম্প্রদায়ের সমালোচনা করা কিংবা তাঁদের মানসিকতা ও আচরণের প্রতি কটাক্ষ করাও এর অভিপ্রেত নয়। তবু যদি বাস্তব জীবনকে যথাযথভাবে প্রতিফলিত করতে গিয়ে কোথাও কারো মনে অজ্ঞাতসারে আঘাত দিয়ে থাকি, তাঁরা সেটা আমার নিতান্ত মূর্খতা জেনে ক্ষমা করবেন। ব্যক্তিগত ভাবে সকল ধর্ম এবং সম্প্রদায়ের প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল।

লেখক

দলিলউদ্দীন আহ্মদ

সবিতা আহ্মদ

করকমলেষু

…আপনি কিন্তু কোন মুসলিম মেয়ের কথা লেখেননি!

…হ্যাঁ, লিখিনি। তবে—

…কেন লেখেননি? মুসলিম মেয়েরা আপনার মনে কোন দাগ কাটেনি বুঝি? নাকি মনে করেন ওরা এত তুচ্ছ, এত সাধারণ, এত সরল আর বোকাহাবা যে ওদের নিয়ে কোন সাহিত্যই সৃষ্টি হতে পারে না।

…না, না। তা কেন?

…বুঝেছি মশাই, বুঝেছি। ওদের কথা লিখলে এ পোড়া বাংলাদেশের কারো মনে কোন দাগ কাটবে না, ভেবেছেন। ধরে নিয়েছেন ওরা মেয়ে হলেও ঠিক নায়িকা হবার মতো মেয়ে নয়।

…দেখুন, আপনি মিথ্যে আমার বা বাঙালী পাঠক-পাঠিকাদের বদনাম দিচ্ছেন। আসলে ব্যাপারটা কি জানেন? আজঅব্দি খুবই কম মুসলিম মেয়ের সঙ্গে মিশবার সুযোগ আমি পেয়েছি। আপনি তো ভালই জানেন, ওঁরা সচরাচর পর্দানসীনা। আত্মীয় পুরুষের সাথে মেলামেশা করতেও ওঁদের পারিবারিক এবং সামাজিক বাধা রয়েছে। আর—

…থামুন! একজন আধুনিক লেখক বলে আপনি নিজের বড়াই করেন অথচ আপনি অন্ধ। বর্তমান সময়ের অনেক বড় ঘটনা আপনার চোখ এড়িয়ে যায়। আজকাল অজস্র মুসলিম মেয়ে লেখাপড়া শিখছে, চাকরী করছে, বা বাইরে সমাজে নিঃসঙ্কোচে ছড়িয়ে পড়ছে। তারা হিন্দু মেয়েদের মতোই সুযোগ পেলে ছেলেদের সঙ্গে প্রেম-ভালবাসার জালেও জড়িয়ে যাচ্ছে। এক্ষুণি অন্ততঃ এক ডজন মেয়ের নাম করতে পারি, যারা কেউ বাবা-মার অমতে রেজিস্ট্রি বিয়ে করেছে, কেউ বাড়ি ছেড়ে গিয়ে স্বাধীনভাবে বাস করছে। দুজনকে জানি, তারা খৃস্টান ও হিন্দুকে বিয়ে করেছে। আরও নজীর চান?

…একটা কথা শুনুন। লেখক—মানে একজন সিরিয়াস সাহিত্যব্রতী লেখকের কথাই আমি বলছি, তিনি মোটামুটি ভাবে তাঁর লেখার বিষয় খুঁজে নেন অতীত অভিজ্ঞতা থেকে। স্মৃতি তাঁর শিল্পের সহচর। আজ মুসলিম মেয়েরা হয়তো অনেক কিছু করছে। এটা কিন্তু আমি সমকালের ব্যাপার মনে করি। ভুল করবেন না—সাহিত্যের সমকাল আর সংবাদপত্র বা রাজনীতির সমকাল কিন্তু মোটেও এক নয়। কালের হিসেবে স্পষ্টতঃ দুটো দুদিকের ব্যাপার।

…বেশ, তাই যদি হয়—এবং তর্কের খাতিরে তাই-ই ধরে নিচ্ছি, সমকাল নিয়ে আপনি লিখতে নারাজ—কিন্তু বিগতকালে আপনার অভিজ্ঞতায় কি তেমনি কিছুই ঘটেনি? কোন মুসলিম নায়িকা কি সত্যি আপনার চোখে পড়েনি? তার হাসিকান্না সুখ-দুঃখে-ভরা জীবনের কোন প্রান্তেও কি আপনি এমন আশ্চর্য কোন উদ্যান দেখেননি—যার একটি দুটি ফুল চয়ন করে শিল্পের সাজিতে রাখা যায়?

…আপনি আমায় ভাবিয়ে তুললেন সত্যি!

…বলুন, তেমন কোন মেয়ের কথা আপনার মনে নেই?

…কী জানি!

…বলুন, চুপ করে থাকবেন না।

…কী বলব?

…মুসলিম নায়িকার কথা। যার রূপ না থাক, হৃদয় ছিল। চোখ-ধাঁধানো উজ্জ্বলতা না থাক, ছিল রহস্য। দুপুরের গনগনে রোদ্দুরের চেয়ে গোধূলির স্মিত পাণ্ডুরতা, অস্তোন্মুখ সূর্যের লালচে রঙটার চেয়ে সন্ধ্যার স্নিগ্ধ ধূসরতা তো অনেক বেশী রহস্যময়। অনেক ভাবায়। অনেকখানি বিষণ্ণও করে। নাই বা হল উচ্ছল চটুল চঞ্চল আর চটপটে। কথায়-কথায় চমক আর ফুলঝুরি ছড়ানোর ক্ষমতা নাই-বা থাকল! হয়তো মৃদু একটু ছোঁয়াতেই লজ্জাবতী লতার মতো সংকুচিতা, হয়তো নম্রা বিনীতা কুণ্ঠিতা ব্রীড়াভারবনতা শান্তা ভীতা…

…আঃ, চুপ করুন। আমায় ভাবতে দিন।

…মনে পড়ছে বুঝি তেমন কাকেও?

…আপনি হাসছেন! হাসবেন না। আর কী যেন বলছিলেন, নম্রা ভীতা শান্তা।

…বলছিলুম।

…কিন্তু না, না। নম্রা নয়, ভীতা নয়, শান্তা নয়। লজ্জা? যত লজ্জা—তা তার বুক থেকে মুখে পৌঁছতে জীবন কেটে গিয়েছিল। কুণ্ঠা? কুণ্ঠার সাধ্য ছিল না তার হাতের আঙুলকে বাগ মানায়। হ্যাঁ—আঙুলের কথাই বলছি। ওই অকুণ্ঠ আঙুল দিয়ে নিজের নবজাতককে সেই রাক্ষসী…

…রাক্ষসী নয়। আমি নায়িকার কথা বলেছিলুম—সে মানুষী।

…তাই হবে। সে মানুষী।

…তাহলে মনে পড়ে গেল?

…হ্যাঁ।

…কে ছিল সে? কেমন গম্ভীর আর বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন মনে হচ্ছে! আপনার ওই চোখ দুটোকে আমি চিনি। চশমার কাচের নীচে ওই তীব্র কাকুতিটা কিন্তু আমার অচেনা। সত্যি বলুন তো, আপনার চোখে কেন এ বিদ্যুতের ছটা আর অন্ধকার জমাট মেঘের চাপ এসে পড়ল এ মুহূর্তে? কে ছিল সে?

…আমায় যেতে দিন।

…পালাতে চান? অত সহজে আমি কাকেও রেহাই দিইনে মশাই।

…পথ ছাড়ুন। আমার পিছনে একটা অন্ধকারময় শূন্যতা যেন তাড়া করে আসছে।

…এ আপনার পাপবোধের ত্রাস।

…কিন্তু আমি তো কোন পাপ করিনি।

…কোন রাক্ষসী তার নবজাতককে হত্যা করেছিল, বলছিলেন!

…করেছিল, কিন্তু তাতে আমার তো দায়িত্ব ছিল না। সে পাপ আমায় স্পর্শ করবে কেন?

…না করলে এ পাপবোধজনিত ত্রাস কেন আপনার?

…জীবনের ওই রূপটাই আমায় ভয় পাইয়ে দিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের আয়েষার কথা মনে আছে আপনার? সে বন্দী হিন্দু রাজপুত্রকে দেখে বলেছিল, 'এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর!'

…এ একটা প্রখ্যাত উক্তি।

…হ্যাঁ। আয়েষা আমায় ভাবায়। মুসলিম মেয়ে যখন কোন হিন্দু ছেলেকে ভালবেসে ফেলে, আমি সত্যি চমকে উঠি। এক অথৈ শূন্যতা আমায় চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে। আমি যতবার চীৎকার করে ডাকি, ঈশ্বর তুমি কোথায়, সব ডাক শূন্যতায় লীন হয় নিঃশেষে। আমি আরও বলে উঠি : ঈশ্বর, কি সব মানুষকেই তুমি সৃষ্টি কর নি? তোমার কি আরও সব প্রতিনিধি রয়েছে নানারকম মানুষ সৃষ্টির জন্যে?…কোন সাড়া পাইনে। প্রচণ্ড অসহায়তা গ্রাস করে। মানুষকেই তখন ভয় পেয়ে যাই। ভয় পাই মানুষের এই জীবনটাকে।

…আপনার আয়েষার কথা বলুন শুনবো।

…থাক্। কী হবে?

…বলেছি তো, অত সহজে আমি কোন লেখককে রেহাই দিইনে। আচ্ছা, একটা কথা জানতে ইচ্ছে করে। আপনিই কি তাহলে ওই কাহিনীর ওসমান খাঁ ছিলেন?

…পাগল! না, না। আমার মধ্যে অমন মহত্ব কোথায়? তেমন সাহস আর সহিষ্ণুতা, ধৈর্য আর উদারতা কোথায় পাব আমি? আজও তো মানুষকে আমি ক্ষমা করতেই শিখলুম না।

…তাহলে কী ছিলেন আপনি? শুধু নির্লিপ্ত দ্রষ্টা?

…এবার হাসি পেল। আপনি নাছোড়বান্দা। বাংলা সাহিত্যের পাঠিকাদের আমি এজন্যেই বড় ভয় করি। আপনারা বড্ড বেশি খুঁটিয়ে জানতে চান। আপনারা পাতায় পাতায় চোখের জলের ফোঁটা না ফেলতে পারলে…

…ভণিতা রাখুন।

…তার আগে এক মিনিট চুপচাপ সিগ্রেট টানতে দিন লক্ষ্মী মেয়ের মত। আর একটা কথা—কোন সময়ই বাধা দেবেন না যেন।

প্রশ্ন করবেন না। শুধু মনে রাখবেন, আমি যা বলছি—তা জীবনেরই কথা। আপনার জীবনে না ঘটুক বা কোন মিল নাই থাক, এটা ঘটেছিল বা ঘটতে পারে। আসলে আমরা আটপৌরে সাদাসিদে মানুষেরা কতটুকুই বা খবর রাখি কোথায় কী ঘটছে? জানবেন—খবরের কাগজই সব নয়। অন্যের কাছে শোনাটাও বাস্তবজীবনের একটুকু অংশ মাত্র! বিজ্ঞানী নিউটনের সেই বিখ্যাত উক্তি মনে আছে তো? জ্ঞানসমুদ্রের বেলায় মাত্র কিছু নুড়ি কুড়োতেই একটা জীবন কেটে যায়। মানুষের জীবন এক অকূল দিগন্ত-বিস্তৃত সমুদ্র। আমাদের কাছে শুধু ওই বেলাভূমির নুড়ির হিসেবই মেলে। আমরা লেখকরা নিছক নুড়ির ফেরিওয়ালা।

এক

সে একটা মজার নোম্যানস্‌ল্যাণ্ড ছিল এই বাংলাদেশে।

নোম্যানস্‌ল্যাণ্ড কাকে বলে জানেন তো? দুই রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে কিছু জমি পড়ে থাকে—যার কোন মালিক নেই। এ জমি যেন ঈশ্বরের। তাঁর অনুচরী প্রকৃতি যেখানে ইচ্ছামত খেলাধূলো করে বা নাচে গায় কিংবা যা-খুসি করে। কারো কিছু বলার নেই। ও জায়গাটা মানুষের নয়।

একালে কী হচ্ছে, খবর রাখিনে। কিন্তু বাংলাদেশের ছোটবড় সব পাড়াগাঁয়েতেই এরকম কিছু নোম্যানস্‌ল্যাণ্ড ছিল। সেটা কোথায় জানেন? হাসবেন না। ওটা ছিল হিন্দুপাড়া আর মুসলমান পাড়ার মধ্যিখানটায়। দুটো পাড়া যখন রাষ্ট্র নয়, তখন ও জমিটাও কিন্তু একেবারে মালিকছাড়া নয়। বেশির ভাগ জায়গায় ওটা হয় সরকারী খাস সম্পত্তি, নয়তো কোন 'পীরান' বা দেবোত্তর জমা। তার ফলে দরগা কিংবা ধর্মঠাকুরের মণ্ডপ, অথবা পোড়ো বাঁজা ডাঙা—যাতে কখনও-সখনও ছেলেরা খেলাধূলো করে থাকে—এইসব দিয়েই

জমিটার অবস্থা বিচার করা চলে। আবার, অনেক গাঁয়ে আস্ত একটা পুকুর থেকে ব্যাপারটা জটিল করে তুললেও আসলে ওটা নোম্যানস্‌-ল্যাণ্ড বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। কারণ কী? কারণ, ওই দুই সম্প্রদায়ের জন্যে দুদিকে দুটো আলাদা-আলাদা পাড়া রয়েছে যে! হিন্দুর ঘরের দেওয়ালের ওপিঠে মুসলমানের ঘর থাকা অর্থাৎ একেবারে নোম্যানস্‌ল্যাণ্ডবিহীন, এমন কি সীমানাবিহীন অবস্থা নিছক ব্যতিক্রম। যেখানে তা রয়েছে, সেখানে বড় বিদঘুটে ব্যাপারও কম ঘটে না। এক বাড়ির এঁটো থেকে নিষিদ্ধ ভক্ষ্যের হাড় অন্য বাড়ির কোন কুকুর কি বেড়াল নিয়ে গিয়ে তুলল—আর অমনি ব্যস্‌! তক্ষুণি শকুনি-মামার প্রবেশ, মন্ত্রণা এবং দ্রুত কুরুক্ষেত্র এগিয়ে আসতে থাকে।......

এইবার বুঝতে পারবেন, একটা নোম্যানস্‌ল্যাণ্ড কেন জরুরী ছিল। হাড় ফেলেছে বলে নয়, নিরাপত্তা অর্থাৎ যে যার ঘাড়ে মাথাটি অক্ষত রেখে চমৎকার লড়াই চালিয়ে যেতে পারবে—দুপক্ষের সামনে এমন খানিকটা ফাঁকা জায়গা তো বড্ড দরকার! তা না থাকলে যার জোর বেশি সে তক্ষুণি হাত বাড়িয়েই মুণ্ডুটি পেয়ে যাবে, কিংবা অগত্যা ঘরের খোড়ো চালটাও তো সামনে ঝুঁকে রয়েছে—একটা দেশলাইকাঠির ওয়াস্তা মাত্র! তাই যেন ওই হিসেবী পাড়া-গঠন ও বসবাসের অনবদ্য ভঙ্গী।

ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ, পিঠাপিঠি এমন বাস যাদের, তাদের মধ্যে কিন্তু সংঘর্ষ ঘটে কদাচিৎ, ঘটে না বললেও চলে। কারণ, সারা বেলা দিনরাত্তির দেখাদেখি চোখাচোখি, বাক্যালাপ আর হাঁড়ির খবর চালাচালিতে মনও যেন এক শক্ত সুতোয় বাঁধা হয়ে পড়ে। ছিঁড়তে দুপক্ষেরই ব্যথা বাজে। আর তাই—

অ, রুবির মা, এদিকে একবারটি আসবে?

ডাকছ মেজঠাকরুণ? যাচ্ছি।

অই ছাখো, ছাখো নচ্ছার হুলোটার কাণ্ড ছাখো! কী সব জড়ো করেছে কোত্থেকে! আমি বলি, আর কোত্থেকেই বা আনবে? মিয়াবাড়ি ছাড়া……(মুখে আঁচল ঢেকে হাসি) কাল রাত্তিরে তো ওনাদের 'মেমান' এয়েছিল।

ও মা, ছি ছি ছি! গালে কালি কাণ্ড! বুঝেছি। এ আমাদেরই হুলোর কাজ। তখন ভোরবেলা নমাজের জন্যে অজু করতে বসেছি, দেখি হারামজাদা মুখে একটা কী নিয়ে আড়চোখে তাকাচ্ছে প্যাট-প্যাট করে। তাড়া করলুম তক্ষুণি। কে জানে, কায়েতবাড়ি গিয়ে… (আঁচল ঢাকা হাসি)…তা এক্ষুণি ফেলতে বলছি। হাসির মা, ও হাসির মা! শিগ্‌গির এসো তো এদিকে, জলদি!

তাই করো! ভাগ্যিস পরশু সন্ধ্যেবেলা ওবাড়ির ঠাকুরপো গঙ্গাজল এনেছিল একঘড়া। (হাসি ও চাপা গলায়) মেজবাবুর কানে গেলে আবার বাড়িশুদ্ধ গঙ্গাজলে চুবোবার ব্যবস্থা করবে, যা কড়া মানুষ! তা হ্যাঁ গো বউ, রুবিকে দেখেশুনে গেল?

দেখাশোনা আর কী করবে? আমাদের মেয়েদের তো পাত্রপক্ষের পুরুষদের দেখানোর রীতি নেই মেজঠাকরুণ। তবে শিক্ষিত পাত্র—ছবি ছিল, তাই দেখল। হাতের লেখা দেখল। স্কুলের সার্টিফিকেট দেখল। তাছাড়া সেলাই-টেলাই যা রুবির ছিল, সবই দেখালেন উনি।

পছন্দ হয়েছে বুঝলে?

মুখে তো বলে গেল পছন্দ হয়েছে। পরে কী করবে কে জানে? সর্বনাশী মেয়েটার কপালে খোদা কী লিখেছেন, তিনিই জানেন ভাই। যতজন এল, মুখে সবাই পছন্দের কথা বলে গেল। এমনকি দিনক্ষণও ঠিক হল কতবার। তারপর হঠাৎ সেই ভাঙ্‌চি—কোত্থেকে কার মুখে কী শোনে আর বিগড়ে যায়। (দীর্ঘশ্বাস)

বড় দুঃখ লাগে বউ। বুঝলে? খুব কষ্ট পাই মনে। যদি নিজের জাত হতে অমন সোনার প্রতিমা আদর করে ঘরে তুলতাম ভাই। একটা পাঁচিলের বেড়া বই তো না! (দীর্ঘশ্বাস)

দুই মধ্যবয়স্কিনী মহিলা মাঝখানের পাঁচিলের দিকে বিষণ্ণ চোখে

কতক্ষণ তাকিয়ে থেকেছে। ওদিকে পেয়ারাগাছের ডালেহলদে ইষ্টিকুটুম পাখিটা কখন থেকে ডাকছে। গ্রীষ্মের তাজা সূর্য আস্তে আস্তে দরজা খুলে দিচ্ছে, ঝাঁঝাল রোদ্দুরের স্রোত উপচে পড়ছে খোদাতালা ও ঈশ্বরের সৃষ্টিটার ওপর। আকাশের নীলচে বিস্তার একটু পরেই ধূসর হয়ে উঠবে।

আমার জঠরে আস্ত একটুকরো দোজখের আগুন জন্মেছিল···

কেঁদ না বউ। ছিঃ, কাঁদতে নেই। আমি বলি শোন—তোমার রুবির কোন দোষ নেই। অমন মেয়ে হয় না গো, হয় না। আমি বলছি। আমার কথাটা বিশ্বাস করবে কি না? ওই যে কথায় বলে না—পাঁকে পদ্মফুলটি ফুটেছে, গুবরে পোকাগুলোর তা সইবে কেন বলো? যাও, মনে বল রাখো। ধৈর্য ধরো। ভগবান যেমন আমার আছে, তেমনি তোমারও তো আছে—তাঁর কাছে প্রার্থনা করো। সব ঠিক হয়ে যাবে।

সুনন্দর মা ছিল এমনি মেয়ে। ঝোঁকের বশে কি না কে জানে, অমনি করে রুবির মাকে দুজন ঈশ্বরের কথা বলে বসত। পরে সুনন্দ মাকে হাসতে হাসতে বলেছে—আচ্ছা মা, তুমি যে তখন রুবির মাকে 'তোমার ভগবানের' কথা বলছিলে। সত্যি দুজন ভগবান আছেন বুঝি? দেখে ফেলেছ, তাই না? তোমার উনির চেহারাই বা কেমন আর মাসিমারটাই বা কেমন বলতে পারো? একজনের টিকি অন্যজনের মস্তো দাড়ি। একজন পরেন ধুতি, অন্যজন লুঙ্গি······

চুপ কর্ তো সুনু। ছোটমুখে বড় কথা কস্নে।

বারে? তুমিই তো বললে!

কখন বললুম? (হাসি) বেশ তো, যদি বলেই থাকি—কী ভুল বলেছি? তুই কলেজে পড়িস, আমি তো পাঠশালাও যাইনি—এই সহজ কথাটা বুঝতে পারলিনে? ভগবান এক—কিন্তু রূপ তো তাঁর অনেকরকম।

সেই কথাই তো জিগ্যেস করছি। রুবিদের ভগবানের রূপটি" কেমন? আর আমাদেরই বা—

নাঃ। ছেলেটা মেলেচ্ছর হদ্দ দেখছি! যা তো সামনে থেকে।

বারান্দা থেকে সুনন্দর বোন ঝুনু বা ঝর্ণা বলেছে, দাদা—এবার বলে দিচ্ছি কিন্তু—আমার সেইটে দে।

কী বলবি তুই?

সেই—সেই যে কাল সন্ধ্যেবেলা, হুঁ, আগে দাও।

দেব না যা।

তাহলে বলছি। মা, তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র গতকাল সন্ধ্যায় জাতিঃপাত করিয়াছেন। উহার প্রায়শ্চিত্ত করা কর্তব্য।

কী? কী রে সুনু? ঝুনু কি বলছে?

সুনন্দ লাফ দিয়ে বারান্দায় পৌঁছতেই ঝুনু দৌড়ে পালিয়ে গেছে। তারপর খিড়কি খুলে পুকুর পাড় দিয়ে সোজা রুবিদের বাড়ি হাজির। হাঁপাচ্ছে। বড় বড় চোখ, ঠোঁটে আঙুল। রুবি এগিয়ে এসেছে কাছে।—কী রে? কী হয়েছে?

এই চুপ্। সুনুদা যা রেগেছে না আমার ওপর!

কেন?

কাল সন্ধ্যের ব্যাপারটা প্রায় আদ্ধেক বলে দিয়েছি মাকে।

যাঃ। কেন বললি? তোর বাবা যা খট্‌রাগী মানুষ—শেষে···

ওই দ্যাখো! ইনিও ক্রুদ্ধ হলেন অবলার প্রতি। হবে নাই বা কেন? আলবৎ হওয়া উচিত। যাকে বলে—একের ব্যথা অন্যের প্রাণে বাজিয়া ওঠে। দুঁহু কাঁদে দোঁহা লাগি!

খবর্দার ঝুনু! যা তা বলবিনে বলছি!

বা রে! যা তা বলছি?

বেশ বাবা, বেশ। তাই হল। এই আমি মুখে তালা দিলুম। আর কদাপি খুলিব না। যাক্ গে, চল্। তোর সঙ্গে কিছু জরুরী কথা আছে।

দুজনে ঘরে গিয়ে ঢুকেছে। তারপর রুবি মুখ তুলেছে—চোখে প্রশ্ন। ঝুনু বলেছে, বলছি বাবা, দম নিতে দে। তবে কথাটা ভারি

গোপনীয়। ...হুঁউ! হল তো! চমকে উঠেছিস সঙ্গে সঙ্গে! এখন তোর হৃদয়কে, থুড়ি! মুসলিম হৃদয়টাকে বল্—হে হৃদয়, উদ্বেলিত হইও না। হিন্দু হৃদয়ের বার্তা শুনিবার জন্য প্রস্তুত হও।

ঝুনু, যত বয়স বাড়ছে—তত ডেঁপো আর ফাজিল হচ্ছিস কিন্তু! এত জ্যাঠামি শিখলি কোত্থেকে?

শিখেছি। শিখছি। আরও কত শিখব। শোন্, এইমাত্র শিখে এলুম যে দুজন ভগবান আছেন। একজন হিন্দু ভগবান, অন্যজন মুসলিম ভগবান। সুতরাং বোঝা গেল, হৃদয় দুরকম আছে। একটা হিন্দু হৃদয়, অন্যটা মুসলিম হৃদয়।

(জোর হেসে) তোকে পারা দায়। কিন্তু কথাটা হয়তো ঠিকই বলেছিস রে।

বলেছি! তবে দে—প্রাইজ দে।

দিচ্ছি......

সেই সময় সশরীরে আমি গিয়ে পড়লে কী দৃশ্য দেখতুম জানেন? দুটি মেয়ে—বড়জোর আঠারোর মধ্যে বয়স তাদের, পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে গভীর আবেগে চুমু খাচ্ছে। তারপর ফের পরিহাসে ওরা পরস্পরকে বলছে, এই যা! জাত মেরে দিলি যে! ওরা ঠোঁট মুছেছে আঁচলে। অবশ্য সেটা নিতান্তই কাপট্য।

আর, এই ছিল ঝুনু বা ঝর্ণা আর রুবি। এই ছিল সুনন্দ আর তার মা। আর এই ছিল কিনা রুবির মা।

সেই পাশাপাশি ঘরবাড়ি, নোম্যানস্ল্যাণ্ডবিহীন ঐতিহ্যবিরোধী পটভূমিই আমার এ কাহিনীর পটভূমি।

বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলিম-অধ্যুষিত পাড়াগাঁয়ে এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম ছিল এই কুসুমগঞ্জ। মুসলমানেরা যাকে কুলসুমগঞ্জ বলেই অভিহিত করত। সাম্প্রদায়িকতা হয়তো নয়—নিতান্ত আত্মীয়তার দাবী থেকেই নামের এ হেরফের। একে তুচ্ছ করা ভালো।

কুসুমগঞ্জে কোন নোম্যানস্‌ল্যাণ্ড ছিল না। ছিল না, তার কারণটা ভারি স্বাভাবিক। কোন এক মুসলিম জায়গীরদারের এ ছিল রাজধানীবিশেষ। পরবর্তী কালে তাঁর বংশধরেরা ছিলেন জমিদার। এখনও নদীর ধারে সে আমলের কুঠিবাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। সে আমলে কর্মচারী ও অমাত্য পরিষদ অনুচর বেশির ভাগই ছিলেন হিন্দু। জায়গীরদারটিও ছিলেন কোন কোন মুসলিম শাসকের মতো প্রথাসিদ্ধ উদারতায় বিশ্বাসী। এবং তাঁদেরকে খুব কাছা-কাছি রাখতে চেয়েছিলেন—যাতে হরবখত আজ্ঞামাত্র সামনে পাওয়া যায় বা খুশগল্প করা যায়।

এর ফলেই বস্তুত কোন নোম্যানস্‌ল্যাণ্ড থাকার সুযোগ ঘটেনি—বা কেউ ভাবেও নি। তারপর বংশপরম্পরায় ঘরবাড়িগুলো ওইরকম দেয়ালে দেয়ালে পাশাপাশি রয়ে যেতে বাধ্য হল। ইংরেজ আমলেও তা অব্যাহত রইল। স্বাধীনতার পরও আর কোন রাজনৈতিক ভূমিকম্পে তুটো পাড়া তুদিকে সরে কোন ব্যবধান সৃষ্টি হল না।

অথচ হতে পারত। অজস্র নতুন মানুষ নতুন মন ও জীবন সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চলে এল কুসুমগঞ্জে। তাদের সঙ্গে সাবেকী বাসিন্দাদের মিলের চেয়ে গরমিলটাই বেশি। আচারে-বিচারে পোশাকে-আশাকে ফারাক হচ্ছে তুস্তর। তবু কোন সংঘাতই ঘটল না।

এর কারণ একটাই। মাটির দাম বেড়ে গেল কুসুমগঞ্জে। একেলে সভ্যতার কড়া ঝাঁঝ গায়ে নিয়ে নাগরের মত প্রবিষ্ট হল নগর। নদী আর রেলস্টেশন কেন্দ্র করে গড়ে উঠল নতুন বেনিয়ার মৌচাক। সরকারী পাঁচশালা যোজনার প্রভূত দাক্ষিণ্যে পুরনো কুসুমগঞ্জ তার অমার্জিত গেঁয়ো চেহারাটি মুছে ফেলে ছিমছাম নব্যসুন্দরী হয়ে উঠল—যেন বব্‌ছাঁট চুল, মিনি ব্লাউজ, সমুদ্ধত স্তনযুগ, দেহের প্রতিটি খাঁজে সুরম্য মাংসল সোপানরাজি···।

থাক্‌। কাব্য করে লাভ নেই। বেনিয়াবাজারে সবই পণ্য। টাকার বিনিময়ে আপনি কিনতে পারেন কিলোদরুণ মাংস—মানুষেরই মাংস। কাজেই মাটি তো সামান্য বস্তু।

কুসুমগঞ্জে মাটির দাম বেড়ে গিয়েছিল। কে হিন্দু কে মুসলমান, এ প্রশ্ন পরে—আগের রেওয়াজ মতো হিন্দু-মাটি মুসলমান-মাটি বলে আর দ্বিধাবিচার রইল না কিছু। কারণ, মরুভূমিতে যখন একফোঁটা জলের অভাবে সবাই হতশ্বাস, জলদাতার জাতবিচার করার মতো মনোবল কোথায়? এখানের মাটিতে একটা পা রাখতে পারলেই নাকি হাওয়া থেকে টাকা কুড়োন যায়। টাকা কুড়োতে রাজ্যের লোক জড়ো হচ্ছিল।

মিয়াবাড়ির একপাশে কায়েতবাড়ি, অন্যপাশে বামুনবাড়ি এবং তার পাশে ফের মিয়াবাড়ি—এইরকম গা-ঘেঁষাঘেষি পুরনো কালের বসবাসের সঙ্গে আরও এলোমেলো নতুন বসবাস যোগ মেলাচ্ছিল। ফলে ছত্রিশ রাজ্যের ছত্রিশ জাতের এ হল এক অভূতপূর্ব সহাবস্থান।

অভূতপূর্ব। কারণ, এদিক-ওদিক ইলেকৃটিরি পরিশোভিত নতুন ফ্যাসানের দালানবাড়ির ভিড়ে কিছু সেকেলে গড়নের মাটির দেওয়াল আর খড়ের চালের হৃতশ্রী ঘরবাড়ি রয়ে গেল। ওই বিশাল তেঁতুল গাছটার দিকে তাকান। রহস্যময় প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মতো ছিল তার অবস্থিতি। তাকে কেন্দ্র করে কত অলৌকিক কাহিনী না চালু ছিল! আজ তার বুকের কাছাকাছি ইলেকৃটিরির তার। কাঠের খুঁটিতে আলো জ্বলে সারাটি রাত। আজ সব রহস্যের ফর্দাফাঁই, সব কাহিনীর বিয়োগান্ত পরিণতি।

পায়ের কাছে ছোট্ট পুকুর। অজস্র হলুদ তেঁতুলপাতা তিরতির করে জলে কাঁপে এখনও। পাড়ে-পাড়ে সব জিক্কেত আর ছিমছাম একতলা বাড়ি। শুধু উত্তরদিকটা বাদে। ওখানে পাশাপাশি দুটো মাটির বাড়ি, খড়ের চাল, দারিদ্র্যের রুক্ষ গম্ভীর চেহারা। মেকি ইজ্জতের বড়াই নিয়ে দুবাড়ির দুই প্রৌঢ় এখনও চারপাশটাকে তাচ্ছিল্য করার চেষ্টায় ব্যাপৃত। দুটি মানুষই এখনও প্রতি বিকেলে ছড়ি হাতে নিয়ে সান্ধ্য-ভ্রমণে বেরিয়ে যান অভ্যাসমত। রেললাইন ধরে কতদূর হাঁটতে থাকেন। ক্যানেলের ব্রীজে গিয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকেন। কিছু কথা বলেন কিংবা বলেন না। চুপচাপ তাকিয়ে

থাকেন ওইসব বিস্তৃত শস্যক্ষেত্রের দিকে। কিংবা নদীর আঁকবাঁকা রেখাটির দিকে। কিংবা হয়তো উঁচু ধ্বংসস্তূপগুলোর দিকে—মমতাময়ী প্রকৃতি যে প্রকাণ্ড অবক্ষয়িত আর ভূলুণ্ঠিত ইজ্জতকে পরম যত্নে মায়ের স্নেহে ঢেকে রেখেছে। ঘন সবুজ উদ্ভিদের প্রসারিত করতল রক্ষা করছে কোন প্রাচীন কালের ট্রাজেডিকে।

হ্যাঁ—তাই-ই তো! প্রকৃতি ছাড়া একাজ কেই বা করে! প্রকৃতিই তো অবশেষে পরম সান্ত্বনা। সে কি না জীবজগতের উৎস আর অন্তিম আশ্রয়। দুঃখে শোকে বেদনায়, তাই মানুষ তার কাছেই গিয়ে দাঁড়ায়। প্রার্থনা করে, আমায় গ্রহণ করো।

…ঐ যেখানটায় সূর্য ডুবছে, তুমি দেখতে পাচ্ছ আফজল, ওই যে, কী একটা…(একটু হেসে)…আমার লংসাইটটা একেবারে গেছে! তোমার আবার চশমারই দরকার হয় না। চোখের এত জোর পেলে কোথায় হে? গরু খেয়ে? হেঁ হেঁ হেঁ!

…তোমারও কি বাদ গেছে ও কম্মো? দুবেলা তো ব্রাণেন অর্ধভোজনম্ হয়ে গেছে। হাঃ হাঃ হাঃ!

…আরে দ্যাখো, দ্যাখো! এখনও বিলে হাঁস নামছে ঝাঁকে ঝাঁকে। নামছে না? বন্দুকটা থাকলে…(দীর্ঘশ্বাস)

…বন্দুক? এখনও তুমি বন্দুকের কথা ভাবো? বোষ্টম মানুষ—তবু পক্ষীমাংসের লোভ? থামো, তোমার গুরুদেব আসুন!

(জিভ কেটে) ধুস্ শালা! ভুলেই যাই হে!

(কয়েক মিনিট নীরবতার পরে)

…খাঁ সাহেব!

…উঁ?

…মেয়েটাকে আর পড়ালে না?

…পারলুম কই? দেনায় সর্বস্ব রিকিয়ে আছে রে ভাই! মুরু আগের মত টাকা পাঠাচ্ছে না। নাকি পাঠাতেই পারছে না। বর্ডারে

আজকাল ভীষণ কড়াকড়ি শুনছি। চিঠিপত্রও পাইনি অনেকদিন—ভাবছিলুম একবার যাবো নাকি…

…ওকে টিউশনী করতে দাও না! আজকাল টিউশনীর অভাব হবে না। তাই করেও তো মাসের পড়ার খরচা চালিয়ে নিতে পারে। হাতের কাছে কলেজ—নাঃ, তোমাদের আবার ওইসব সেকেলে শরীয়তী ব্যাপার বড্ড কড়া।

…ধুস্। কট্টুকু মানি আমি? হেম, তুই তো সেটা ভালই জানিস ভাই।

…তা ঠিক। আমার ঝুনুটারও তো ওই অবস্থা। সুনুর এবার থার্ড ইয়ার চলছে। ভাবছি, পরের বছর পাশ করে বেরোলে যদি চাকরীবাকরী একটা জোটে, সেই বরং বোনের দায়িত্বটা নিতে পারবে। পারবে না?

…হ্যাঁ, সুনু ছেলে হিসেবে তো ভালই। আজকালকার ছেলেদের মতো ডেঁপো ফক্কুরে নয়। দায়িত্ববোধ ওর আছে।

…খাঁ সাহেব!

…বলো।

(নীরবতা)

—কী হলো হেম?

…নাঃ। কিছু না। আরে কী কাণ্ড! টোয়েনটি ডাউন এরই মধ্যে এসে পড়ল! সাড়ে ছটা বেজে গেল তাহলে! চলো, ওঠা যাক! আজকাল এদিকটায় পোকামাকড় বেরোয়। (বিড়বিড় করে) …রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরি হরি। জয় নিতাই।

…তুমি বেশ আছো হে ধর্মকর্ম নিয়ে। আমি শালা ভুলেও একবার খোদার নাম করলুম না। পাঁচঅক্ত নমাজ তো দূরের কথা।

…ঈশ্বরকে ভুলো না আফজল। আর কদ্দিন?

…ভুলিনি, হেম। কিন্তু কী জানো? শয়তান আমার হাত পা বেঁধে রেখেছে। এ বড় জ্বালা ভাই।

দুই প্রৌঢ়—হয়তো বয়সে প্রৌঢ়, কিন্তু তাদের আখায় বৃদ্ধদের মতই; লাঠি ঠুকে ঠুকে রেল লাইনের ধারে-ধারে বাড়ি ফিরতে থাকেন। টোয়েনটি ডাউনের তীব্র আলোয় দৃষ্টি ধাঁধিয়ে গেলে ট্রেনটা চলে না যাওয়া অব্দি চোখে করতল রেখে দাঁড়িয়ে যান। তারপর হঠাৎ দুজনেরই যেন মনে হয়, চারিদিক জুড়ে এক শোকাবহ স্তব্ধতা হঠাৎ ঘনিয়ে এল—ওই ধাতব শব্দময় গতিবান জ্যোতির্ময় আস্ফালনের পর এমনি স্তব্ধতা তো খুবই স্বাভাবিক এবং এই গভীর স্তব্ধতাটাই আজ তাঁদের জীবন। এবং তাই যত বিষণ্ণতা।

কিন্তু একটু আগে কী বলতে চেয়েছিলেন হেমনাথ? আফজল খাঁর গা শিউরে ওঠে! অনবরত মাথা নাড়েন। শুকনো জিভে নিরুচ্চারিত শব্দ কাঁপে—খোদা হাফিজ!

আমি কিন্তু জানি। কারণ, আমি—এ কাহিনীর যে লেখক সেই আমি তো শুধু দ্রষ্টা নই, নির্লিপ্ত নির্বিকার কোন সত্তা নই। আমি ওই অকথিত সংলাপ অনায়াসে উচ্চারণ করতে পারি আপনার কাছে, মমতাময়ী পাঠিকা!

আপনার কি মনে পড়ে মেজঠাকরুণের সেই সকালবেলার কথাটি? '...খুব কষ্ট পাই মনে। বুঝলে বউ? যদি নিজের জাত হতে, অমন সোনার প্রতিমা...'

থাক্। এবার আপনার সবটা মনে পড়ে গেছে।

যেখান থেকে সুরু করেছিলাম, তার আগের সন্ধ্যায় একটা কাণ্ড ঘটেছিল। সেটা বলা দরকার। আফজল খাঁর মেয়ে রুবিকে যাচাই করতে এক পাত্রপক্ষ এসেছিল বিকেলে। সকালেই আসবার কথা। দিনের আলোয় এসব কাজ সচরাচর ঘটে থাকে। কিন্তু পাত্র থাকে কলকাতায়। পৌঁছতে পারেনি সময়মতো। এদিকে কুসুমগঞ্জে খবর গেছে যথারীতি—শাদীর পয়গাম যাচ্ছে। ওনারা বনেদী ভদ্রলোক। খান্দানী বংশ। সুতরাং কথার খেলাপ করতে রাজী নন।

পাত্রের ইচ্ছে, স্বচক্ষে পাত্রীকে বাজিয়ে নেবে। সে একেলে যুবক, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, বউ নিয়ে তার স্বপ্নের সীমা নেই। মুসলমান হলেও হিন্দু বন্ধুদের বিয়ের আচার-প্রথা বা আধুনিক রীতিনীতি তার জানা। তার মানসিকতায় ইসলামী শরীয়তের চেয়ে এইসব আধুনিকতার দিকে ঝোঁকটা সবিশেষ তীব্র। তাই তাঁর সশরীরে আগমন।

কিন্তু কুসুমগঞ্জের সমাজে অতখানি বেশরীয়ত বরদাস্ত হওয়া শক্ত। শুধু সামাজিক রীতি বলে নয়, একটা ব্যক্তিগত দিকও তো আছে। খাঁ-পরিবারে এমনটি কেউ ঘটতে দেননি কস্মিনকালে। স্কুলে মেয়েকে পড়ান বা পর্দাপ্রথা না মানুন, অন্তত বরের সামনে কনের মাংস ওজন হবে—এটা ওঁদের রক্তে বড্ড অসহনীয়। মেয়ে কি বাজারের মাল?

তবে পাত্রের জেদ—এবং পাত্রটি সুশিক্ষিত তো বটেই, রূপবান্ ও অর্থবান্; কাজেই শেষ অব্দি ফোটো দেখান হল।

ফোটো কিন্তু এ উদ্দেশ্যে তোলানো হয়নি। বাবা-মা জানতই না যে তাদের মেয়ের একটি ফোটো রয়েছে। কথাটা জানিয়ে দিয়েছিল হেমনাথের মেয়ে ঝর্ণা।

ঝর্ণা অতশত কি জানে? এর আগে কোন মুসলমান বাড়ির পাত্রী দেখানোর ব্যাপার তার জানা ছিল না। স্বভাবত সে ভেবেছিল যে তাদের মতই কনে দেখানো হবে। এবং তাই সারাবিকেল সে পরম যত্নে ও সাধনায় বান্ধবী রুবিকে সাজিয়ে তিলোত্তমা তৈরী করে বসেছিল। আড়ালে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে বলেছিল, ওরে রুবি! আমার যে পুরুষ মানুষ হতে ইচ্ছে করছে ভাই! উঃ আমি মরে যাব রে, মরে যাব!

রুবি বলেছিল, তোর যখন বর আসবে—তোকেও আমি সাজাব। তখন আমারও হয়তো পুরুষমানুষ হতে ইচ্ছে করবে।

যাঃ! আমি তো একটা খেঁদীপেঁচী। শূর্পণখা। দাদা কী বলে শুনিস নি?

তোর দাদা একটা গাধা।

এই চুপ্! দাদা বারান্দায় রয়েছে।

সত্যি?

দুজনে দরজায় উঁকি মেরে থ। সুনন্দ একটা মোড়ায় বসে রয়েছে। রান্নাঘরের দরজার কাছেই। হাতে প্লেট, প্লেটভরতি খাদ্য। ঠিক বেড়ালের মত মুখ কাত করে করে যা চিবোচ্ছে, তা হাড় মাংস নিশ্চিত। এবং রুবি জানত, ওটা হিন্দুর অভক্ষ্য। মায়ের বুদ্ধিশুদ্ধি আর কবে হবে? ছি, ছি, ছি! খেতে চাইলেও কি দিতে আছে?

ঝুনু বলেছিল, তুই হঠাৎ ঝিম মেরে গেলি যে!

নার্ভাস রুবি জবাব দিয়েছিল, না না—এমনি।

কী খাচ্ছে রে দাদা?

কিছু না, মাংসটাংস হবে।

মুরগী কেটেছিস্?···লোনার জল চুষে ঝুনু বলেছিল, কখন কাটলি দেখলুম না তো! বাঃ, ভাগ্য কী সুপ্রসন্ন!

রুবির মুখটা আরও গম্ভীর হল। ঝুনু কিন্তু দৌড়ে রান্নাঘরের দরজায় হাজির তক্ষুনি। মাসিমা! ভারি দুচোখো মানুষ তো তুমি!

কেন রে?

আমি বাদ পড়লুম?

সাহানা বেগম অপ্রস্তুত।···না, না, বাদ পড়বি কেন? বস, দিচ্ছি। হাসির মা, এই প্লেটটা ধুয়ে দাও দিকি। মেয়েকে খানিক 'ফিরনি' খাইয়ে দি।

'ফিরনি' আবার কী? দাদা যা খাচ্ছে, তাই খাবো।

সুনন্দ চোখ পাকিয়ে বলল, যা দিচ্ছে তাই খাবি। এ বস্তু তোর সইবে না। এত মোটা হাড় চিবুতে পারবি? আছে দাঁতের জোর?

কী যেন সন্দেহ মুহূর্তে উঁকি দিল ঝর্ণার মনে। ফিরনির প্লেটটা হাতে নিয়ে সে রুবির ঘরে এল। ফিসফিস করে বলল, আচ্ছা রুবি, সত্যি বল তো—ও কিসের মাংস খাচ্ছে? তোর দিব্বি, কাকেও বলব না।

রুবি বলেছিল, বুঝতে পারছিস না? তোর দাদাটি আস্ত রাক্ষস রে! কুকুর বেড়াল যা দিবি, কড়মড় করে খেয়ে ফেলবে।

এই মা! দাদা ভগবান খাচ্ছে! ছি ছি ছি!...

এটা একটা তীব্রতর ঘটনা ঝুনুর জীবনে। কিন্তু সবই অভ্যাস। সহাবস্থানের গুণে এর ধারটায় যেন মরচে ধরে গিয়েছিল। সে টের পেয়েছিল, তার দাদাটি এক খাপছাড়া অদ্ভুত মানুষ। শুধু এইমাত্রই।

প্রসঙ্গটা মনে দাগ কাটতে পারল না। ওদিকে সময় হয়ে গেছে। ঝুনু গম্ভীর মুখে ওকে শেখাচ্ছে পাত্রপক্ষের সামনে কী বলবে, কেমন চলাফেরা করবে ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই সময় বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত দুঃসংবাদটা জানা গেল। রুবির মা এসে বললেন, না না। আমাদের মেয়েদের এভাবে সেজেগুজে ওনাদের সামনে যেতে নেই। সে কি হয়?

রুবির বাবারও আপত্তি। ঝুনু অবাক। অবশেষে হঠাৎ তার কী মনে পড়ে গিয়েছিল।...এই রুবি! তোর সেই ফোটোটা আছে রে?

সাহানা বেগম বললে, ফোটো? কোন্ ফোটো?

তুমি জানো না মাসিমা। আমরা দুজনে একসঙ্গে দুটো ফোটো তুলেছিলাম।

তাই নাকি?

আফজল খাঁ বললেন, বাঃ! বাঁচা গেছে। ওনারা ফোটো দেখালেও খুসি হবেন। কই, শিগগির বের কর তো ফোটোখানা।...

রাত একটু বেশি হলে ভাইবোনে নিজেদের বাড়ি ফিরল। প্রভা বলল, কেমন হল রে সব? খুব ধুমধাম হল বুঝি?

প্রভার বিশ্বাস আছে, তার ছেলেমেয়ে ভারি ধার্মিক, জাতধর্ম মেনেটেনেই চলে। প্রভার আরও কিছু ধারণা আছে। তার বাড়ির পুজোআর্চা পালপার্বণে খাওয়াদাওয়ার ব্যাপার থাকলে রুবিকে প্রকাশ্যে ডেকেই খাইয়ে দেয়। বারান্দায় আসন পেতে রুবিকে খাওয়ায়। সামান্য তফাতে ঝুনু বসে। সামনে যথাযথ দূরত্ব রেখে

প্রভা পরিবেশন করে। আলগোছে পাতে ফেলে দেয়। রুবি খায়—বার্ধে না।

রুবির মা প্রথম প্রথম আড়ালে মেয়েকে নিষেধ করত। তারপর আর এ নিয়ে মাথা ঘামায় না। এমনকি কায়েতবাড়ির প্লেট এলে তা গ্রহণও করে খুশিমনে। কিন্তু নিজে খায় না—খায় ঝি হাসির মা আর হাসি, এবং ওই রুবি।

তবু মনে জ্বালা কুটকুট করে।···ওনাদের খাবার আমরা দিব্যি নিচ্ছি। কিন্তু আমাদের ঈদের সেমাই কি এক বাটি ফিরনি দিতে যাই তো! তখন হাতে ধরে কোনমতে নেবে না মেজঠাকরুণ! বলবে ওখানে রাখো বউ। নিচ্ছি। তাহলে ছ্যাখো কাণ্ডখানা! জাত বুঝি ওনাদের একার আছে, আমাদের নেই?

আফজল সাহেব কিন্তু অন্যধাতের মানুষ। তিনি বলেন, তাতে কী হয়েছে? তোমার কর্তব্য তুমি করে যাও। ওরা নিক বা নিক, কিছু ক্ষতি নেই। নিজে কেন ছোট হবে? আর ছ্যাখো, আমাদের ইসলামধর্মে ওইসব ছোঁয়াছুঁয়ি জাতবিচার নেই। আমাদের কাছে মানুষ মানেই মানুষ—খোদাতালার সৃষ্টি।

অমনি মুখ ঝামটা বেগম সাহেবার।···থামো তো তুমি! ইস্, পাঁচঅক্ত নামাজ পড়ে-পড়ে তো কপালে ঘেঁটো ধরে গেছে—সে আবার ইসলামের নাম করে। কাফেরের এককাঠি সরেস যে, তোমার মুখে খোদার কথা। জীবনে কখনও দাড়ি রেখেছ? এখনও দুবেলা নাপিতের সামনে গাল বাড়াতে সরম হয়না একটুও?

গালে হাত বুলিয়ে আফজল বলেন, তুমি সইতে পারবে তো বেগম? হঠাৎ এ্যাদ্দিন বাদে গালে জঙ্গল গজালে তুমিই তখন মুখ সরিয়ে শোবে।

কী হচ্ছে! ঘরে সোমত্ত মেয়ে—কানে তালা আঁটে নি খেয়াল আছে?

কে? অ—রুবির কথা বলছ?

সাহানা বেগম তীক্ষ্ণদৃষ্টে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে যেন কিছু খোঁজে। তারপর কতকটা নিজের মনেই বলে, সে তো বটেই। রুবি নামে এবাড়িতে যে কেউ আছে, তা সাহেবের মনেই থাকে না। হ্যাঁ, থাকত। যদি নিজের মেয়ে হত! সঙ্গে করে এনেছিলুম বলেই তো যত জ্বালা, তোমার ইচ্ছেতেই এনেছিলুম। দিব্যি দাদুর কাছে থাকত। এ্যাদ্দিন ভাল ঘরে বিয়েও হত। তোমাদের খোঁটা খেতে হত না।

এই ছাখো। কী কথায় কী এনে ফেললে! আফজল খাঁ ক্ষুব্ধ।... কেন তুমি আমায় অমন ছোট ভাবো বলো তো? কী? কী করতে বলো আমায়? এক্ষুনি বলো। নাকখবদা দেব মাটিতে? পাছা ঘেঁষড়াবো দশ হাত? নাকি কান ধরে ওঠবস করব? বলো, কী প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে?

আহত অভিমানী বুড়ো বাঘটাকে সামনে গজরাতে দেখে সাহানা বেগম কাঠ। আস্তে আস্তে সরে যায় অন্য কোথাও। হয়তো খিড়কির বাইরে পুকুরঘাটে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

কতদিনের কত কথা মনে পড়ে যায়। পুরনো একটা পরিত্যক্ত সংসারের চলচ্চিত্র ফোটে শ্যাওলাভরা জলের সজীব সবুজে, রঙীন গুচ্ছে। সাঁ সাঁ করে পর্দার মত দৃশ্য আসে-যায়। নতুন হাটের সেই একতলা দালানবাড়িতে কবে একদিন এমনি গ্রীষ্মের দিনে এক বালিকাবধূ একটি কিশোরের হাত ধরে সলজ্জ বলেছিল, আমায় একবার কুসুমগঞ্জ দেখিয়ে আনবে?

কেন? কী আছে ওখানে?

বারে! জানোনা বুঝি? ওখানে দাদাপীরের থানে মেলা বসেছে যে! সার্কাস এসেছে। আমি কখনও সার্কাস দেখিনি। সার্কাসে নাকি বাঘ ছাখায়। সত্যি বলছি, আমি কখনও বাঘ দেখিনি। বড্ড দেখতে ইচ্ছে করে। হ্যাঁ গা, বাঘ কত বড় হয়?......

তার বিশ বছর পরে সত্যি সত্যি কুসুমগঞ্জ দেখা হয়ে গেল। সার্কাস, এবং বাঘও।

শিরশির করে হাওয়া বয়। কলাপাতা কাঁপে। তেঁতুলগাছটা থেকে ঝরঝর ঝরতে থাকে থরেবিথরে হলুদ পাতার ঝাঁক। জল থিরথির করে চক্রাকারে। কোথায় সানাই বেজে ওঠে। মল্লিকবাড়িতে বিয়ে বুঝি!

...সামান্য দশবারোটা টাকার ব্যাপার। বুঝলে? আব্বা কিছুতেই ওপথে যাবেন না। সেই শালা নিমু কররেজের পাঁচন গেলো—অসুখ সারুক আর না সারুক! আচ্ছা, তুমিই বলো তো সানু, ওই গুলঞ্চলতা কি একটা ওষুধ? এ্যাদ্দিন কুসুমগঞ্জে যদি যেতে পারতুম, দেখতে কী হত! দেবী ডাক্তারের মত বড় ডাক্তার তো আর এ তল্লাটে নেই। তাছাড়া ওনার মেজ ছেলে আমার সাথে কিছুদিন কুসুমগঞ্জের হাইস্কুলে পড়েছিল। হেমনাথের কথা তোমায় বলেছি না? সেই যে আমাদের বিয়ের পর এল—লম্বা রোগা ছেলেটি, কুসুমগঞ্জের রসগোল্লা এনেছিল মনে পড়ছে? আর কী সব যেন দিয়েছিল তোমাকে?

কঞ্জুষ বাপ কোনমতে টাকা খরচ করতে চায় না। ভাবনা কী? সামান্য জ্বরজ্বারি, বড় ডাক্তার দেখিয়ে লাভ নেই। নিমুর পাঁচনে এ তল্লাটে সব অসুখ সারছে, ওর না সারার কারণ নেই। ব্যস্ত হয়ো না বাপু।

হঠাৎ রাতের দিকে কী হয়ে গেল। গা ঠাণ্ডা বরফ, চোখদুটো নিষ্পলক। লম্ফের আলোয় ঝুঁকে পড়েছে সাহানা। পাশে কোলের মেয়েটা কাঁদছে।...চুপ্ চুপ্ হারামজাদী! দেখতে দে লোকটার কী হল! ওগো, শুনছ? কী হল তোমার? কথা বলছ না কেন?

কোরাণ পাঠ করছেন শ্বাশুড়ি। বাপখাকি মেয়েটা এতক্ষণে ঘুমোচ্ছে। কিছু না বলেই চলে গেল লোকটা? হয়তো কত কী বলার ছিল, এতদিনে যা বলা হয়ে ওঠেনি—বলতে চেয়েছিল, হয়তো ডেকেছিল সাড়া পায়নি। পোড়া চোখে সে রাতে অমন কালঘুম এসেছিল কোত্থেকে কে জানে। আর ছাখো, আমারও তো কত কথা ছিল বলার কিছু বলা হল না!...

সানাই বাজছে মল্লিকবাড়ি। ষোল বছর আগের সেই নিশুতি রাতের কোরাণধ্বনি যেন কেঁপে কেঁপে আত্মপ্রকাশ করছে সানায়ের সুরে। মিলনের আনন্দ বিয়োগের বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে উঠছে। কায়েতবাড়ির পেয়ারাগাছে ইষ্টিকুটুমটা বারবার ডাকতে থাকে। শিসিয়ে আসে হাওয়া। জলের ওপর পাতা ঝরে ঝাঁকে ঝাঁকে।

মা, ও মা! কী করছ ওখানে? রুবি এসে ডাকছিল।

যাচ্ছি। একটু ফুরসৎ তো দিবি নে তোরা। সংসারে ঘানি টানতে ঢুকেছি, আরাম কি আর পাব? গোরে না গেলে রেহাই নেই।

দুই

বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ে কুমারী মেয়েদের জীবনে এই একটা অগ্নিপরীক্ষার কাল। তা সে হিন্দু হোক, কিংবা মুসলমানই হোক্। খুব হিসেব করেই বলছি এই কালটা হচ্ছে মোটামুটিভাবে ষোল থেকে বাইশ—ছ'টা বছর।

একটি মেয়ের জীবনের সবচেয়ে দুঃখের কাল এটা। সবচেয়ে অনাদরের এবং ঘৃণার এবং ঝাঁটা খাওয়ার বয়স হচ্ছে এই। কারণ, তাকে সবাই দেখে যাচ্ছে, কেউ নিয়ে যাচ্ছে না। সে নিজের দোষ খুঁজছে খুঁটিয়ে। পাচ্ছে না। মাংসের দোষ, নাকি মনের দোষ? গালের ওই দাগটার জন্যে? নাকি এই সরু নাকটা? নাকি পাছায় আরও কিছু মাংসের দরকার ছিল? স্তন যথেষ্ট ডাগর নয়? ঠোঁটের রেখায় নেই কি যৌনতার স্মিত আহ্বান?

কিন্তু না—রুবি এমন অশ্লীলভাবে ভাববার মেয়ে নয়। সে তো আসলে বেঁচেই যাচ্ছে একটার পর একটা আক্রমণে। এখনও লক্ষ্মীমেয়ের মতো কোন অচেনা পুরুষের কঠিন হস্তারক মাংসে নিজের ফুলটি ফোটাবার কথা ভাবতেই পারে না। তার ভয় করে। তার ঘৃণা করে সেই আগন্তুক পুরুষপ্রবরকে। যখনই তাদের আসার

থা শোনে, সে দ্যাখে দূর থেকে ধাবমান এক উল্কাপিণ্ড খরবেগে নমে আসছে তার দিকে। তার রক্ত শুকিয়ে যায়।

বন্ধু ঝুনুর কথা ভেবেই তার যত আপশোস। কেন? ঝুনুর বিয়ের কথা ভেবে তো তার বাপমায়ের কোন অনিদ্রার কারণ ঘটছে া এখনও! ঝুনু তাকে ডিঙিয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ। কলেজে ভর্তি য়েছে সদ্য! আরও কতগুলো পাশ দেবে সে। দাদুর মতো নাকি াক্তারী পড়বে। লেডি-ডাক্তার হবে।

আর রুবি যাতে খুব তাড়াতাড়ি বাচ্চা বিয়োতে পারে এবং তার ায়ের মতই সারা বেলা সংসারের ঘানি টানতে সমর্থ হয়, তার জন্যে াপমায়ের যত অশান্তিকর অনিদ্রা!

আফজল খান সৎ-বাপ। কিন্তু রুবি তাঁকে আপন বাপের মত দেখতে অভ্যস্ত ছেলেবেলা থেকে। খাঁসাহেবও সৎ-মেয়েকে কস্মিনকালে পর ভাবেন নি। বরং মায়ের চেয়ে সৎ-বাপের দিকেই রুবির টানটা বেশি। সেই তিন বছরের মেয়ে মায়ের সাথে এবাড়ি এসেছে, কিচ্ছু টেরও পায়নি। বোঝবার মত বয়স পেলে তখন সে ঠিক বৃত্তান্তটা জানতে পেরেছিল। কিন্তু তা নিয়ে একটুও ভাবেনি স। এই জানা কোন দাগ কাটেনি মনে। বরং তাকে নিয়ে কোন প্রসঙ্গ মা স্বামীর সঙ্গে খুনসুটি করলে হাসিই পেয়েছে রুবির।

কিন্তু এতদিনে কেমন সংশয় জেগে উঠেছিল। ঝুনুর মতো তারও কলেজে পড়া হল না কেন? খাঁসাহেবের আগের পক্ষের ছেলে নুরুল এখানের কলেজে পাস করে পাকিস্তানে চলে গেল। সেখানে তার ামারা রয়েছেন। বড় সব সরকারী অফিসার। চাকরী শীগগীর পয়ে গেছে। গত মাসে চিঠি লিখেছিল—ওখানে থেকে না খেয়ে রবে তোমরা। তার চেয়ে এখানে চলে আসা ভালো। জিনিসপত্রের ামও সস্তা। অঢেল দুধ আর মাছ। সম্পত্তি বিনিময়ের জন্যে এক হিন্দু ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি ইণ্ডিয়ায় গিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলবেন। রাজী হয়ে যেও। পুকুর, বাগান ইত্যাদি নিয়ে খুব ভালো বাস্তুভিটে আর একতালা বাড়ি আছে।

আমাদের বাড়িটা মাটির হলেও উনি রাজী। তবে সামান্য কিছু বাড়তি জমি চান। সে তো আমাদের আছে। পীরের ডাঙার ওই তিন বিঘেয় তো ভাল ধান ফলে না—শুকনো মরা মাটি। দিলে ক্ষতি কি? অবশ্যি কিছু নগদ টাকাও দেবেন উনি।...

রুবিকে লিখেছিল—স্নেহের বোনটি, তোর কথা সব সময় মনে পড়ে। কিন্তু কী করব বল্? প্রাণের দায়ে এ নির্বাসন নিতে হয়েছে ভাই, বুঝতে পারছিস। হ্যাঁ রে, ঝুনু-সুনুরা আমার কথা বলে? ঝুনুও তো পাশ করল তোর সঙ্গে। কলেজে পড়ছে বুঝি? ওরা হিন্দুরা আমাদের মতো বোকা নয়। কী বলব রুবি, এখানে মুসলমান মেয়েরা আমায় তাক লাগিয়ে দিয়েছে রে। প্রজাপতির ঝাঁকের মতো যখন স্কুল-কলেজে যায়, আমার চোখ দুটো জ্বালা করে! ওদের দেখতে দেখতে শুধু তোর কথাই মনে হয়, ওদের মাঝে তুই যেন আছিস, তোকে খুঁজতে থাকি ব্যাকুল মনে।...আব্বাকে তোর কথা লিখেছি। যদি 'বিনিময়' করে শেষ অব্দি এখানে চলে আসাই সাব্যস্ত হয়, তখন তোর কলেজে পড়ার ব্যবস্থা করে দেব, ভাবিসনে। রাগ করিসনে বোনটি, এইজন্যেই দোনামোনা হয়ে তোর সম্পর্কে কিছু সিদ্ধান্ত নিতে বলিনি আব্বাকে। একটা বছর লস হবে, হোক্। কী এমন বড় হয়েছিস তুই?...

তাহলে সত্যিসত্যি পাকিস্তানে চলে যাবার মতলব? এই কুসুমগঞ্জ ছেড়ে, ওই পীরের দীঘির পাড়ে চমৎকার কলেজটা ছেড়ে আর ওইসব পথঘাট রেললাইন, ঝুনু, মেজমাসিমা, সুনুদা...উঃ মাগো!

কী হল রে রুবি? উবুড় হয়ে শুয়ে আছিস কেন? দেখি, জ্বরটর নয়তো?

মায়ের ঠাণ্ডা ভিজে হাত কপালে। রুবি ধুড়মুড় করে ওঠে। মায়ের মুখের দিকে তাকায়। হঠাৎ বেলাশেষের পাণ্ডুর আলোয় মাকে বড় লোভী মনে হয়। বড় স্বার্থপর আর হীনচেতা দেখতে পায়। তার মনে তীব্র প্রশ্নের ঝাঁক ছোঁ মারতে থাকে। কেন, কেন তার মা নতুনহাট ছেড়ে এক নতুন পুরুষের সাথে এখানে চলে

এসেছিল? কেন সেখানে থাকেনি সে? দাদু বদরাগী হিংসুটে হোক, নানা তো চমৎকার মানুষ। এখনও মাঝে মাঝে লাঠি ভর করে এবাড়ি এসে ওদের দেখে যান। এই বুড়ো বয়সে ওনার কষ্টের শেষ নেই। ছেলেরা পৃথকান্ন। কেউ দেখবার নেই। মসজিদের এমাম-গিরি করে কিংবা বিয়েসাদীতে মোল্লার কাজে যা অল্পস্বল্প রোজগার হয়। সাহানা বেগমের স্বাস্থ্যে এখনও ভাঁটা পড়েনি। রুবির মনে হয়, তার মা নানার কাছে থেকে গেলে কী ক্ষতি হত? বরং নানার জন্যে রান্নাবান্না করে রাখত। হাত পা টিপে আরাম দিত। আর এত চমৎকার উলবোনা আর সেলায়ের কাজ জানে মা। ও বাড়ির বিধবা সুতপা মাসি ওই করে কেমন সংসার চালাচ্ছে। ছেলেপুলে মানুষ করছে। মা কি সেটুকুও পারত না? তার মায়ের আসলে ওই জোরটা নেই। তার মা সুপতা মাসির মতো নির্লোভ বা নিঃস্বার্থ নয়।...

কী হল? ভুতের মত প্যাট প্যাট করে তাকাচ্ছিস যে?

রুবি জবাব ছায় না। আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায়।

পিছনে সাহানা বেগম বলে, অবেলায় এলোচুলে কোথায় যাচ্ছিস? কায়েতবাড়ি? দিনরাত্তির ওখানটা ছাড়া আর আড্ডা নেই তোর। লোকে কী বলছে খেয়াল আছে? এ্যাদ্দিন ছোট্ট ছিলি, যা খুসি করেছিস। আর পাড়াবেড়ানী হলে চলবে না কিন্তু।

রুবি ততক্ষণে চোখের আড়ালে চলে গেছে।

দিনটা ছিল খরদাহনের। আকাশ পুড়ে গিয়েছিল যেন। পৃথিবী তামাটে রঙ ধরেছিল। একবারও গাছের পাতাটি নড়েনি। সারাদিন প্রচণ্ড গরমের পর প্রত্যাশা ছিল সন্ধ্যায় কিছু হাওয়া মিলবে। কাছাকাছি অনেক বাড়িতেই ইলেকট্রিক পাখা রয়েছে। ওপাশে কনট্রাকটার খালেক সায়েবের বাড়ি, এপাশে সিঙ্গিদের বাড়ি—দুপুরে

গা জ্বলতে থাকলে সাহানা বেগম আড্ডা দেবার ছলে খালেকগিন্নির কাছে গড়িয়ে এসেছে। খালি মেঝেতেই শুয়ে পড়েছিল সে। খালেক গিন্নি তখন শশব্যস্তে খাট থেকে নেমে নিচে এসেছিল। মাদুর পেতে দিয়েছিল। মেয়েটি বেশ। দেখলে মনে হবে না যে চাষাবাড়িতে জন্ম—ওর বাবা একজন নিতান্ত 'সেখ'—এখনও লাঙ্গলের মুঠো ধরে! বড় ভাগ্যে খান্দানী মিয়াঘরে তার সাদী হয়েছিল। নিরক্ষরা ওই মেয়ের পেটে যারা জন্মেছিল, এখন তারা রীতিমতো খান্দান, তাকলাগানো চেহারা, একেলে চালচলন। স্কুল কলেজে পড়ছে। অথচ খালেকগিন্নি এখনও মনে মনে সেই চাষার মেয়েটি রয়ে গেল! খালেক চৌধুরী ওকে আদব-কায়দায় দুরস্ত করতে পারেন নি। আসলে মেয়েটি বড় সরলচেতা, বোকাহাবা। নয়তো এমন ক্ষেত্রে গরবে-গিদেরে মাটিতে পা পড়ত না! হীন যদি উচ্চে স্থান পায়, তার নাকি দেমাকে খৈ ফোটে। এ কথা আফজল খাঁয়ের। অথচ আকবরের মাকে দেখে এসো গে। তাই বলছিলুম বেগম, জন্ম যেথাসেথা হোক্ না, কিচ্ছু আসে যায় না। আচার-আচরণেই মানুষের পরিচয়। আমিও খালেকের মতো বংশটংশ মানিনি। তাছাড়া ইসলাম ধর্মে এসবের কোন বালাই নেই। ওসব আমরা হিন্দুদের কাছে শিখেছি।

ইসলামের কথা খাঁয়ের মুখে শুনলে সাহানা বেগমের পিত্তি জ্বলে যায়। তা সত্ত্বেও এ কথায় একটা গূঢ় রহস্য ছিল। খালেক চৌধুরীর বড় ছেলেটির বেশ কেমন চটপটে কথা, স্বাস্থ্যটাস্থ্যও চমৎকার। রুবির সঙ্গে যা মানিয়ে যায়!

সমাজ বলতে আজকাল বস্তুত তেমন কিছু না থেকেও আছে—সেটা অশরীরি অস্তিত্ব। খালেক চৌধুরী সেখের মেয়েকে বিয়ে করেছেন, খান্দানীকুলে এ একটা খাপছাড়া ব্যাপার। নিজের ছেলেমেয়েদের বিয়ের সময় এ নিয়ে যে কথা উঠবে, তিনি স্পষ্ট জানেন। শুধু ভরসা ওই টাকা আর বৃহত্তর সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁর মানসম্মান। দেখা যাক্।

দুপুরে নিঝুম পরিবেশে ফ্যানটা অবিশ্রান্ত ঘুরছে, আর দুই মধ্যবয়সিনী গল্প করতে করতে, কখন একটা কেজো প্রসঙ্গে পৌঁছেছে টের পায়নি।...তা রুবির কথা বলছেন বড়বিবি? মেয়ে আপনার সোনার চাঁদ মেয়ে—যে ঘরে যাবে, বাতি লাগবে না। লোকের কথায় ছাই দিয়ে ঠিকই সোনার ঘর পাবে দেখে নেবেন!

...তোমার ছেলেটিও বেশ ভাই। শিক্ষিত, চেহারা আছে, স্বাস্থ্য আছে! খালামা বলে ডাকলে কান জুড়িয়ে যায়। আর, ওর সময়-অসময় তো নেই, যখন খুসি হাজির হয় খালামা, খালামা বলে! আমার ভারি ভালো লাগে ভাই। নিজের পেটে তো আর এল না।

...একটা কথা বলছিলুম বড়বিবি! বলুন না খাঁসাহেবকে। কথাটা উনিই আকবরের বাপকে বলুন!

...বলব বলছো?

...হুঁ। অবিশ্যি যদি আমার জেতের কথা মনে না মানেন।

...যাও! কী বলছ ভাই! জাত কি মানুষের গায়ে লেখা থাকে। আমি জাতটাত মানিনে।

...সেইজন্যেই আপনাকে আমার এত ভাল লাগে ভাই। সেই যে কথায় বলে, বিষ নেই কুলোপানা চক্কর আছে। জানেন! আজও ওনার আত্মীয়-কুটুমরা এবাড়ি কাজেকম্মে জিয়াফৎ নেন না। আজ তেইশ-চব্বিশ বছর কাটালুম এবাড়ি, ছেলেপুলে যোয়ান হল—তবু আমার জাতের খোঁটা ঘুচল না। এমনকি, পাড়ার লোকেও কি কম কথা বলে আড়াল থেকে? কাজকর্ম হলেই দেখবেন, কোন মিয়াবাড়ি থেকে কজন আসে, বেশির ভাগই সেখ পাড়ার লোকেরা ওনার বন্ধুবান্ধব হিন্দু ভদ্রলোকেরা। লতিফ মিয়ার বাড়ির লোকেরা সেদিন খোকনের 'আখিকায়' (অন্নপ্রাশনে) বড় সাধে যদি বা এল, ছেলেকে একখানা হার গছিয়েই কেটে পড়ল। সাধাসাধি করলুম, খেয়ে গেল না।...তা আমিও তো দেখেছেন ভাই, কারো বাড়ি কাজকম্মে জিয়াফৎ খেতে যাইনে। ছেলেমেয়েরা যায়, উনি যান। জানি, ওরা মুখেই আমায় যাবার জন্যে সাধে। গেলে তো...থাক্‌গে।

খুব আনন্দ হল বড়বিবি। ইচ্ছে যখন হয়েছে, খোদা রাজী থাকলে চুকেও যাবে।

বড় আশায় আর আনন্দে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল সাহানা বেগম। সন্ধ্যায় খাঁসাহেব বাড়ি ফিরলে কথাটা তুলেছিল। আফজল বললেন, দেখি। তার আগে একবার মেজবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে নিই। তারপর বরং দুজনেই একসঙ্গে যাব।

ছোট্ট প্রাঙ্গণের একপ্রান্তে একটুখানি ফুলের বাগিচা—সুনন্দর হাতে তৈরী। একপাশে বাঁশের মাচা। এই গ্রীষ্মকালটা হেমনাথ সারারাত ওখানেই কাটান। একটু পরেই মাদুর আর সেকেলে প্রকাণ্ড গদীটা বয়ে আনবে সুনন্দ। চাকরবাকর এককালে ছিল, আজকাল নেই। সুনন্দ বলে, এতবড় গাঁট্টাগোঁট্টা মানুষ থাকতে আবার চাকর খুঁজতে হবে! আমিই মস্তো চাকর। আর ঝুনু, তুই হলি ঝি। কেমন? রাজী তো? ঝুনু বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু শেষ অব্দি, এই রাত্রিবেলা হঠাৎ দরকার হলে, দেখা যাবে হরিচরণের মুদিখানায় পেতলের সরা আর কাঁসার বাটি হাতে ময়দা-ডালডা কিনতে মেজবাবুর মেয়েটিই হাজির।

সকাল সকাল শুয়ে পড়েছিলেন হেমনাথ। একে ডায়াবেটিস, তার ওপর পেটের গোলমাল। যার বাবা ছিলেন দেশখ্যাত ডাক্তার, তার ছেলে এখন এ বয়সে অসুখে পচে যাচ্ছে। বড় সোমনাথ বাবার পেশা নিয়েছেন—তিনি থাকেন ধানবাদে। ছোট ওদিকেই একজন স্টেশন মাষ্টার। কেবল মেজ হেমনাথের কিস্সু হল না। যৌবনে দুষ্টুমির চোটে লেখাপড়াটা বেশিদূর হয়নি। জমিদারের নায়েবী করে কাটিয়েছিলেন—কিন্তু এক কানাকড়ি সম্পত্তি করতে পারেন নি। তারপর হলেন সরকারের তহশীলদার। কী সামান্য ভুলচুকে কর্তৃপক্ষের ধমক খেয়ে তক্ষুণি চাকরী ছেড়ে দিয়েছিলেন। দারুণ জেদী একরোখা মানুষ হেমনাথ। সম্ভবত, এই জেদ আর স্পষ্টভাষিতাই তাঁকে জীবনযুদ্ধে পরাজিত সৈনিক করে ফেলেছে। মিথ্যার প্রতি তাঁর ঘৃণার কোন সীমা নেই। দারিদ্র্য তাঁর

সয়ে গেছে ক্রমশঃ। কিন্তু তার জন্যে কারো কাছে হাত পাততে তিনি নারাজ। সামান্য দশবিঘে জমির আয়ে সংসারটা টেনেটুনে চলে। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার খরচও চলে যায়। এখন এই দিনান্তকালের জীবনে সুনন্দর প্রতি ভরসা রেখে তিনি বেঁচে আছেন।

আকাশে নক্ষত্র দেখেছিলেন হেমনাথ। দুচারটে মশা আছে—তারা জ্বালাতে সুরু করলে তখন ঘরে গিয়ে শোবেন। আপাতত অভ্যাসবশে যন্ত্রের মত হাতটা নড়ে পাখা দুলছিল। আঃ, এত গরম এবছরে এই প্রথম। ওই মল্লিকরা, সিঙ্গিরা বেশ আছে কিন্তু। মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে। নয়তো পাকা দালানবাড়ির ছাদে গিয়ে শোওনা তুমি! অত উঁচুতে মশাটশা যেতে পারে না। হঠাৎ একটু হিংসে জাগছিল ওদের প্রতি। মল্লিক খালেকের সঙ্গে কনট্রাকটারি করে। হাইওয়েতে কী কাণ্ড করেছে ভাবা যায় না। জায়গায়-জায়গায় কংক্রিট স্ল্যাব ফেটেফুটে পথটা ফের যা ছিল, তাই। চন্দ্রপুরের ওখানে ব্রীজটাই গেল ধ্বসে। কী চালাকি মেরে পয়সা ঘরে তুলল, ভাবলে মাথা গরম হয়ে যায়। আর ওই সিঙ্গিরা! এই তো সেদিনের কথা। দুর্ভিক্ষের বাজারে খুদ আর ভূষি বেচে···

হেম, ঘুমুলে নাকি হে?

খাঁসাহেব? আরে, এস এস। ঘুম কি এক্ষুনি আসবে? সেই সওয়া দুটোয় মেল ট্রেন যাবে, তার ভেঁা না শুনলে পার নেই রে ভাই।

আমারও ওই রকম।

চালাকি করো না এ বয়সে!···হেমনাথ উঠে বসলেন।···দিব্যি বউয়ের গায়ে গা মিশিয়ে রাত কাটাচ্ছ। তোমার বরাতটা দেখে হিংসে হয়!

চুপ, চুপ! ঝুনুরা রয়েছে।

হেমনাথ ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে অদূরে ঘরের জানালাটা দেখে নিলেন। আরে তাইতো! হেরিকেন জ্বেলে পড়তে বসেছে ঝুনু।

সুমু এখনও স্টেশন বাজার থেকে ফেরেনি। প্যাণ্ট কিনতে গেছে। একটামাত্র প্যাণ্ট দিয়ে কলেজ করছে কদ্দিন থেকে। জামাও একটা। দেখা যাক্। আমগাছটায় এবার ভাল আম এসেছে। ব্যাপারীরা আসছে কদিন থেকে। ঝেড়ে দিতেই হবে শেষ অব্দি। ছেলে-মেয়েদের ভাগ্যে ওগাছের পাকা আম কোন বছরই বা জোটে!

হেম!

হুঁ, বলো।

একটা পরামর্শের জন্যে এলুম। রুবির বিয়ে নিয়ে ওর মা তো জ্বালিয়ে মারলে হে! আমার অবস্থাটা তো কেউ বুঝতে চায় না। এদিকে—

বেশ তো! মেয়ে তো কারো ঘরে রাখবার জিনিস নয়। ভাল প্রস্তাব। হ্যাঁ হে, সেদিন যে কারা দেখেটেখে গেল, কী হল তার? জবাব পাওনি?

আর কি হবে? কতবার তো এরকম হলো। কে কোত্থেকে ভাঙচি দিয়ে বসছে। সে তোমার শুনেও কাজ নেই—আর বলতেও আমি পারব না। এখন কথাটা হল, চৌধুরীর ছেলে আকবরের জন্য চেষ্টা করলে কেমন হয় বলো দিকি? কলেজে পড়ছে—তাছাড়া…

খুব ভাল হবে, খুব ভাল হবে।…হেমনাথ সোৎসাহে বললেন। সত্যি, চোখের সামনে এমন সুপাত্র থাকতে চোখে পড়েনি এ্যাদ্দিন, এ বড় আশ্চর্য! তা কী করতে হবে বলো? চৌধুরীকে বলব আমি? আলবৎ বলব, বল কখন যাচ্ছ? নাকি একা আমিই যাব?

আফজল কানের পাশে অদৃশ্য উড়ন্ত একটা মশাকে মারবার ব্যর্থ চেষ্টা করে বললেন, তুমি একা যাবে?

ক্ষতি কী? আগে ওর মনোভাবটা তো বোঝা দরকার!… হেমনাথ চাপা গলায় বললেন।……মরা হাতীর দাম লাখ টাকা। তুমি হাজার হলেও বড় ঘরের ছেলে—আমি তো ভালই জানি। ওই খালেকের বাবা ছিল দরজী। স্টেশনবাজারে সেলাইয়ের মেশিন চালাত। আজ না হয় খালেক পয়সা করেছে, মানী লোক হয়েছে।

না—না, তুমি আগে যাবে কেন? আগে আমিই যাই। সকাল হোক্।

আর একটা কথা হেম।

বলো।

নুরু ক্রমাগত তাগিদ দিচ্ছে, বিনিময় করে ওর কাছে চলে যেতে। ভারি দোটানায় পড়ে গেছি ভাই। একবার ভাবছি, বরং রুবির বিয়েটিয়ে থাক্, চলেই যাই ওখানে। ওখানে আশা করি কোন অসুবিধে ঘটবে না। আবার ভাবছি……

ওঁকে চুপ করতে দেখে হেমনাথ শুধু বললেন, উঁ?

ভাবছি, সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে চলে গিয়ে কি সত্যি শান্তি পাব? আমার বাবা-দাদারা যে মাটিতে ঘুমোচ্ছে, সে মাটি ছেড়ে আর কোথাও গিয়ে কি ঘুম হবে হে হেম?

হেমনাথ কয়েক মিনিট চুপচাপ—তারপর গলা ঝেড়ে বললেন, আফজল! প্রাণ থাকতে এ তোমায় বলতে পারব না, একাজ তুমি করো। সত্যি, সত্যি আমার বড় কষ্ট হবে ভাই। সেই এতটুকুনটি থেকে দুটিতে বড় হলাম—মাত্র একটা পাঁচিলের এপার ওপার। এখনও যখন মনে অশান্তি হয়, হঠাৎ ওবাড়ির দিকে তাকালেই—বিশ্বাস করো আফজল, বুকটা ফুলে ওঠে। মনে হয়, যাই খাঁয়ের কাছে দুটো গপ্পসপ্প করে আসি। আমি তো ভাবতেই পারি না—ওবাড়ির দিকে তাকিয়ে আর বুকে বল পাবো না…দীর্ঘশ্বাস ফেলে হেমনাথ এবার খিকখিক করে হাসলেন। একটা হাঁটু উঁচু করে মাথাটা ঝুলিয়ে দিলেন তার পাশে; মুখ নীচু। ফের বললেন, তবে জানো হে, এ হচ্ছে নিছক সেন্টিমেন্টের কথা। পেটের ক্ষিদের চেয়ে আর ভয়ঙ্কর কী আছে বলো? তুমি সাতপুরুষের ভিটে আর শান্তি না কী বললে? হুঁঃ! সত্যি ভেবে ছাখো তো, কোন মানে আছে কথাটার?

আফজল তীক্ষ্ণদৃষ্টে হেমনাথের মুখ দেখবার চেষ্টা করেছিলেন অন্ধকারে। বললে, তাহলে চলে যাব বলছ?

হেমনাথ নড়ে উঠলেন হঠাৎ।...পাগল? আমি তা বলতে পারি?

আফজল ব্যস্তকণ্ঠে বললেন, কিন্তু চিরটাকাল তোমার পরামর্শ ছাড়া কোন কাজ তো আমি করিনি। করেছি কী? নুরুকে মামার কাছে পাঠাতে তুমিই বলেছিলে!

হেমনাথ ফের একটু হাসলেন।...বলেছিলুম। কেন বলব না? দেশে চাকরীবাকরীর যা অবস্থা, আত্মীয়স্বজন কোথাও না থাকলে সে গুড়ে বালি। ধরো, সুনুর মামা যদি আমেরিকায় থাকত, সুযোগ হলে সেইখানেই কি সুনুকে পাঠাতুম না ভাবছ? আমাদের জীবনের জন্যে ওদের তাজা প্রাণগুলোকে পচিয়ে ফেলতে পারব না ভাই। পারো তুমি?

আফজল মাথা দোলালেন। ...উঁহু।

কাজেই নুরুলকে পাকিস্তানে যেতে বলে কিচ্ছু ভুল করিনি।

কিন্তু আমার কথাটার কী হল?

কিসের?

এখানে থাকব না যাব?

হেমনাথ একটু ভেবে নিয়ে বললেন, ছাখো আফজল, যৌবন তো শেষ হয়ে গেছে। আর কতগুলো বছরই বা আমরা বাঁচব? চোখ বুজে নমোনমো করে এখন কোনভাবে কাটাতে পারলেই হল। তবে যদি বলো, এখনও তোমার আশা-আকাঙ্ক্ষা বা ভোগের ইচ্ছা আরও আছে, এখনও বড় লোক হবার সাধ তুমি ত্যাগ করোনি, তাহলে বলব—পাকিস্তান কেন, যে স্থানে সুবিধে বোঝ চলে যাও। আর যদি বলো, মেয়ের কিনারা করবার জন্যেই ভিটে ছাড়তে চাও—সেটা আমার মতে এখানে থাকলেও কি আর হবে না? কালই খালেকের কাছে যাচ্ছি। খালেক আমায় বেশ মানেটানে। কথা ফেলতে পারবে বলে মনে তো হয় না।

হঠাৎ চমকে উঠলেন দুজনে। খুব কাছে অন্ধকারে কখন প্রভাময়ী এসে দাঁড়িয়েছিল। বলল, কথা ত ভালই বলছ। কিন্তু ধরো, মেয়ের বে

হল, সব চুকে গেল। তারপর? আরো বুড়ো হবে যখন, কে দেখাশুনা করবে ওনাদের? জামাই এসে দেখবে ভেবেছ? হুঁঃ, ঝাঁটা মারো ও আশায়!

হেমনাথ ব্যস্ত হয়ে বললেন, তা'বলে—ধুর, ধুর! আমার কাছে ও পরামর্শ চাইতে এসেছে। আচ্ছা, তুমই বলো তো মেজবউ—আমরা কি ওকে ভিটে ছাড়তে বলব?

প্রভা কয়েক মুহূর্ত চুপ। তারপর ভাঙা গলায় বলল, তা কি বলা যায় ওনাকে? তবে কথা কি, আরো তো কত মানুষ রয়েছে—ধরো, যাদের কেউ দেখবার নেই, বুড়ো হয়েছে, তারাও তো আছে। আমাদের এখানকার হিন্দু মানুষদের কথাই বলছি। তারা সব কোন্ চুলোয় পালিয়ে বাঁচবে? ওদেশ থেকে যারা এদেশে এসেছে, তারা সবাই কি খুব সুখে আছে নাকি? রেফ্যুজিপাড়া আমি দেখেছি। মানুষগুলো কিভাবে বেঁচে আছে কে জানে!

হেমনাথ বললেন, না—নুরু আছে সেখানে। ভাল চাকরী করছে।

প্রভা ঝাঁঝের সাথে বলে উঠল, ছেলেদের কথা আর বলো না! কদিন বাদে বে করবে। ছেলেপুলে হবে। তখন কে কাকে দেখবে, আমি ঢের জানি। আমাদের সুনুর কথা বলবে? উঁহু—অমন শান্ত গোবেচারা থাকে তদ্দিন, যদ্দিন না বউ-এর মুখ দর্শন হয়! বুৎ! ও আশা আমি করিনে। আমার দাদাদের কাণ্ড তো চোখের সামনে দেখেছি! হাসতে লাগল প্রভা।

শেষ অব্দি কথাটা চাপা পড়ল। সুনন্দ এসে মাকে ডাকল। তারপর এসে গেল একাল-সেকালের তুলনামূলক আলোচনা। রাত যখন গভীর হয়েছে, হাসির মায়ের আবির্ভাব হল। ...ও মিয়াসাব, আজ খাবেন না বুঝি? আমার যে বাড়ি ফেরা হচ্ছে না ইদিকে। বিবিসাব আর কতক্ষণ হাঁড়ি আগলে বসে থাকবেন গো?

আফজল উঠে পড়লেন। ...চলি হে। কাল তাহলে তুমিই চৌধুরীর হাওয়াটা আঁচ করে এসো। কেমন?

হেমনাথ ডাকছিলেন, অ ঝুমু, একগ্লাস জল দিয়ে যাবি, মা। যবনটা আমার গলা শুকিয়ে দিয়েছে।

দূরে অন্ধকারে আফজল সাহেবের গলা শোনা গেল। ...কাফেরটাও আমার মাথা ধরিয়ে দিয়েছে হাসির মা, বুঝলি ?

অন্ধকার নিঃঝুম বাড়িটার দুপ্রান্তে দুটো ভাঙা গলার অট্টহাসি শোনা যাচ্ছিল।

অনেক দিন পরে হঠাৎ সেদিন আকবর এল এ বাড়ি। রুবি আর ঝুমু একটা এমব্রয়ডারির নক্সা নিয়ে বারান্দার মেঝেয় মাদুর পেতে ব্যস্ত রয়েছে। অভ্যস্ত ভঙ্গীতে আকবর দরজায় সাইকেলের ঘণ্টি বাজিয়ে ডাকছিল, খালামা, খালামা !

সাহানা রান্না ঘর থেকে হাসিমুখে বেরোল।...আকবর ! এস, এস ! অ রুবি এই ছ্যাখ, কে এসেছে। মোড়াটা বের করে দে ভাইকে।

রুবি মায়ের ব্যস্ততাটা লক্ষ্য করেছিল। একটু অবাকও হয়েছিল। আকবর আগে প্রায়ই আসত। তার সঙ্গে গল্প করত। তারপর একটা ছোট্ট ধ্যাপার ঘটে যায়। সে একদিন জলের গ্লাসশুদ্ধ হাতটা চেপে ধরে...থাক্ সে কথা। তারপর কয়েকদিন ও এবাড়ি আর আসেনি। অলস উদাস চোখে তাকে একবার দেখে নিয়েই রুবি নিঃশব্দে মোড়াটা এনে দিল। এবং ফের ঝুমুর সঙ্গে নক্সাটা নিয়ে ব্যস্ত হল।

আকবর বসলে সাহানা বেগম একটা হাতপাখা এনে নিজেই দোলাতে সুরু করলেন। আকবর হাঁ হাঁ করে উঠল। ...আরে, করছেন কী ! আমায় দিন।

সাহানা হাসিমুখে বলল, ভালো আছো তো বাবা ? অনেকদিন আসো নি কিন্তু। খালামাকে ভুলে গেলে ?

আকবর হাসল।...না, না। এমনি।

ঝুমু ফোড়ন দিল।...উঁহু। নুরুদা যখন থেকে নেই, তখন থেকে ওঁরও আর পাত্তা নেই। বন্ধুর শোকে ম্রিয়মাণ ছিলেন কি না!

আকবর বলল, যাঃ, নুরুলভাই আমার বন্ধু কী বলছিস? আমার এক বছরের সিনিয়ার। আমি ওকে ভাইজান বলতুম না?

ওই হল।...ঝুমু বলল।...ভাইজান নেই বলে যেন এ বাড়িতে আর কেউ নেই!

রুবি আড়ালে ওর আঙুলে ছুঁচ বিঁধিয়ে দিল। তারপর হেসে উঠল, ইস্, লাগল বুঝি?

সাহানা সরে গেলে আকবর বলল, রুবি যে কথাই বলছ না আমার সঙ্গে!

রুবি মুখ তুলে শান্ত হাসল। সুতো দাঁতে কামড়ে বলল, কথা বলব না কেন?

ঝুমু বলল, আকবরদা, ছবি দেখাবেন? অনেকদিন ফাঁকি দিচ্ছেন কিন্তু। দাঁড়ান হিসেব করি—সেই কবে যেন 'অমর স্বপ্ন' দেখে এলাম, সেই যে...রুবি, মনে পড়ছে না? কী মাস ছিল রে সেটা?...বলেই জিভ কাটল সে।...এই রে! মাসিমার কানে গেল বুঝি।

আকবর বলল, হ্যাঁ। সেবার যা ভেজান না ভিজিয়েছিলে আমাকে। উফ্! তুজনে দিব্যি রিকশোয় আরামে এলে—আমি পায়ের কাছে কুত্তার মতন!...সে হেসে উঠল।

ঝুমু বলল, বারে! কৃপণের শাস্তি হবে না? আরেকটা রিকশো নিলেন না কেন?

আকবর বলল, কী মুশকিল! তখন পয়সাকড়ি যে একেবারে শেষ।

ওটা চালাকি। ঝুমু অক্লেশে বলে দিল।...চৌধুরীর ছেলের জন্যে রিকশোর অভাব হত না। আসলে...হঠাৎ থেমে গেল সে।

আসলে কী? আকবর একটু ঝুঁকল।

থাক্ গে। অতীতের কথা অতীতেই থাক্। গোরস্থানে সমাহিত করলাম!...খিলখিল করে হেসে উঠল ঝুমু।

যাও! সবটাতেই ফাজলামি! বলে আকবর সিগ্রেট বের করল। তারপর সাহানা বেগমের অস্তিত্ব টের পেয়ে সোজা উঠে গেল রুবির ঘরে। জানালার পাশে তক্তাপোষে পা ঝুলিয়ে বসল। সিগ্রেট খেতে লাগল।

সাহানা চা-নাস্তা করতে ব্যস্ত। রান্নাঘর থেকে ডেকে বলল, রুবি, এদিকে একবার আসিস তো মা! চা-টা নিয়ে যাবি।

চাপা গলায় ঝুনু বলল, ওরেব্বাস! চা'টা দিচ্ছেন যে রে! ব্যাপার কী? মোঘল সম্রাটের হঠাৎ এত খাতির কেন? ওরে রুবি, তুই তলে তলে বেগম হচ্ছিস না তো?

রুবির ঠোঁটে একটা সূক্ষ্ম বিকৃতি দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। সে বলল, চুপ! তারপর রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

ঝুনু সেলাইয়ের নক্‌সাটা হাতে নিয়ে, দাঁতে ছুঁচ কামড়ে ঘরে ঢুকল। বলল, যাক্‌ গে। আমি ছোট মানুষ, বড় কথায় নেই। শুধু বলছি—মানে মহামান্য মোঘলবাদশাহের দরবারে নিবেদন করিতেছি যে, আমরা পুনরায় কবে চলচ্চিত্র দেখিবার সুযোগ লাভ করিব?

আকবর বলল, তথাস্তু।

হুঁঃ! একেবারে মুনিঋষির মত বাক্য। তা আকবরদা, আজ এরা যে আপনার বড্ড খাতির করছে! চা-নাস্তা বানাতে দেখলুম। ব্যাপারটা জানতে দোষ আছে?

ঝুনুর স্বভাব আকবরের জানা। সে মৃদু হেসে বলল, সেটা ওদের কাছেই জেনে এসো।

ওরা যে বলতে চায় না ছাই।

তবে তোমার বাবার কাছেই জেনে নিও।

সে তো সকাল বেলা শুনেছি রে বাবা!

তাহলে আর কী?

ধুস্‌! শুধু আবোল-তাবোল বকে। আমার বাবা আপনার বাবার কাছে যাচ্ছেন, এইমাত্র শুনেছি। কিন্তু রেজাল্ট? বুড়োরা তো সব পেটের ভিতর লুকিয়ে রাখে।

রেজাল্ট আমিও জানিনে।

ঝুনু সামান্য দূরে বসল। তারপর বলল, তা মশাই, বিয়ে যে করবেন—বউয়ের···থুড়ি! কী বলছি ছাখো। হেসে ভুলটা শুধরে নিল সে।···কনের মতটা জানতে ইচ্ছে করছে না?

আকবর যেন নিস্পৃহ ভাবে বলল, তা করছে বইকি!

ঝুনু কপট গাম্ভীর্যে বলল, কনের কিন্তু একটুও বিয়ের ইচ্ছে নেই।

আকবর হেসে উঠল।···যাও। জ্যাঠামি করো না।

সত্যি বলছি। বিশ্বাস করা আর না করা আপনার ইচ্ছে।

কেন নেই?

ও এখনও পড়াশুনা করতে চায়।

করবে। যদ্দুর খুসি···কোন আপত্তি নেই।

ঝুনু কী বলতে যাচ্ছিল, রুবি এসে গেল। চায়ের কাপ আর প্লেটসমেত ট্রেটা বিছানায় রেখে বলল, ঝুনু, ওই খবরের কাগজটা পেতে দে তো!

সাহানা বেগম এসে পড়ল, হন্তদন্ত।—কী কাজের ছিরি ছাখো! ও সব রাখ। এই দস্তরখানটা বিছিয়ে দে।

নক্সা-আঁকা সুন্দর একটুকরো কাপড় এগিয়ে দিল সে। রুবি সেটা বিছিয়ে দিল বিছানায়। ঝুনু মুখ টিপে হাসছিল। আকবর বলল, আরে, এসব কী হবে? না—না!

সাহানা চাপা হেসে চলে গেল। ঝুনু বলল, উরেব্বাস! ডিমের পোচ, সেমাই, ওটা বুঝি ফিরনি? আকবরদা, একা হজম হবে না কিন্তু!

আকবর করল কী হঠাৎ হাত বাড়িয়ে খপ করে রুবির একটা হাত—তারপর ঝুনুর, ধরে সামান্য আকর্ষণ করে বলল, তিনজনে একসঙ্গে খাব কিন্তু। নাও ফার্স্ট রুবি, হাত লাগাও!

রুবি ছাড়াবার চেষ্টা করে মৃদুস্বরে বলল, আঃ লাগছে! ছাড়ুন।

ঝুনুর বাঁ হাতটা ধরা, কাজেই ডানহাত চালিয়ে সে বলল, কী মুসকিল! ওর খাবার হাতটাই যে ধরে রয়েছেন মশাই!

রুবি একটু তফাতে বসে কুণ্ঠিত মুখে বলল, আমি ওসব খাইনে। বমি এসে যাবে।

আকবর ছেড়ে দিল হাতটা।—ঠিক আছে। আমিও খাবো না।

সেই সময় হঠাৎ আফজল এসে ডাকলেন, রুবি এদিকে আয়। এবং রুবি বেরিয়ে গেল। আফজলের চেহারায় কী একটা ছিল—কী একটা ছিল তাঁর ওই ডাকটাতে।

মানুষের মন—কোটি বছরের জীবজগতের সংস্কার হয়তো আজও তার মধ্যে কিছু না কিছু টিকে রয়েছেই—আমি ইনটুইশানের কথাই বলব—অন্ধকারে সাপের অস্তিত্বও কত সময় ঠিক সে টের পেয়ে যায়।

চায়ের কাপটা শেষ করতে পারছিল না আকবর।

আর ঝুনুরও সেলাইয়ে ভুল হচ্ছিল। জড়িয়ে যাচ্ছিল নক্‌সার রেখায়। কতক্ষণ ওরা কেউ কোন কথা বলছিল না। ইচ্ছে করছিল না বলতে।

তিন

অন্ধকারে সাপের উপমাই মাথায় এসে গেল।

ধরুন, অন্ধকারে একটা কিছু নিয়ে দিব্যি নাড়াচাড়া করছি খেলাচ্ছলে, সেই সেখানটাই আলো পড়ল দৈবাৎ, দেখি কি না—আ! কেউটের বাচ্চার মাথাটা চেপে ধরে দোলাচ্ছিলুম এতক্ষণ!

গা শিউরে ওঠে। গলা শুকিয়ে যায়! বুকে পড়ে হাতুড়ির ঘা। হঠাৎ নিজের প্রতি ভারি লোভও কি জেগে ওঠে না? জীবনের দামটা বেড়ে যায় না সঙ্গে সঙ্গে?

ঠিক সেই রকম।—

সেদিন রুবিকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে আফজল খাঁ খাটের ওপর ধুপ করে বসে পড়েছিলেন। ক্লান্ত আর হতশ্রী দেখাচ্ছিল লোকটাকে। চোখ দুটো লাল। মুখে চাপা উত্তেজনার

বিকার। এবং খুবই ভয় পেয়েছিল রুবি। খাটের অন্য কোণে একটা বাজু ধরে নিষ্পলক তাকিয়ে দেখছিল তার সৎবাপকে। পরস্পর তাকাতাকির মধ্যে কিছু কুণ্ঠা হয়তো ছিল। তারপর আফজল পাশ পকেট থেকে একটা খাম বের করে সামনে ছুঁড়ে দিলেন। শুধু বললেন, পড়ে গ্যাখ।

রুবির মা তখনও রান্নাঘরে। কী ঘটছে, তখনও সে টের পায়নি।

আফজল তারপর হঠাৎ উঠে গেলেন। কোথায় গেলেন, রুবি লক্ষ্য করল না। সে খামটার দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত, পোস্টাফিসের ছাপমারা চিঠি। আফজল সাহেবের ঠিকানা। প্রেরকের কোন নাম-ঠিকানা নেই। কিন্তু এ চিঠি যে নুরুভাইয়ের নয়, তা সে বুঝতে পারছিল। খামটাও পাকিস্তানী নয়। আস্তে আস্তে চিঠিটার দিকে হাত বাড়াল সে। তুলে নিয়ে একটুখানি নাড়াচাড়া করল। তারপর চিঠিটা বের করে ফেলল।

চমৎকার নীল ফুরফুরে কাগজে লেখা চিঠি। পরিষ্কার হস্তাক্ষর। 'শ্রদ্ধেয় জনাব' বলে আরম্ভ করেছে। ওপরে কলকাতার ঠিকানা। বুকটা ছলাৎ করে উঠল রুবির।

চিঠিটা পড়তে থাকল সে। প্রথমে দ্রুত—ক্রমশঃ গতি কমাল—তারপর খুবই আস্তে। প্রত্যেকটি বাক্য খুঁটিয়ে, মানে বোঝবার চেষ্টা করে, দুবার তিনবার পড়ে, একসময় যখন চিঠিটা শেষ করল সে—তার সারা দেহ যেন নিঃসাড় আর ক্লান্ত। টলমল করছিল জীর্ণ পুরনো ঘরের আসবাবপত্র। গায়ের ঘাম বেড়ে যাচ্ছিল। ঘাম জমছিল তার কপালে, নাকের ডগায়, চিবুকে। দৌড়ে কোথাও পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু দুটো উরু অসম্ভব ভারি আর দেহে কোন শক্তিই অবশিষ্ট নেই যেন।

চিঠির লেখক কতকগুলো প্রশ্ন করেছে মাত্র। ভঙ্গিটা খবরের কাগজ থেকে নেওয়া। আর কারো ব্যাপার হলে তো এতক্ষণ হাসতে হাসতে নাড়িভুড়ি বেরিয়ে পড়ত! যেমন, প্রথম প্রশ্নটা :—

"—ইহা কি সত্য? (আণ্ডার লাইনকরা বড় বড় হরফে) গত এপ্রিল মাসের কোন এক রবিবারে আপনার মেয়ে এবং এই ছেলেটি সারা দুপুর কুঠিবাড়ির জঙ্গলে অবৈধ সংসর্গে লিপ্ত হয়েছিল এবং খুব কাছেই আরো একজন আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিল —এমনকি আপনার কানেও তুলেছিল, কিন্তু আপনি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন!..."

হ্যাঁ। সেই দিনটার কথা পুরো মনে আছে আমার।—রুবি দ্রুত ভাবছিল।...অতিদ্রুত কিছু দৃশ্য তার মনের ভিতর ভেসে আসছিল।

সে একটা আশ্চর্য দিন। সুনুদাটা বড্ড খামখেয়ালী। আগের দিন সন্ধ্যায় এসে হঠাৎ বললে কী, এই রুবি পিকনিক করবে? আমি লক্ষ্য করলুম সুনুদা আমায় 'তুমি' বলল। এই প্রথম তার তুমি সম্ভাষণ কী ভালই না লাগল! বললুম আপত্তি নেই। কিন্তু মা আবার ছাড়বে তো? সুনুদা বলল, সে আমি দেখছি, তুমি যাবে কিনা বলো!...ঘাড় দুলিয়ে রাজী হয়ে গেলুম। সুনুদা বলল, ঝুনু যাবে, শেফালি যাবে আর ভাবছি কবীরকে বলব! সুনুদা ভ্রূ নাচিয়ে হাসল হঠাৎ। এ হাসি ওর মুখে যা মানায় ভাবা যায় না! ওর চেহারা কতকটা গ্রীকদেবতা এ্যাপোলোর মতো। কোঁচকানো চুল একটু লম্বা, শক্ত ঘাড়, খাড়া নাক, নীলচে চোখ, পাতলা ঠোঁট— আমি খুব খুঁটিয়ে দেখেছি বরাবর। কে জানে কেন ছেলেবেলা থেকে ওকে এমনি করে দেখাটা আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়েছিল। প্রথম প্রথম একটু লজ্জা হত। তারপর সেটা কেটে গিয়েছিল! ও যখন অন্যের সাথে কথা বলছে তখন যেমন মুহূর্তের জন্যেও ওর দিক থেকে চোখ ফেরাইনি—তেমনি আমার সাথে কথা বলবার সময়ও তাকিয়ে থেকেছি। ঝুনুটা বড্ড ঠোঁটকাটা। চিমটি কেটেছে। আড়ালে বলেছে—এই! অমন প্যাটপ্যাট করে দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকিস কেন রে? আমি রেগে গেছি। কিন্তু

জবাবও দিয়েছি। সোজা বলেছি, ওটা আমার অভ্যেস! ঝুনু বলেছে, বদ-অভ্যেস। দেখবি শেষে পস্তাতে হবে।—কেন ওকথা ঝুনু বলত তখন বুঝতুম না। এখন তো বেশ বুঝি। যাক্ গে মরুকগে। ঝুনু কম বয়সেই পেকে গিয়েছিল। আমি লক্ষ্য করেছি, আকবরের দিকে কেমন যেন…

ফের আজেবাজে কথা এসে পড়ল। সুনুদার হাসির কথা বলছিলুম। সুনুদা হেসে বলেছিল, কবীরকে নিতে হবে। কারণ, ওদের বাড়ি অনেক মুরগী আছে। বিনি পয়সায় পেয়ে যাব। আর শোন রুবি, তুমি শুধু দেবে পোয়াটাক চাল, একটু নুন, একটু তেল, কিছু পেঁয়াজ, আদা, লঙ্কা—ব্যাস! মনটা কেমন ঝিমিয়ে পড়েছিল হঠাৎ। সুনুদার চাঁদার লিষ্টি চোখের সামনে স্পষ্ট করছিল আমরা বড্ড গরীব। এত সব ধনসম্পদ স্ফূর্তিতে-ভরা দুনিয়াটায় আমরা এই ক'টি বাড়ির ছেলেমেয়েরা ভীষণ নিঃস্ব, ভারি অসহায়। তবে বনভোজনের ব্যাপার তো! অনেকবার এটা হয়ে গেছে—নতুন কিছু নয়, সে বারে নদী পেরিয়ে কাদের ক্ষেত থেকে আমি আর ঝুনু টমাটো, কাঁচালঙ্কা আর পেঁয়াজ চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ার দাখিল। উঃ! এখনও বুক ধড়ফড় করে মনে পড়লে। ভাগ্যিস লোকটা ছিল ভারি ভালো। পিছন থেকে ডেকে বলল, শোন খুকীরা, পালিও না। নিয়ে যাও কী নেবে!—লোকটার চেহারা কিন্তু ভয় পাবার মতো। ঢ্যাঙা মস্তো শরীর, ন্যাংটো বললেই চলে। মুখভরতি দাড়ি-গোঁফ। বড় বড় চুল। হলদে দাঁত আর খোকাদের মত লাল মাড়ি বের করে হাসছিল। আমরা ওর নাম রেখেছিলুম 'বাবা আদম'। খোদা নাকি আদমকে পাপের জন্যে বেহেশ্‌ত থেকে তাড়িয়ে দিলে সে এই দুনিয়ায় এসে চাষবাস সুরু করল। ভাবা যায়? সারা দুনিয়ায় এই একটামাত্র মানুষ—আর কেউ নেই! একা অমনি কোন নদীর ধারে সে খুরপী চালিয়ে মাটি থেকে ফসল ফলাচ্ছে। আমার তো গা শিরশির করছিল ভাবতে। সুনুদাকে বললে সে বলেছিল, তুই ভারি ভাবুক মেয়ে রুবি। নির্ঘাৎ কবি হবি।—

তা সুনুদার কাছে ক্ষের পিকনিকের কথা শুনে আমার মনে সেই পুরনো দৃশ্যটাই ভেসে উঠল। সেই অবাধ নির্জনতা, সবুজ ক্ষেত, হলুদ ফুল আর প্রজাপতিদের সুন্দর জগতটা আমায় জোরে টান দিতে থাকল টের পেলুম। এই টানের জোরটা যে বেড়ে গেছে হঠাৎ তার পিছনে কী যেন রহস্যময় ব্যাপার আছে। একটা ফুল-গাছের চারপাশ, ওপর-নীচেটা ঝোপঝাড় সাফ করে ফেললে সে যেমন হু হু করে বেড়ে উঠবে—তেমনি বেড়ে-ওঠা যেন আমার মধ্যেও ঘটে যাবে। এ আমার মুক্তির ডাক। আমি কি সাড়া না দিয়ে পারি? জানিনে ঝুনু বা আরো সব হিন্দু মেয়ে ঘরের মধ্যে বসেই এ মুক্তির স্বাদ পেয়ে যাচ্ছে কি না—ওরা তো কত স্বাধীন, কত সহজ স্বচ্ছন্দ! বয়স যত হচ্ছে টের পাচ্ছি আমি একটি মুসলিম মেয়ে, কোথায় কোন যাঁতাকলটিতে আটকা পড়ে আছি। চারপাশে সেই লক্ষ্মণের গণ্ডী, ঘেরাটোপ, সাবধান—পা বাড়ালেই রাবণরাক্ষস চুলের ঝুঁটি ধরে আকাশে পালিয়ে যাবে!

…যাক্‌গে মরুকগে। এ আমার ভাবপ্রবণতা হয়তো। সুনুদাই বলে, রুবিটা বড্ড ভাবপ্রবণ। ও কষ্ট পাবে।

…এপ্রিলের সেই সকালটা সারাজীবন আমার মনে থাকবে। কী চমৎকার মিঠে রোদ্দুর উঠেছিল দুনিয়ায়! আর আকাশটা ছিল হাল্‌কা নীল। চারপাশে এক শুচিতা ঝকমক করছিল। কুসুম-গঞ্জকে এত সুন্দর তো কোনদিন দেখিনি! নাকি সবই ছিল আমার মনের মাধুরী? নুরুভাইয়ের চিঠিটার জন্যে রাগ হচ্ছিল। এইসব সুন্দর পরিবেশ ছেড়ে সে কোথায় চলে যাবার ষড়যন্ত্রে আমাকে পাঠাচ্ছে? সত্যি যদি কোনদিন চলে যাওয়া ঠিক হয়, আমি—আমি কী করব? পালিয়ে যেতে পারব কোথাও? সে সাহস কি আমার হবে? আশ্চর্য, অনেকটা আগে সুনুদা যাচ্ছিল—প্রকাণ্ড একটা থলে তার কাঁধে। তাকে দেখামাত্র মনে কী যেন জোর এসে গেল। বুক ফুলে উঠল। মনে হল এইমাত্র আমার ভিতর এক চাঁদসুলতানার ঘুম ভাঙছে। আমি শিউরে উঠলুম।…

না—তখনও মনের আড়ালের আরো একটা ভয়ঙ্কর আর নিষ্ঠুর সত্যকে আমি টের পাইনি। কেউ তো এমন করে বলে দেয়নি তখনও যে, রুবি তুমি যা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছ তা একটা কেউটে সাপ!...

একসঙ্গে দল বেঁধে যেতে বারণ করেছিলেন আমার মা। মুসলিম খান্দান ঘরের মেয়ে, পর্দা না হয় মানলুম না—কারণ লেখাপড়া শিখেছি বা কালের হাওয়া সমাজকে বদলেছে কিছুটা—কিন্তু তাহলেও ইজ্জত বলে একটা কথা আছে। মজার কথা সুনুদাকে অস্বীকার করাও আবার মায়ের পক্ষে ভারি কঠিন। সুনুদা মাকে কবে জয় করে রেখেছে যে! যাই হোক, কবীর আর সুনুদা সবার আগে গেল। অনেকটা তফাতে আমরা তিনটি মেয়ে, আমি ঝুনু আর শেফালী। শেফালী বুদ্ধি করে ব্যাডমিণ্টন র‍্যাকেট ইত্যাদি নিয়েছে। ফ্রক যদ্দিন পরতুম তদ্দিন খেলেছি। এখন কি পারব? আমি নাকি গা-গতরে মুটিয়ে যাচ্ছি ক্রমশঃ। হবেও বা! আগের মত ছোটাছুটি করলে হাঁপিয়ে উঠব—সেটা ঠিকই। কেন এমন হল? শুধু অভ্যাস? অমন চটপটে চঞ্চল স্ফুর্তিবাজ মেয়ে ছিলুম—হয়ে পড়লুম ঢিলেঢালা আলসে শান্ত দেহ। দেহটা কেমন যেন ভারি হয়ে উঠেছে। হিসেব করে দেখলুম সাড়ি পরার বয়স হল মোটে সাড়ে চার বছর। এই ক'বছরেই আমার ছেলেবেলাটা পুরো ঝরে পড়েছে বোঁটা শুকিয়ে। আর তাই যেন, বড্ড লোভ হল, জেদ চেপে গেল মাথায় আজ ফাঁকা মাঠে মুক্ত হরিণীর মত দৌড়োদৌড়ি করতেই হবে। খুব গভীর থেকে কুঠীবাড়ির জঙ্গল আর নদীর তুনিয়া আমায় টান দিচ্ছিল, আর টান দিচ্ছিল চলে আয় রুবি, এই তোর আসল জায়গা। আমি তোকে আকাশ দেব—তুই হবি ছোট্ট একটা পাখি। তোকে দেব ফুলবাগিচা—তুই হবি তার প্রজাপতিটি।

খুব ব্যস্তভাবে জায়গা খোঁজা হচ্ছিল। সুনুদা বড্ড অতৃপ্ত ছেলে। পিঠে প্রকাণ্ড থলে রেখে একটু কুঁজো হয়ে সে এখান থেকে ওখানে

যাচ্ছে। আমার চমক খেলে যাচ্ছিল। কবে কোনদিন কি এমন কিছু ঘটেছিল ? সে যেন অতীতের একটা আশ্চর্য কাহিনী। দুর্ধর্ষ হুনেনেতা এ্যাটিলা, নাকি গ্রীক আলেকজাণ্ডার, নাকি কোন অভিযাত্রী বিদেশী সেনাপতি এমনি কোন নদীর ধারে তাঁবু ফেলবার জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছিল ? তার মুখ, তার চেহারা যেন ছিল ওই সুনুদার মত। রোমাঞ্চিত হল শরীর। ফ্যাকাসে গৌর রঙ, লম্বা পা ফেলে হাঁটা, শক্ত ঘাড়, উন্মন দৃষ্টি—এ মানুষ কুসুমগঞ্জের মানুষ নয়। এ কখনও কায়েতবাড়ির মেজবাবুর বড়ছেলে নয়। এর সঠিক জাত আমি জানিনে। এ পুরুষ সম্পূর্ণ নবাগত। অথচ একে আমি যেন চিনি। এ পরিচয় কত কতদিন আগের ! এমনি সবুজ বন নদী ঘাসের দুনিয়ায় আমাদের পরস্পর দেখা হয়েছিল, যেমন করে বেহশ্‌তভ্রষ্ট আদম আর ইভের দেখা হয়ে যায় !

আমি মুসলমানের মেয়ে। পুনর্জন্ম আমার মানতে নেই। ওটা ঝুনুরা মানে, হয়তো সুনুদাও মানে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল, জন্ম-জন্মান্তর বলে সত্যি কি কিছুই নেই ? নেই যদি তাহলে এত হাজার মানুষের মাঝখানে কেন একজনকে দেখেই মনে হয়—চিনি, ওকে আমি চিনি, ওকে আমি চিনি ! আর আব্বা সব সময় গল্প করেন, তাঁর খান্দান নাকি পারস্য থেকে এসেছিলেন ! আমার রক্তেও নাকি কোন বিদেশী জাতের ছিঁটেফোঁটা থাকা স্বাভাবিক—কারণ আমার দাদু-নানারাও খান্দান ঘরের মানুষ। কে জানে কী, আমার মনে হয়—আমার শুধু একা কেন, ওই সুনুদারাও হয়তো বহিরাগত। তা না হলে ওর চেহারায় গ্রীকদেবতার আদল কেন ?……

জায়গা অবশেষে ঠিক হল। উঁচু ঝোপের ভিতর একটা সবুজ ঘাসে ঢাকা জমি ! ছোট্ট শাবল দিয়ে উনুন খুঁড়তে থাকল ঝুনু। বাইরে পা বাড়ালুম। দূরে সুনুদা একটা নীচু গাছ থেকে শুকনো ডাল ভাঙছিল। এগিয়ে গেলুম কাছে। সুনুদা বলল, রুবি, এই ডালটা টেনে ধরো দিকি। আমি উঠে গিয়ে চাপ দিচ্ছি—নয়তো ভাঙতে চায় না।

প্রাণপণ শক্তিতে ডালটা ধরে থাকলুম। সুনুদা গাছে উঠে পায়ের চাপ দিচ্ছিল। হঠাৎ হুড়মুড় করে ডালশুদ্ধ সুনুদা আমার ওপর এসে পড়ল। দুজনে জড়াজড়ি পড়ে গেলুম। সামান্য আঘাত লাগল। কিন্তু আমি নীচে, সুনুদা ওপরে—তার দেহের ভার নিয়ে আছি—হঠাৎ আমার মনে হল, সুনুদার চোখে কী খেলা করছে! আমার লজ্জা করল। চোখ দুটো বুঁজে ফেললুম। তারপর টের পেলুম, সুনুদা আমার হাত ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে দিল। এবং···

সেইটুকুই কি অবৈধ সংসর্গ? হ্যাঁ, সুনুদা হঠাৎ আমায় চুমু খেয়ে বসেছিল। আমার কেমন যেন হয়ে যাচ্ছিল, অবশ দেহে দাঁড়িয়েছিলুম। সরিয়ে দিতে হাত ওঠেনি। আর আস্তে সুনুদা বলল, রাগ করলে রুবি? আমার···আমার হঠাৎ এত ভালো লাগল তোমাকে!···

···মাঝে মাঝে ভেবেছি সেই ছোট্ট ঘটনাটার কথা। আমার মন কি পানির মতো? তা নাহলে কোন দাগ কাটল না কেন? অল্পক্ষণের জন্য সামান্য শিউরে ওঠা, মৃদু কাঁপন মাত্র, তার পর ঢেউটা চাদ্দিকে মিলিয়ে গেল কোথায়। মা বলে, আমি খুব বোকা মেয়ে। শুধু প্যাটপ্যাট করে তাকিয়ে থাকতেই জানি। সাত চড়ে রা থাকে নেই মুখে। মা বলে, এ মেয়ের ভবিষ্যৎ কী হবে সেই ভেবে চোখে ঘুম নেই গো! একটুখানি চটপটে চালাক-চতুর না হলে কি এযুগে চলে? শ্বশুরঘর তো করতেই হবে একদিন, তখন যে হারামজাদী মেয়ের আমার হাড়ির হাল হবে—এ আমি হলফ করে বলতে পারি।··· মায়ের কথা শুনে সত্যি ভয় করে আমার। কী হবে আমার, কী হবে! আমি যেন আস্ত ভূতের মত রাস্তার মোড়ে উপুড়করা ওই কালো-সাদা ড্রাম--ভিতরে অস্থির সবুজ ঘাস আলো-হাওয়ার অপেক্ষায় শুকোতে শুকোতে মরে যাচ্ছে। অথচ বাইরে থেকে কিছু বোঝবার উপায় নেই। বাইরেটা এত নিরেট আর বোকাহাবা দেখাচ্ছে।

ভালবাসা শব্দটা কতদিন থেকে আমার কানে আসছিল—ওটা হয়তো মেয়েদের কাছে জীবনের একেবারে বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ। প্রকৃতির পাঠশালা থেকেই ওর স্থরু। চারপাশ থেকে বানান করে, বানান করে, কলকণ্ঠে নামতা পাঠের মত উচ্চারিত হয়—একটি পড়ুয়া চুপচাপ দাঁড়িয়ে ফাঁকি দিলেও তার শেখা হতে বাধে না। চুপচাপ থেকে ফাঁকি দিয়েও আমার ও শব্দটা মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। অথচ ওর মানেটা বুঝিনি। বুঝিনি বলেই হয়তো স্থনুদার চুমু খাওয়ার তাৎপর্য আমি টের পাইনি তখনও। শুধু চমক লেগেছিল। কাঁপন এসে গ্রাস করেছিল সারা দেহ। এইমাত্র।

কিন্তু একটা ব্যাপার আমার অজানতেই ঘটেছিল। সেদিন সারাহুপুর থেকে বিকেল অব্দি যতক্ষণ আমরা কুঠিবাড়ির জঙ্গলে বনভোজন করলুম, সব সময় বারবার আমার মনে হতে থাকল—একটা কিছু হবে, একটা কিছু হবেই। তা সুন্দর, তা আকাঙ্ক্ষিত, তা বরণীয়। অন্ধের চোখ ফোটার মতো দুনিয়ার কোন দরজা খুলে যাবে এবং বেহশ্‌তের সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়বে!

কবীর বার বার বলছিল, রুবি কী ভাবছে বলতে পারি, বুঝলে ঝুনু?

ঝুনু বলল, ছাই পারো। আমার কাছে শোন, ও—বলব রুবি? থাক্ ভাই। অপ্রিয় সত্য না বলাই ভালো। সঙ্গে সঙ্গে আরেকজনও চটে চাঁটি মারতে আসবে।

ঝুনুটা যেন সব টের পায়। ও বাচাল হলেও খুব চালাক মেয়ে। ও কীভাবে সব টের পায় কে জানে! ওকে অপছন্দ করার পক্ষে এই দোষটাই যথেষ্ট—কিন্তু ওর মধ্যে আরও অঢেল গুণ রয়েছে। অন্য হিন্দু মেয়েদের মত ও পায়ে পায়ে কুসংস্কারে জড়ত্ব পায়নি। আমার সহপাঠিনী অজস্র হিন্দু মেয়েকে দেখেছি যেথা-সেথা কপালে বুকে হাত ছুঁইয়ে কার উদ্দেশ্যে প্রণাম করছে। এটা ছোঁবে না, ওটা ছোঁবে না। জোড়া শালিখ দেখলে সঙ্গে সঙ্গে ঢিপ ঢিপ প্রণাম আর খুশিতে ফোয়ারা ছোটাবে। কথায় কথায় ঠাকুর

দেবতার নাম করবে, আর ওদের বাড়ি গিয়েও দেখেছি, সেই পূজোআচ্চা, ব্রত, ঢিপ ঢিপ প্রণাম, চটকানো প্রসাদ, গঙ্গাজল··· আমার তো মোটে একটা গণ্ডী, ওদের গণ্ডীর কোন সংখ্যা নেই। ওরা হাঁফিয়ে পড়ে না কেন তাই ভাবি। এ নিয়ে প্রশ্ন করলে ঝুনু বা শেফালী বলেছে, ওসব বাবা আমরা করিটরি না—পোষায় না। যারা করে-টরে, তাদের শুধোও। দারোগাবাবুর মেয়ে অণিমা ছিল এসব ব্যাপারে সবার সেরা। তাকে প্রশ্ন করতে গিয়ে একদিন যা অপমানিত বোধ করলুম, বলার নয়। অণিমা মেজাজে জবাব দিল —তোমরা মুসলমানরা ওসব বুঝবে না। গরু খেয়ে খেয়ে তোমাদের বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে গেছে। এসব সূক্ষ্ম ব্যাপার।

উঁহু, ভাবনা গুলিয়ে যাচ্ছে। টের পাচ্ছি, একটা ঝড় বইছে কোথাও—দিগন্তে চাপা মেঘের ইসারা আর বিদ্যুতের ঝিলিক। কোথায় এতক্ষণে কী সর্বনাশ হয়ে গেল কে জানে! এ বয়সেই টের পাই, মনের অনেকখানি আমার অজানা। সেই অজানা জায়গায় একটা কিছু তোলপাড় ঘটতে লেগেছে, এটা ঠিকই। একটা গভীর চাপা গুরগুর শব্দ শুনছি যেন। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে, কী হারাচ্ছি অজানতে। অন্ধকার ঘরে চোর ঢুকে কী সব নিয়ে পালাচ্ছে। কোন আলোর নাগাল পাচ্ছি না। চোখ ফেটে জল আসছে, গাল ভিজছে। হাত দুটো অবশ। আমি তো কাঁদতে চাইনে—কে কাঁদছে এখন ?

চার

তাহলে—

অন্ধকারে হাতের সাপের ওপর অপর আলো পড়ার উপমা দিয়েছিলাম আমি—এ কাহিনীর লেখক। মমতাময়ী পাঠিকা, আপনি কি টের পেলেন কিছু ? ওই আলোটা লক্ষ্য করুন। যদি

বলি—কল্পনা করুন, এক সুবৃহৎ প্রাচীন দুর্গের মধ্যে পৃথিবীর সব ঘটনাই ঘটছে, এবং মাঝে মাঝে তার দেওয়ালের বুরুজঘর থেকে কালান্তর হাবসী প্রহরী মশালটা উঁচু করে আলো ফেলছে—আপনি কি আমায় খুবই গোঁড়া রোমান্টিক ভাববেন? এবং আলো পড়লেই, আ ছি ছি ছি! এ আমি কী করছি? এবং ঘৃণা, ত্রাস, বিস্ময়, শোক, যন্ত্রণা, বিপদ।

তা না হলে অবচেতনাময় সেই অন্ধকারে সবই আনন্দ আর শান্তির মত মনে হয়। কিংবা হয়তো বা কিছুই মনে হয় না।

আঠারো বছরের মুসলিম মেয়েটি জীবনে এই প্রথম জানতে পারল—ভালবাসা মানে আসলে যন্ত্রণা।

রুবি এবার দ্বিতীয় প্রশ্নের দিকে চোখ রাখল।

"ইহা কি সত্য যে এ ঘটনার মাত্র কদিন পরে বাড়িতে যখন আর কেউ ছিল না, আপনার মেয়ে একা—তখন এই দুশ্চরিত্র ছেলেটি গিয়ে পড়ে এবং তারপর দরজা বন্ধ করে অবৈধ যৌনাচারে লিপ্ত হয়? তারা এমন মত্ত অবস্থায় ছিল যে, প্রথমে আপনার স্ত্রী, পরে আরও একজন বাইরে থেকে অনেক ডাকাডাকি করবার পর দরজা খোলা হয়। আপনার মেয়ের চেহারা তখন ভীষণ ক্লান্ত আর বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল। অবশ্য ইতিমধ্যে পাঁচিল ডিঙিয়ে লম্পটপ্রবর কখন গা ঢাকা দিয়েছে।"......

...খুব যে হাসি পাচ্ছে আমার। আমি কি এখন একটু হাসতে পারি? কিন্তু খবর্দার! এখন যে আমার হাসতে নেই। কারণ ভালবাসা আষ্টেপিষ্টে বেঁধে ফেলেছে আমায়! চোয়াল দুটো আঁটো করে ধরে রয়েছে। অনবরত সে বলছে তুই কাঁদ রুবি, ভীষণ জোরে কাঁদতে থাক্।

হ্যাঁ, সেই দুপুরবেলাটা আমার বয়সের কাছে আরেকটা সাংঘাতিক চমক বটে। কী মাস ছিল যেন সেটা? চৈত্র। হ্যাঁ, বাইশে চৈত্র। দেখছ? তারিখটা দিব্যি মনে পড়ল। বার? রোববার। বড় রাস্তার ধারে কোথাও আব্বার কিছু বাঁজা জমি

ছিল। কোন মাড়োয়ারী সেটা কিনতে চেয়েছে বলে আব্বা তাকে জমি দেখাতে নিয়ে গেলেন। মা গজগজ করছিল।...অমনি করে সব বেচে-বেচেই খেয়ে ফ্যালো। এর পর নবান্নের ধান কটাও আর ঘরে আসবে না তো! তোমার যা খুসি করো—আমি কী বলবো? এ্যাদ্দিন না হয় ছেলেটাকে মানুষ করার অজুহাতে 'বাপোতি' সম্পত্তিটুকুন যা ছিল চোখবুজে বেচে এলে। এবার তো নুরু চাকরী করছে। মাসে মাসে লোক এসে বর্ডার পেরিয়ে টাকা দিয়ে যাচ্ছে। তাতেও কুলোচ্ছে না তোমার? রোজ ঘি কালিয়া না খেলে মিয়ার মুখে ভাত ওঠে না। ওদিকে ধিঙ্গি মেয়ে বনের বাঘের মতো ঘাপটি পেতে রয়েছে। সে যে কবে ঘাড় ভাঙবে খেয়াল আছে? তখন কি বেচবে শুনি? কোন্ না হাজার তিনের কমে পার পাবে, এ্যঁা?...আব্বা এমনিতে ভারি চমৎকার মানুষ। কিন্তু বড় সহজেই রেগে যান। আর রাগলেই তখন বাঁধা বুলি—বলো, বলো তাহলে কী করতে হবে আমাকে? নাকখপ্দা দেব? পাঁচ হাত পাছা ঘষড়াবো মেঝেয়? নাকি নিজেকে জবাই করে খুন এনে দেব?...ব্যাস! মা হাতের কাজ ফেলে ধুম করে গেল বেরিয়ে। যাবে আর কোথায়? মোল্লার দৌড় মসজিদ। হয় কায়েতবাড়ির উঠোন, নয় তো চৌধুরীর বিবির কাছে। আমি গা করছিলুম না এসবে। সারাজীবন তো এমনি দেখে আসছি। রাত্তিরটা হোক্ না। তখন ঠিকই মিয়াসাব বিবিজীর পায়ে ধরতে বাকি রাখবেন। শুনতে নেই—গুরুজন, তবু রাতদুপুরে কানে আসে—মা মেঝে থেকে খাটে যাবে না, আব্বা বেড়ালের মত ম্যাঁও ম্যাঁও করে বলবেন, ছাখো দিকি কাণ্ড—আমি কি কখনও একলা বিছানায় শুয়েছি? বলো সাহানা। আমার একলা শুয়ে ঘুম হয়? বোবায় ধরে না?...

মা বেরিয়ে গেলে আব্বা কিছুক্ষণ উঠোনে দাঁড়িয়ে ফোঁস ফোঁস করলেন। তারপর একেবারে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েকমিনিট। বাইরে মাড়োয়ারীর লোকে ডাকাডাকি করছিলো।

—দেরি হচ্ছে মিয়াসাব। মোহনলালজী এতক্ষণ গাড়ি নিয়ে চলে গেছেন ওদিকে।

আব্বা হঠাৎ ভুম করে বেরিয়ে গেলেন। হাসির মা মুখ টিপে হাসছিল। এবার বুড়ি ডেকে বলল, নাও ঠ্যালা! আমি ভাবছি সকাল সকাল খানা-পাকানো সেরে একবার ঘর ঘুরে আসব, জামাই এয়েছে। ইদিকে কী জ্বালায় পড়লুম, ছ্যাখো! অ রুবি, গোশত ধুয়ে রেখেছি, মশলাও বেঁটেছি, রঁাধতে পারবে না মা? আমি একবার ঝট্ করে ঘুরে আসি ঘর থেকে। আমার রান্না তো বিবিজীর পছন্দ হবে না!

রান্না আমি জানিনে মোটে। মা এর জন্যে মাথা ভাঙতে বাকি রেখেছে, আমি পাত্তাই দিইনি। মা যতই করুক, আমার ওপর শেষঅব্দি বেশি জোর খাটাতে চায় না বা পারে না সেটা বুঝতে পারি। তার ওপর আমার দিকে আব্বারও যেন সমর্থন ছিল পুরো।...বারে! মেয়েকে এদিকে লেখাপড়া শেখাচ্ছ—আবার হাতে হলুদ মাখতে বলবে নাকি? দুই একসাথে হয় না; হয় এটা করুক, নয় ওটা।...এরপর মা যা যা বলতে পারে, জানা কথা সবার। যাই হোক, মা ক্ষান্ত দিত শেষটা। তবে শুধু এ ব্যাপারে নয়—সবকিছুতেই লক্ষ্য করেছি—মা আমায় মেনে নিয়েছে বা এখনও নিচ্ছে। সেকি আমি পিতৃহারা বলে? এমন চমৎকার একজন আব্বা থাকা সত্ত্বেও মায়ের বুঝি মন ভরে না! হয়তো মায়ের মতো কোন মেয়েরই ভরে না। দ্বিতীয় স্বামী বুঝি বা মায়ের নিছক আটপৌরে প্রয়োজনের জিনিস, প্রথম স্বামী হয়তো তারও বেশি কিছু—স্বপ্ন-সাধ-আহ্লাদে রঙীন। কারণ এই প্রথম পুরুষটির প্রত্যাশা নিয়েই তো সব মেয়ের এগিয়ে আসা যৌবনের দিকে! কেউ যদি বলে, এত আমি কোথায় শিখলুম—তো বলব, সেই প্রকৃতির পাঠশালায়। মেয়েরা বয়সের আগে-আগে দৌড়তে পারে। আর আমি—মুখ-টেপা চাপা মেয়ে, ভিতরে ভিতরে পেকে লাল হয়ে আছি। এবং এ কি না আমার পরম বান্ধবী সুখ-দুঃখের চিরসাথী ঝুমুর বয়ান!

তা হাসির মার কথা শুনে আমি বললুম, তোমার বিবিমিয়ার ও বেহেশতী খানা আমি পাকাতে পারব না। শাকচচ্চড়ি ডালনা মুড়িঘণ্ট দাও, আটকাবে না।

হাসির মা দাঁত ছরকুটে হাসল।...শোন মেয়ের কথা। হেঁদুর বাড়ির হাঁড়ি খেয়ে আস্ত হেঁদু হয়ে গেছে রে বাবা!...সে হঠাৎ গলা তুলে বলল, বলব কায়েতগিন্নিকে—রুবির একটা হেঁদু বরই জুটিয়ে দিক্। জাতভাইয়ে ওর মন ভরবে না গো!

ধমক দিয়ে ওর তামাশা থামিয়ে বললুম, খুব হয়েছে। যাও দিকি, মাকে ডেকে নিয়ে এসো। তারপর যে দোজখে যেতে চাও যেও। আমি একা শ্যাল-শকুন পাহারা দিতে পারব না বেশিক্ষণ।

আমার আক্রমণের লক্ষ্য আব্বার অতিপ্রিয় দৈনন্দিন খাদ্য গরুর গোশত—বুড়ি সেটা টের পেয়ে জিভ কেটে বলল, ও মা! ছি ছি ছি! হালাল জিনিসকে হারাম করে ফেলবে গো মেয়েটা। কী জাতনাশা মেয়েরে বাবা! রোস, বলছি গে তোমার মাকে।

বুড়ি রেগে কাঁই। নড়বড় করে রোগা মুরগীর মত খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে গেল। রাগটা নিশ্চয়ই তার ধর্মজ্ঞানের খাতিরে নয়—সে আমার জানা। কারণ, ওকে কায়েতবাড়ি কত সময় পূজোপার্বণ কী উৎসবে একগুচ্ছের লুচি বুঁদে তরকারি বয়ে নিয়ে যেতে দেখেছি। এদিক ওদিক চাইতে-চাইতে বকের ঠ্যাঙ ফেলে হাঁটে তখন—বুকের কাছে কাপড়ের আড়ালে জিনিসগুলো লুকনো। একদিন হয়েছে কী, আমাদের কাজ সেরে বেরিয়ে যাবার পর হঠাৎ ফের সে এল। ...ওই যা, লাউশাকগুলো নিতে ভুলে গেছি। মা শাকের গোছাটা ওকে দিতে গিয়ে বলল, হাসির মা, তোমার পেট থেকে ও কী পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা? কিছু না, ইয়ে...বলে বুড়ি পালাতে পারলে বাঁচে। মা হাসছিল। ফোঁটাগুলো বোঁদের রস। মা বলল, নিয়েছে তাতে লজ্জা কিসের এত? গরীব মানুষ—পেটের দায়ে সবারই খেতে হয়। তাতে দোষ কী বাপু? নবীসায়েব বলেছেন, জানবাঁচানো ফরজ (অবশ্য কর্তব্য)। আমি ঠাট্টা করে বললুম, আমি কিন্তু পেটের দায়ে

কায়েত-বাড়ির খাইনে—ইচ্ছে করেই খাই। তুমিও তো খেতে বলো
বলো না মা? শুনে মা গেল রেগে। তোর আবার জাতটাত আ
নাকি? তুই তো আকাট হিঁদু!

...কোথায় এসে পড়লুম! সেই চৈত্রের দুপুরে পৌঁছতে আম
কি সারাবেলাটাই কেটে যাবে? যাবে, যাবে! এ যে উজে
স্রোতে সাঁতার কাটা! আর আমার মেয়ের মন বলে, একগ্রা
ঝটপট সব খেতে নেই। একটু-একটু করে খাও। আগে খোস
ওপরটা, তারপর ক্রমে-ক্রমে ভিতরের শাঁস, তারপর সেই রস
কেন্দ্রটুকু। বেশি তাড়াহুড়ো করতে নেই। একটা শিকারের বই
পড়েছিলুম, বাঘিনী শিকারের জন্য একটা ছাগলকে টোপ ক
হয়েছে। বাঘিনী করল কী, এসেই টোপ কেন্দ্র করে ঘুরতে লাগ
প্রথমে অনেকটা পরিধি নিল—তারপর ক্রমশঃ পরিধি ছোট হ
আসতে লাগল। তারপর আরো ছোট বৃত্ত, আরও, আরও—
এবার টোপ তার দাঁতের কাছেই।...

হাসির মা চলে গেল তো গেলই। ফেরবার নাম নেই। খিড়
দরজায় উঁকি দিয়ে এলুম। দেখতে পেলুম না কাকেও। তাহ
নির্ঘাৎ চৌধুরীবাড়ি বিবিসায়েবা নরক্ গুলজার করছিল, বুড়ি
তাতে জমিয়ে ফেলেছে। ওদের স্বভাব তো আমার জানা।
লোকের বাড়ি পাত্তা পেলে এইসব গরীব ঘরের মেয়েরা তো বেহ
হয়ে নিজের ঘরের নাম ভুলে যায়। কতবার ওবাড়ি থেকে চৌধু
বউ আমায় ডেকে পাঠিয়েছে বা মা সাথে নিয়ে যেতে চেয়েছে, আ
যাইনি। কেন যাব? ইলেকট্রিক ফ্যানের গল্প শুনতে? ন
আলমারি দেখতে? বৈঠকখানা—ওদের ছেলেমেয়েরা বলে 'ড্র
রুম' সোফাসেট দেখতে? শুধু একটা লোভ থেকে যায়, সে
রেডিওর। থাক্। মন চাইলে শেফালীদের বাড়িই যাব ব
শেফালীর বাবা হোমিওপ্যাথির ডাক্তার। কোনরকমে-সংসার চ
যায়। রেডিওটা শেফালীর দাদা বিয়েতে যৌতুক পেয়েছে।
বৌদি এত চমৎকার মেয়ে—কোন জাতবিচার নেই, কায়েতবা

তা। ওরা পূর্ববঙ্গের লোক। আশ্চর্য লাগে, ওরা নাকি মুসলমানদের
য়েই এদেশে পালিয়ে এসেছিল। অথচ আমি যে মুসলমান, দিব্যি
দের রান্নাঘরে ঢুকছি, শোবার ঘরে খাটে গিয়ে গড়াচ্ছি—ওরা তো
কটুও ঘেন্না করে না! নাকি পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের চেয়ে
র্ববঙ্গের হিন্দুরা অনেক উদার অনেক বেশি সভ্য? কে জানে কী
াপার—আমি এতবড় দেশটার কতটুকুই বা জানি!

...চলে এলুম খিড়কি থেকে। সর্বনাশ, ওদিকে সদর দরজা যে
হাঁ করছে, খোলা! তাড়াতাড়ি গিয়ে বন্ধ করে দিলুম। কিছু ভালো
াগছিল না। ঝুনুটা গেছে মামাবাড়ি বেড়াতে। শেফালী গেছে
ঁদির সঙ্গে সকালের সিনেমায়। আমার কোথাও যাওয়া হল না!

হঠাৎ দেখি খিড়কির দরজা দিয়ে আকবর ভাই ঢুকছে। চমকে
ঠতুম না। কিন্তু খিড়কির দরজাটা সে বন্ধ করে দিচ্ছিল। তাতেই
ামার পা দুটো কেন কে জানে ভারি হয়ে উঠল। আকবর চৌধুরী-
ড়ির বড় ছেলে। সব সময় সে এবাড়ি আসে। আমার সঙ্গে
থা বলে, আমিও বলি। যদিও মাঝে মাঝে ওকে মনে হয় বড্ড
ংলা—বিরক্তি লাগে। কিন্তু ও বড়লোকের ছেলে—গরীব-
ানুষদের তো বিরক্তি সাজে না! ইচ্ছে না থাকলেও সইতে হয়।
াঘাত দিতে গেলে ভয় করে—এই যাঃ, দুনিয়ার চালু ভদ্র নিয়মটা
ভেঙে যাবে যে! তবে আঘাত দেবার মত তেমন কিছু ঘটেনি
খনও। তাছাড়া কিছু কৃতজ্ঞতার বালাই আমার ছিল। গত শীতে
ক মেঘলাদিনে আমি আর ঝুনু বাজারের দিকে গিয়েছিলুম—
পুরের পর সময়টা—হঠাৎ ওর সঙ্গে দেখা। ঝুনুটা বড্ড বেহায়া।
ম করে বলে বসল, সিনেমা দেখাবে আকবরদা? আমি মুখে
াপত্তি করলেও মনে তীব্র লোভ জেগে উঠেছিল। সিনেমা তো
ামার দেখাই হয় না! কদাচিৎ আব্বা মাকে খুসি করার জন্যে
িয়ে গেলে, তখন! মা বুঝতে পারে না, আমিই তার দোভাষী।
াজেই মা গেলে আমার যাওয়া অবধারিত। যাই হোক, কত
মৎকার-চমৎকার ছবি সব আসে যায়, দেখা হয় না। এবং খুব

গোপন কথা, স্নুদার ওপর রাগ হয় মাঝে মাঝে। কোনদিন তো বড়মুখ করে বলল না, চলো রুবি, সিনেমা দেখে আসি! একা যাওয়া হত না—ঝুনুকে সঙ্গে নিতে হত অবশ্যই। এদিকে মা নিজের সাথে ছাড়া কারো সাথে মেয়েকে সিনেমা দেখতে দিতে রাজী নয়—তাহলেও সেটা ম্যানেজ করা কিছু কঠিন ছিল না। যাই হোক, শেষে মনে হত—কী মিছিমিছি রাগ করছি! সিনেমা দেখানোর মত পয়সা পাবে কোথায় বেচারা! আর সেই সব সময়, আশ্চর্য—ওর জন্যে একটা গভীর সহানুভূতি আমায় বেদনায় বিদ্ধ করে ফেলত!

আকবর ভাই সেদিন সিনেমা দেখিয়েছিল। আমার বাঁদিকে সে, ডানদিকে ঝুনু। ঝুনুটা চালাকি করে আমার ডানদিকের সীটটা বাগাল, তা বুঝতে পেরেছিলুম। ঝুনুর ওপর যা রাগ হচ্ছিল বলার নয়। আকবরকে আমি নুরু ভাইয়ের মতই দেখি—অথচ তার আমার দিকে ঝুঁকে বসার ভঙ্গী, যখন তখন আবছা অন্ধকারে সেই হলের ভিতর মুখের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে কী বলার চেষ্টা, অবশেষে হঠাৎ আমার পিঠের কাছে চেয়ারে বেড় দিয়ে থাকা তার ডান হাতটা আবিষ্কার, সব মিলিয়ে যে অস্বস্তির সৃষ্টি করছিল তাতে মনে মনে ঘেন্নাটা ঝুনুর ওপরই হচ্ছিল। রোস, এর পর কখনও কোনদিন তোমার সাথে কোথাও যাচ্ছি না। এমন মতলববাজ মেয়ে তুমি! আমার বিশ্বাস হতে থাকল যে আকবরের সিনেমা দেখানোর মতো উদারতার পিছনে আমিই যে একমাত্র কারণ, তা ঝুনু বেশ জানে। কী ছাই দেখলুম কে জানে, সারাক্ষণ নিজের দেহের দিকে মনের সবটুকু পড়ে থাকলে, বাইরে কী এবং কতটুকু দেখব? হ্যাঁ, আমি সেদিন ঠিক এই বাইশে চৈত্রের দুপুরবেলার মত সারাক্ষণ দেহসচেতন হয়ে উঠেছিলুম। সম্ভবত আকবর ভাই-ই আমার মেয়েদেহটা সম্পর্কে সেই প্রথম সজাগ করেছিল। তারপর থেকে যতবার তাকে সামনে দেখেছি, অমনি মনে পড়ে গেছে, আমার একটা দেহ আছে এবং তা মেয়ের দেহ…

বাইশে চৈত্রের দুপুরে নির্জন বাড়িতে আকবরের হঠাৎ এসে পড়া এবং দরজা বন্ধ করে দেওয়া, আমার মেয়ে দেহটাকে হকচকিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্টই। কিন্তু ওই যে বলেছি, সে বড়লোকের ছেলে এবং আমি গরীব বাড়ির মেয়ে—দুনিয়া সংসারের নিয়মভঙ্গের দুঃসাহসে ছিছিক্কারের ভয়, এবং একটা অবাঞ্ছিত কৃতজ্ঞতা বোধ, সব মিলিয়ে আমি পুরো কুকুর বনে গেলুম। লেজ নাড়তে হল।

আমার দেহসচেতন মেয়ে মন বলল, উঠোনেই দাঁড়িয়ে থাকো। নড়ো না। আমি উঠোনেই দাঁড়িয়ে রইলুম। আকবর বলল, কী করছ রুবি? তোমার আব্বা কোথায়? তোমার মা তো দেখলুম আমাদের বাড়ি রয়েছেন। তোমাদের বুড়িটাও গিয়ে জুটেছে!

বললুম, হ্যাঁ।

আকবরকে কেমন শুকনো দেখাচ্ছিল। যেন হাসবার চেষ্টা করে বলল, শুধু হ্যাঁ। আর কিছু কথা নেই? কী অল্পভাষী মেয়ে রে বাবা!

মুখ নীচু করে বললুম, কী বলব?

আকবর সিগ্রেট জ্বালল। তারপর বলল, কলেজে এডমিশন নেবে না? আব্বা কী বলেন?

জবাব দিতে হল এ কথার।...রেজাল্ট বেরোক তারপর তো!

তাহলেও এখন থেকে তৈরী হওয়া দরকার। আকবর বলল।...তোমার নুরু ভাইকে লেখ। দ্যাখো না, সে কী জবাব দ্যায়। তারপর...

একটু হাসি অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার ঠোঁটে উপচে এল।...তারপর কী?

তোমার পড়ার অসুবিধে হবে না—এটুকু আমি প্রতিশ্রুতি দিতে পারি।

তুমি পড়াবে?

এই দ্যাখো! ফোঁস করে উঠলে ওমনি? সত্যি, বড় বিচ্ছু মেয়ে তুমি। যাক্ গে, চল—দুপুরবেলাটা গল্পে-গল্পে কাটিয়ে দিই।

নাকি, সিনেমা যাবে আজ? খুব ভাল ফিলিম এসেছে কিন্তু। ঝুমুটুমু থাক্, বরং···আকবর চোখ বুজে যেন উপায় ঠিক করে নিল। ···বরং এক কাজ করা যাবে। তুমি···তুমি কারো বাড়ি যাচ্ছ বলে সোজা হলের সামনে গিয়ে থাকবে—আমাকে ওখানেই পেয়ে যাবে। রাজী?

সত্যি, লোভ হচ্ছিল একটু-একটু। মিথ্যে বলব না। কিন্তু সে তো হয় না। আমি রান্নাঘরের দিকে অকারণ অদৃশ্য কাক-তাড়ানো ভঙ্গীতে হাত নেড়ে চেঁচালুম, হুস্! যাঃ, যাঃ! তারপর খিড়কির দিকে পা বাড়ালুম।···বুড়িটা আসছে না কেন?

আকবর আচমকা আমার একটা হাত ধরে ফেলল।···আরে! কোথায় যাচ্ছ?

সঙ্গে সঙ্গে আমার দেহটা থরথর করে কেঁপে উঠল। একটা বোবা চিৎকার নাড়িছেঁড়া যন্ত্রণার মতো কোষে কোষে ছটফট করতে লাগল। ঠোঁটে দাঁত এসে বসে গেল। আস্তে আস্তে বললুম, আঃ; ছাড়ুন। লাগছে।

ছাড়তে কি ইচ্ছে করে? আকবরের দাঁতগুলো হয়তো বেরিয়ে এসেছিল এ কথা বলবার সময়, মুখ তুলে দেখিনি—তবে বলতে পারি। সে আরও জোরে টান দিয়ে ফের বলল, দুষ্টু মেয়ে! চলো, তোমায় একটা মজার ব্যাপার শেখাবো। আহা চলোই না ও ঘরে!

আঠারো বছরের মেয়েকে ও কী মজার ব্যাপার শেখাবে! কিন্তু হঠাৎ আমি সাহানাবেগমের সেই বোকাহাবা মেয়েটি বনে গেলুম। ভুল নয়, ইচ্ছাকৃত নয়—আমি হলফ করে বলতে পারি। শুধু বলতে পারিনে, কেন তবু ওর টানকে বশ মেনে উঁচু বারান্দা পেরিয়ে সুড়সুড় করে ঘরে গিয়ে ঢুকলুম। এক সর্বনাশের স্রোত আমায় ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল যেন। নাকি ওর অবাধ্য হওয়ার মত সাহস আমার ছিল না! নাকি নিজেকে একেবারে অসহায় ভেবে আত্মসমর্পণ করে বসেছিলুম।

খাটের ওপর আমায় ফেলে দিল আকবর। জানালাটা খোলা

ছিল। হঠাৎ দেখি বেড়ার ধারে সুনুদা দাঁড়িয়ে আছে। ওদের গাইগরুটার মুখে একগোছা ঘাস তুলে দিচ্ছে। খালি গা, পরনে একটা ময়লা পাজামা, ধবধবে সাদা কিন্তু ফ্যাকাসে বুক, কিছু নীলচে লোম ছড়ানো, দুটো হাল্‌কা কিন্তু নিটোল বাহু—আর শক্ত ঘাড়, কোঁকড়ানো চুল, বড় বড় টানা চোখ—ওই তো আমার উজ্জ্বল উদ্ধার এত কাছে! আমি ডেকে উঠলুম, সুনুদা, সুনুদা!

অমনি আকবর সাঁৎ করে বেরিয়ে গেল। সুনুদা দৌড়ে জানালার কাছে চলে এল।...কী বলছ রুবি?

আমার চেহারায় ও কণ্ঠস্বরে কিছু হয়তো ছিল—সুনুদার মুখে-চোখে বিস্ময় ঝিলিক দিচ্ছিল। বললুম, শীগগির একবার আসবে?

ওখান থেকে আসতে হলে ওদের বাড়িটা পুরো ঘুরে খিড়কি হয়ে আসতে হয়। তাই একটু সময় লাগল। আমি বেরোলুম না। খিড়কির দরজায় ওর সাড়া পাবার সঙ্গে সঙ্গে আর নিজেকে সামলানো গেল না। উবুড় হয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে সুরু করলুম।

কতক্ষণ পরে আমার পিঠে ওর হাতের চাপ এল।...রুবি, এই রুবি! কী, কী হয়েছে? কাঁদছ কেন?

আমি কিছু না বলে হঠাৎ উঠে ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লুম। তারপর মাথা ঘষতে থাকলুম। সুনুদা আস্তে আস্তে আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। কাঁদিসনে, কাঁদিসনে রুবি। আমি জানি, কী হয়েছে। আকবরটাকে আমি চলে যেতে দেখলুম। কিন্তু বুঝতেই তো পারছিস, এ নিয়ে ঘাঁটাতে গেলে পরিণামে ওর কিছু হবে না—যা ক্ষতি হবে, তা তোরই। কারণ, তুই মেয়ে। ও পুরুষ। তাছাড়া তোর বাপের পয়সা নেই, ওর অনেক আছে। চোখ মোছ্।

নিজেই আমার শাড়ির আঁচলে চোখ মোছাতে থাকল সুনুদা। তারপর দুহাতে আমার মুখটা ধরে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকার পর —সেই পিকনিকের দিনের মত, চুমু খেয়ে বসল। না—সেদিনের মত তাড়াহুড়া নয়—ধীরে। আর আমিও তো বাধা দিচ্ছিলাম না।

মন বলছিল, পাওনা মিটিয়ে নে হতভাগিনী! দুঃখের মধ্যে দিয়ে এমনি করেই তো সুখ আসে। অন্ধকার রাত পেরিয়ে আসে দিনের সূর্য।

আর—তারপর আমার চিবুকে মৃদু ঠোনা মেরে সুনুদা বলল, ওই গরু-খাওয়া মুখটা এবার রগড়ে ধুয়ে ফেলো গো। ছিরি যা করে ফেলেছ। কিন্তু খবর্দার, মা বাবার কানে তুলো না এসব। সাবধানে থেকো, তাহলেই হল।

নির্মল হেসে পাল্টা বললুম, আহা তোমার মুখটা বুঝি গরু-খাওয়া নয়। যাও—তুমিও গঙ্গাজলে ধুয়ে নাও।

সুনুদা হাসতে হাসতে বেরোল।…

পাঁচ

সদর দরজার কাছে হেমনাথের ভারি গলার সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল—খাঁসাহেব, খাঁসাহেব আছো নাকি?

হেমনাথ খুব কমই এসেছেন এ বাড়ি। খুব একটা কারণ থাকলে তবেই এসেছেন। সাহানা মেজবাবুর সামনে পর্দা মানে না। বড় জোর ঘোমটাটা একটু বাড়িয়ে ছায় এবং কণ্ঠস্বর খাটো করে কথা বলে, এই মাত্র।

সেদিন সাহানার মনে অন্য ভাব—আকবর জামাই হবে এবং আকবর এখন রুবির ঘরে আড্ডা দিচ্ছে, মনটা ছিল খুশিতে ভরা। হাসির মার সঙ্গে ফিসফিসিয়ে কথা বলছিল। হেমনাথের ডাকটা সে শোনেনি।

সাড়া না পেয়ে হেমমাথ নিঃসঙ্কোচে উঠোনে চলে এলেন,—কয়েক-বার গলা ঝেড়ে কেসে তাঁর অর্থাৎ মুসলমানবাড়ি পরপুরুষের উপস্থিতি জানিয়ে দিলেন প্রথামত। তারপর বললেন, কই, খাঁয়ের পো গেল কোথায়?

সশব্যস্তে সাহানা বেরিয়ে এল এবার। তারপর হাল্‌কা পায়ে দ্রুত এগিয়ে বারান্দার আলনা থেকে কম্বলটা নামাল। বিছিয়ে দিয়ে মৃদুস্বরে বলল, বসুন মেজবাবু। উনি এক্ষুনি কোথায় বেরোলেন।

হেমনাথ পা ঝুলিয়ে বসলেন উঁচু বারান্দায়। ওপাশের ঘর থেকে আকবর-ঝুনুর হাসাহাসি ও কথা শোনা যাচ্ছিল। তিনি কান খাড়া করে বললেন, ঝুনু মনে হচ্ছে!

সাহানা একটু হেসে জবাব দিলেন, হ্যাঁ, আপনার মেয়ে নিজের বাড়ি খায় আর এবাড়ি এসে আঁচায়।

হেমনাথ বললেন, আর কে আছে? নুরু এসেছে নাকি?

এবার ঘোমটা একটু বাড়িয়ে কণ্ঠস্বর আরও চাপা করে সাহানা বলল, আকবর—খালেক মিয়ার বড়ছেলে।

হেমনাথের মুখটা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। কোন কথা বললেন না।

সাহানার তর সইছিল না। বুকে কী একটা ভাবাবেগ শিসিয়ে উঠছিল মুহুর্মুহু। কী খবর এনেছেন মেজবাবু? ভাল, নাকি মন্দ? আর বেআক্কেলে লোকটাই বা হুম করে কোত্থেকে এসে কোথায় উধাও হল হঠাৎ? নাঃ এতটুকু যদি বিষয়বুদ্ধি থাকতে আছে ওনার। সাহানার মনে একটা প্রবল দ্বন্দ্ব—কী হল জানবার তীব্র ইচ্ছে, আবার অন্যদিকে যদি খবরটা খারাপ হয়, সইতে পারবে না সেই যন্ত্রণার ভয়—কারণ এই আকবর এসে পড়ায় সকালটা যে ইতিমধ্যে চরম আশা-আনন্দে টলটলে ভরা পাত্রটি হয়ে উঠেছে। সাহানা মনে মনে বলছিল, খোদা—আমার এ খুসির জোয়ার শুকিয়ে ফেলো না!

হ্যাঁ, এই ছিল তার মায়ের মনের ভাবতরঙ্গ। শুধু তার নয়, হয়তো সব পাড়াগেঁয়ে বাঙালী মায়েরই—যাদের ঘরে রুবির মতো আঠারো বছরের মেয়ে আছে, যারা গরীবমানুষ, যারা মেয়েকে দুধেভাতে এবং চোখের সামনে থাকতে দেখতে চায়—সবারই।

হেমনাথ যেন তা টের পাচ্ছিলেন। অভ্যাসমত দাঁতের কোন গূঢ় ফাঁক দিয়ে একচিলতে থুথু সাবধানে দূরে ফেললেন তিনি। তারপর

বললেন, বসব না বড়বিবি। উঠি। বরং খাঁকেই আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দিও। কথা আছে।

সাহানা আর অপেক্ষা করতে পারল না। দেয়ালে পিঠ রেখে দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিল সে। ঘরের ভিতর যে রুবি বসে আছে খাটের কোণে, লক্ষ্য করেনি তখনও। একটু কেসে বলল, মেজবাবু, খবর ভালো তো?

হেমনাথ যেন অন্যমনস্ক ছিলেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, কিসের?

সাহানার রাগ হল। ন্যাকামি করছেন কেন মেজবাবু, নাকি তাকে এসব ব্যাপারে অপ্রয়োজনীয় মনে করছেন? আসলে রুবির ভালমন্দ ভবিষ্যতের ন্যায্য মালিক তো সাহানা। হাজার হোক, আফজল খাঁ রুবির সৎবাপ।...এবং ঠিক এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ব্যাপারটা লক্ষ্য করেই তার রাগ হচ্ছিল। কিন্তু রাগটা চেপে সে কণ্ঠস্বর একটু চড়ায় এনে বলল, মেয়ের ভাবনা মা ছাড়া আর কার বেশি হবে মেজবাবু? দেখছেন তো কাণ্ড—মিয়ার আর কাজের সময় ছিল না! ঠিক সময়েই বেপাত্তা। এ তো আমি জানিই। মেয়ে আমিই সঙ্গে করে এনেছিলুম। তার যা দায়িত্ব—তা অন্যের কাঁধে চাপিয়ে লাভ নেই মেজবাবু। নেবে কেন সে, বলুন?

হেমনাথ ব্যাপারটা আঁচ করে একটু হাসলেন। তারপর বললেন, না—সেটা ঠিক কথা নয়। তবে কী জানো, সব কথা সব সময় বলাও যায় না! তুমি অবশ্য মেয়ের মা আর আমি কিনা—ওই যে কী বলে তোমাদের ভাষায়, সাদীর পয়গম্বর নিয়ে—

ভুলটা শুধরে দিলেন সাহানা—হাসিমুখেই, সাদীর পয়গাম!

হ্যাঁ, হেমনাথ হেসে ফেললেন।...তোমাদের কথাগুলো কেমন গুলিয়ে যায় বাপু। মনে থাকে না। যাক্ গে।...বলে ফের গম্ভীর হলেন।...এত অধৈর্য হচ্ছ কেন বড়বিবি? মনটা শক্ত করো। যা বলার আমি খাঁকেই বলব। খালেক আমার মাথাটা গুলিয়ে দিয়েছে।

সাহানা দু পা এগিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলল, না মেজবাবু। আপনি শুধু বলে যান, ওরা হ্যাঁ বলেছে, নাকি না বলেছে?

পরক্ষণে একটা কল্পনাতীত অঘটন ঘটে গেল—যার পূর্বপ্রস্তুতি বা পটভূমিকা কারো জানা ছিল না। আচমকা রুবি বেরিয়ে এল ঘর থেকে আলুথালু চুল, লাল চোখ, ভিজে মুখ, স্ফুরিত নাসারন্ধ্র—হাতের মুঠোয় একটা দলাপাকানো কাগজ—সে তীব্র-কণ্ঠে বলে উঠল, কী? কী ভেবেছ তোমরা? আমাকে কী পেয়েছ? আমি কি হাটের গরুছাগল?

তার কণ্ঠস্বরে কান্নার কড়া ঝাঁঝ ছিল। হেমনাথ স্তম্ভিত হয়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছেন। সাহানা হতচকিত—বিমূঢ়। তারপর তাদের চোখের সামনে দিয়ে দৌড়ে চলে গেছে রুবি। বারান্দার শেষপ্রান্তে তার ঘরের দরজায় পৌঁছেছে।

রুবি রুদ্ধশ্বাসে চিৎকার করছিল, ছোটলোক, ইতর বদমাস! এখুনি বেরিয়ে যাও বাড়ি থেকে। নয়তো অপমানের চূড়ান্ত করব তোমার। কী ভেবেছ আমাকে? বেরোও ছোটলোকের বাচ্চা!

ঝুনু ভিতরে পাথরের মূর্তির মত স্থির। আকবরকে থমথমে মুখে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। বাড়িতে আর সব কণ্ঠ স্তব্ধ, সবাই ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে। আকবর সদরদরজা আর রান্নাঘরের দেয়ালের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়-করানো সাইকেলটা সজোরে টেনে নিল। ভীষণ স্তব্ধ বাড়িটা কেঁপে উঠল ঝনঝন শব্দে। তারপর সেটা শূন্যে তুলে দরজা পার করে ফেলল। তারপর সে অদৃশ্য হল বাহনসমেত।

এবার সাহানার জ্ঞান ফিরল। চেরা গলায়—বিস্ময়ে দুঃখে সে চিৎকার করে উঠল, রুবি, রুবি! এই হারামজাদী মেয়ে!

রুবিকে দেখা গেল নিজের ঘরে ঢুকে পড়েছে। সাহানা কয়েক মুহূর্ত দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাসের পর ফের হেমনাথের উদ্দেশ্যে বলে উঠল, দেখলেন, দেখলেন মেজবাবু? আমি—আমি কী করব বলতে পারেন? গলায় দড়ি দেব? নাকি বিষ খাব? হারামজাদী ইজ্জত সম্ভ্রম এমনি করে নষ্ট করে বসল!

হেমনাথ বললেন, তুমি আর মেয়ের মতো মাথা খারাপ করোনা তো বড়বিবি! যাও, যা করছিলে, করগে। ঝুনু, অ ঝুনু, বাড়ি আয়।

ঝুনু বেরিয়ে এল। কিন্তু কোন কথা না বলে সটান খিড়কির দরজা দিয়ে চলে গেল। হেমনাথ ফের বললেন, এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না। খাঁসাহেব এলেই আগে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। তারপর সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন হেমনাথ।

হাসির মা উঠোনে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। জিভ বেরিয়ে পড়েছে, লালা ঝরছে। এতক্ষণে বলল, গোশত কষা হয়ে গেছে গো! কট্টুকুন পানি দেবেন, দিয়ে যান।

সাহানা মুখ বিকৃত করে বলল, উড়েপুড়ে যাক্ মিয়ার গোস্ত! শ্যালশকুনে খাক্।

সাহানাও মেয়ের মত নিজের ঘরে ঢুকল। তারপর উবুড় হয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। অক্ষম অসহায় ক্রোধে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকল সে।

হাসির মা রান্নাঘরে ঢুকল। বুড়ি অবশ্য হাসছিল সকৌতুকে। চামচে দিয়ে মাংস নাড়তে নাড়তে বলছিল, হুঁ, এই হয়েছে কী, আরো কত হবে। সবে তো রোজ কেয়ামতের শুরু গো! কবে থেকে ইশারায় বলছি, মেয়ের দিকে চোখটা রেখো—গরীবের কথা বাসি হলেই কাজে লাগে কিনা! যাক্ গে বাবা, এসব হচ্ছে মিয়ামোখাদিমের বাড়ির কাণ্ড। বাইরে চেকনাই, ভেতরে ইঁদুর-চামচিকের উপদ্রব।

সেদিন আফজল বাড়ি ফিরেছিলেন তুপুর গড়িয়ে। বেনামী চিঠিটা রুবির হাতে গুঁজে দিয়েই বেরিয়েছিলেন। এভাবে বেরোনোর একটা উদ্দেশ্য ছিল। রুবিকে পুরোটা পড়ার এবং কৈফিয়ত তৈরীর জন্য কিছু সময় দেওয়ার কথা তাঁর মাথায় এসেছিল। কারণ, নিজেকে সুবিবেচক ভাবা তাঁর স্বভাব। সব ব্যাপারেই

কোন প্রতিক্রিয়া ঘটলে তিনি হঠাৎ রেগে যান যদিও—পরে তলিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেন, ভুলটা সম্ভবত তাঁর নিজেরই এবং কোথায় বা ভুল হল। নিজেকে সৎ এবং বুদ্ধিমান মানুষ মনে করেন আফজল খাঁ। এদিকে নিজের কাজে বা আচরণে তাঁর আস্থাও বেশ দৃঢ়। তা সত্ত্বেও আপোষ করার মতো নমনীয়তারও অভাব নেই তাঁর চরিত্রে। কেউ ভুল বুঝিয়ে দিলেও যদি নিজের বুদ্ধিতে সেটা ঠিক মনে করেন, তাহলেও শেষঅব্দি তিনি আত্মসমর্পণ করতে জানেন। কারণ, দুঃখ শোক বিষণ্ণতা বা সবরকম অ-সুখভাবের প্রতি তাঁর ভীতি আছে। পৃথিবী আর কুসুমগঞ্জ, কুসুমগঞ্জ আর তাঁর সংসার, তাঁর সংসার এবং ব্যক্তিগত জীবন—সবখানে সম্ভবপর আনন্দস্রোত অব্যাহত রাখার তিনি পক্ষপাতী। আনন্দস্রোতের প্রতি পক্ষপাতিত্বের সম্ভবতঃ সবচেয়ে স্থূল উদাহরণ তাঁর আহার-বিলাস। বিলাসই বলা যায়—চরম অভাবের মধ্যেও তাঁর রান্নাঘর থেকে প্রতিবেশীরা তেল ঘি মশলার সুগন্ধ শুঁকতে পারেন। এটা অবশ্যই একটা তাক লাগানো ব্যাপার। লুঙ্গি ছিঁড়ে গেছে। সাহানার জবানে, শরীরের গুহ্য ইজ্জতটুকুই যখন অসাবধানে হাঁটলে সবার সামনে প্রত্যক্ষ হয়ে পড়ছে এবং বেহায়া বেশরম মিয়াসাব এতটুকু ভ্রূক্ষেপ করছেন না, তখন হাতে দুটো টাকা এলেই সবার আগে আব্রু ঢাকবার চেষ্টা না করে উনি কিনা আনলেন হয়তো সেখপাড়া থেকে জব্বর দুটো মোরগ আর গোয়ালার বাড়ি থেকে একপো সরেস ঘি! মেয়েকে পাশে নিয়ে কোরমা খেতে খেতে আফজল অসাবধানে একটা হাঁটু তুললেই পরিবেশনরতা সাহানা ত্বরিতে মুখে আঁচল ঢেকে একটু ঘুরে হিসহিস স্বরে দুর্বোধ্য কী গর্জন করেছে। আফজল অমনি টের পেয়ে হাঁটুটা নামিয়ে ফেলেছেন। পাশে মেয়ে—আর বালিকা নয়, রীতিমত যুবতী—আপাতদৃষ্টে লাজুক, নম্র, শান্ত, স্বল্পভাষিনী, তত্রাচ সেও স্বভাবত টের পেয়ে মুচকি হেসেছে আড়ালে। চতুর আফজল মুহূর্তে বেহায়ার মত বলে উঠেছেন, হাসিস নে রে বেটি। হাসতে নেই। গুরুজন বটি না তোর? ছাখ না, শিগগিরি চাঁদু জোলার কাছে

চাঁদমার্কা লুঙ্গি কিনলুম বলে! ...সাহানা হাসবে কি—গর্জে খুন। ...কবে তোমার আক্কেল হবে শুনি? ছি, ছি ছি! যোয়ান মেয়ের সঙ্গে তামাসা, গলায় দড়ি জোটে না গা? আফজলের ভ্রূক্ষেপ নেই। মোরগের আস্ত রানটা দাঁতে কামড়ে অক্লেশে বলে উঠেছেন, যাও যাও! রুবি আমার শিক্ষিতা মেয়ে। তোমার মতন মক্তবপড়া নাকি? কী পড়েছিল রে তোর মা, রুবি? এই বলে আফজল মক্তবের পড়ুয়ার ঢঙে সুর ধরে পড়েছেন—আলেফ জের আ, বে জের বা, আবা! পরক্ষণে খ্যাক খ্যাক করে হাসি। মুখের গোশ্‌ত ছিটকে পড়েছে সামনের বাড়তি ভাতে। সাহানা ফের আগুন।...

এমনি মানুষ আফজল খাঁ। লোকে বলে খাঁ নয়, খাঁ। খেয়ে-খেয়েই ওনারা পুরুষানুক্রমে ফতুর হয়ে আসছেন। লোকে আড়ালে বলে, তা—এই পুরুষেই সবটুকু শেষ। তিন বিঘেয় এসে ঠেকেছে! তারপর আর কী খাবেন? হেমনাথ এ নিয়ে বন্ধুকে অনেক বলেছেন। বন্ধুটি কানেই নেয় না। বরং সকৌতুকে বলে, আমার আগের পুরুষে নাকি তলোয়ার চালিয়ে মানুষের মাথা কাটতেন। তা বংশের ধারা যাবে কোথায় হে মেজবাবু? ওনাদের তলোয়ার ক্ষয় পেতে পেতে আমার হাতে এখন ছুরিতে ঠেকেছে। ওই দিয়ে আমি মুরগীর মাথা কাটছি। যা বলবে বলো ভাই, যে কটা দিন বেঁচে আছি—ওই করেই চলুক। আফজল খাঁ সম্পর্কে কুসুমগঞ্জে আরও কিছু মজার কথা চালু আছে। সে খবর নাকি বিশদ দিতে পারেন বাজারের দত্ত মশাইরা। কাপড়ের দোকানে আফজলকে দেখলেই অবিক্রীত কিন্তু সবচেয়ে দামী কাপড়খানি গছিয়ে বললেই হল, হ্যাঃ, এ জিনিস খাঁসাহেব ছাড়া আর এ তল্লাটে নেবেই বা কে? শুধু টাকা থাকলেই তো আর হল না। নজর চাই! আছে আর কার এমন উঁচু নজর? নিন খাঁসাহেব, আপনার জন্যেই দিন গুণছে বেচারা। টাকা? আরে সে জন্যে ভাবনা কী? নিয়ে তো যান—হ্যাঁ, আফজল এ টাকা কোনমতে ফেলে রাখবেন না। নিজের বংশগরিমা হোক, কিংবা আত্মমর্যাদার খাতিরে হোক, যেভাবে পারেন শিগগির টাকা এনে

দিয়ে যাবেন। তার জন্য যদি ভিটেটাও বিক্রী হয়ে যায়, তাঁর পরোয়া নেই।...

সাহানা ব্যাপার দেখে থ বনে যায়। মাথা কুটতে বাকী রাখে...। ঘরের ফুটো চাল দিয়ে বিষ্টি পড়ছে—আর আমি বাঁদীর বেটি বাঁদী এই দামী মসলিন পরে ঘুরে বেড়াব? ছি, ছি, ছি! কবে বুদ্ধিশুদ্ধি হবে গা লোকটার!...বেশি রাগ হলে সে ছুঁড়ে ফেলে ছায়। তখন আফজল চেঁচিয়ে রুবিকে ডাকেন। রুবি, অ রুবি! এই নে—তুই-ই পব। ও বাঁদীর বেটি বাঁদী জীবনে কখনও দেখেছে এ জিনিস? গা কুটকুট করবে না? সইবে কেন?...সাহানা পারলে আসমান ফাটিয়ে ফেলে—কিন্তু মিয়াবাড়ির বউ, পাঁচিলের বাইরে গলার স্বর পৌঁছনো বারণ—সে হাতের হাঁড়ি ঝনঝন শব্দে আছড়ে বলে, খবর্দার! মা তুলে কিছু বললে আমি ভালমানুষের ছেলের খোয়ার করে ছাড়ব। তখন আফজল অভ্যাসমত বলে ওঠেন, কেন? কেন বলব না? আর যদি বলেই থাকি—বলো, বলো কী করতে হবে আমাকে? নাকখবদা দেব? দশহাত পাছা ঘঁষড়াব?...ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এবং রুবি মিটিমিটি হাসে। জানে তো, রাত্তিরটা আসুক, শোবার সময় হোক, তখন আব্বা-মায়ে চিরাচবিত ফায়সালা হতে দেবী হবে না।

কিন্তু ফের মজার কথা, পরবর্তী ঈদের উৎসবের সকালে দেখা গেছে, সাহানা বেগম রীতিমাফিক স্নান সেরে রুবিকে ডেকে বলছে, অ মা! সেই কাপড়খানা বের করদিকি বাসকো থেকে! একটু পরে সেই সাড়িটিই পরে সাহানাবেগম যখন ঈদের নমাজ-প্রত্যাগত আফজলকে কদমবুসি অর্থাৎ পায়ে চুমু খেতে ঝুঁকেছে—স্পষ্ট দেখা গেছে আফজলের দুচোখ ছাপিয়ে 'বেশরম বেপরোয়া' খুসির অশ্রু গড়াচ্ছে।

রুবি কী বোঝে কে জানে! এসময় তারও—সবার আড়ালে চোখের কোণায় কয়েক ফোঁটা শান্তির কান্না টলমল করতে থাকে।...

সেদিন আফজল বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রথমে গিয়েছিলেন হাই-ওয়ের ওদিকে ঘন গাছপালা ঢাকা গোরস্থানে। ওখানে কেন গেলেন, তিনিও জানতেন না। অন্যমনস্কভাবে চলতে চলতে যখন হঠাৎ চমক ভেঙেছে, দেখে অবাক হয়েছিলেন। বুকটা মোচড় দিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে। অগাধ একটা শূন্যতা তাঁর দুচোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

এখানে তাঁর গৌরবময় বংশের সবাই শুয়ে রয়েছেন। চরম কোন দুঃখের দিনেও তিনি এমন করে তো এখানে এসে পড়েননি! আজ কেন এলেন?···ভাবছিলেন আফজল।

ভাবছিলেন, আর একটা গভীর অভিমান তাঁর মনের চারপাশে ক্রমশঃ দানা বাঁধছিল। এ অভিমান কোন মানুষের ওপর নয়—যেন এ অভিমান এই দুনিয়াটার ওপর। তিনি ভাবছিলেন, গ্যাখো তাহলে—এ কমবখ্‌ত হারামী দুনিয়াটা মানুষকে কেমন ঠকায় গ্যাখো! তুমি ভাবছ—সব বেশ ঠিকঠাক আছে, একটুও ভুলভাল গোলমাল নেই। দিব্যি মনের সুখে খাওদাও ঘুমোও। হঠাৎ টের পেলে, তোমার পায়ের নীচেই কখন দরিয়ার অথৈ পানি ধেয়ে এয়েছে! নাও, এখন মরো না ডুবে—কে বাঁচাচ্ছে!···নাঃ, হেমকে আর আমি মুখ দেখাতে পারব না। ছি ছি ছি, কী ভাববে ও? সেই এতটুকুনটি থেকে দুই ছোঁড়া মানুষ হলুম। একসঙ্গে পাঠশালায় ঢুকলুম। একসঙ্গে হাইস্কুলে পড়া হল। আবার একদিন একই সঙ্গে দুজনে বললুম, ধুস্‌ বাঞ্চোত! পড়ে কি চারখানা হাত গজাবে, নাকি পায়ে দুটো ডানা হবে? দে ইস্কুলের খাতায় ঢ্যারা দেগে! এনট্রান্সের দরজায় গিয়ে দুই বদমাসে পিছু ফিরে পালিয়ে এলুম! ওর বাবা অবশ্য বেঁচে ছিলেন—নামকরা ডাক্তার। কিন্তু হেমের মতো আঁকাড়া জোয়ানকে সামলানো তাঁর সাধ্যি ছিল না। তাছাড়া ওনার আবার ওই স্বদেশী হওয়ার বাতিক ছিল প্রচণ্ড। চালাক হেম করলে কী, সোজা বলে দিলে—সে গান্ধীজীর চেলা হচ্ছে। দিনকতক হেম খুব চেঁচামেচি করলে—'বিলিতি কাপড় গাধায় পরে।' 'ইংরেজের স্কুলে

পড়লে চাকর হয়, চাকর হয়!' 'বন্দেমাতরম!' ব্যস, ওর বাবা ছেলেকে রসগোল্লা খাইয়ে বললেন, বা ব্যাটা, চমৎকার!...আর গতিক দেখে আমিও তখন হেমের সঙ্গে গলা মেলাচ্ছি। মিটিঙে যাচ্ছি। সে এক হৈ হৈ কাণ্ড কুসুমগঞ্জে। আব্বা ছিলেন এক খানাবাহাদুরের 'ধামাধরা' মানুষ। আব্বা আমার মতিগতি দেখে রেগে আগুন। একদিন করলুম কী, খানাবাহাদুরের মোটর গাড়ি আসছে—হেম আর আমি একদল স্বদেশী জুটিয়ে দল বেঁধে গাড়ির সামনে ওকে 'মীরজাফর' 'ইংরেজের কুত্তা' কত কী বলে গাল দিলুম, শাসালুম। সেই রাত্তিরেই পুলিশ আমাকে আর হেমকে ধরল। তখন নতুন যৌবনের রক্ত কিনা —টগবগ করে ফুটছে শরীরে—আমাদের নেশা ধরে গেল বে-আইনীর! হ্যাঁ, বে-আইনীর। আইন মানছি না, মানি না—ভাবতেই খুসির জোয়ারে মন টলমল করেছে। কিন্তু শেষঅব্দি ওই হেমেরই হল ছমাস জেল—আমাকে দিলে ছেড়ে। কোর্ট থেকে বেরোতেই আজব কাণ্ড। কারা সব দৌড়ে এসে আমাকে কাঁধে তুলে নিল। গলায় মালা পরিয়ে দিল। এখনও সেদিনটার কথা ভুলিনি। কুসুমগঞ্জে ঢুকছি—সব দোতালা বাড়ির ছাদ থেকে, বারান্দা থেকে, হিন্দু মেয়েরা খই ছড়িয়ে দিচ্ছে। শাঁখ বাজাচ্ছে। উলু দিচ্ছে। কপালে এঁকে দিয়ে যাচ্ছে কী সব ফোঁটা। আমার বুকখানা যদিও ফুলে ফেঁপে দ্বিগুণ বেড়েছে—কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটা দুঃখ পোকার মত কটকট করে কামড়াচ্ছে। আ ছি ছি! আমি যে ঠকাচ্ছি সবাইকে! আমার মধ্যে যে ফাঁকি থেকে গেছে!...পরে হেম জেল থেকে ফিরলে তাকেও এমনি সব করা হয়েছিল। হেম আমাকে খুলে বলেছিল তার মনের কথা। সেকথা আমারই কথা। আর, কুসুমগঞ্জের মুসলমানরা সেদিন তামাসা করে বলেছিল, ইস্, খাঁয়ের পোর সাদী হচ্ছে গো, সাদী হচ্ছে! তা শুনে আমার আব্বা নাকি ক্ষেপে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তোরা এ হীরের দাম বুঝবি কী? আফজল তার খান্দানের খাঁটি কাজটিই করেছে। তোরা জানিস, আমার পূর্বপুরুষ এমনি চিরদিন শেরের মাফিক (বাঘের মতো) কাজই

করেছে?…হ্যাঁ, আব্বা এইসব সম্মান দেখে শেষঅব্দি খুসিই হয়েছিলেন। এমনকি দৌড়ে এসে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। তারপর থেকে খানাবাহাদুরের সঙ্গে তাঁর চিরকালের মত আড়ি হয়ে যায়। এমনকি নিজের জাত সম্প্রদায়ের সঙ্গেও আড়ি হয়। তা যাক্, এজন্যে আফশোস তাঁর ছিল না। বরং আব্বা তারপর হিন্দুঘেঁষা হয়ে উঠলেন। এবং আমার তো ছিলই না আফশোস, পড়া ছাড়ার পরিণামটা ভালই মনে হচ্ছিল—দিব্যি পাখির মতো আসমানে চক্কর মেরে বেড়ানো সুরু করলুম। আর হেম ফিরে এলে যেন সেই আসমানটা আরও বড় হয়ে উঠল…

হেমের সঙ্গে আমার জীবন এমনি করে একই সুতোয় গাঁথা থেকে যাচ্ছিল। এতদিনেও সুতোটা এতটুকু পুরনো হয়ে পড়েনি। কিন্তু আজ দেখছি, ওটাতে জোর টান পড়েছে। ছিঁড়তে আর দেরী [illegible] কী তাজ্জব কাণ্ড, ওই রুবি—এতটুকুন বাপহারা মেয়েটাকে [illegible] দুঃখ জানতেও দিইনি—আমার চোখের মণি, বুকের [illegible]জে হয়ে রয়েছে যে—সেই কিনা ছ্যাঃ, ছ্যাঃ! এ লজ্জা ঢাকবই বা কোথায়? বুঝবেই বা কে? রাজ্যি জুড়ে ভেতরে ভেতরে এ্যাদ্দিন যে চাপা গুজব ছড়াচ্ছিল, এবার যে সব চাউর হয়ে যাবে! আমি শালা এক বুদ্ধুর বুদ্ধু, গোঁয়ারের বাদশা, কুঁড়ের যাশু—আমি যেন দেখেও কিস্যু দেখিনি এ্যাদ্দিন! কিন্তু [illegible] ভেবে দেখলেই তো সব স্পষ্ট বোঝা যায়। ঘিয়ের পাশে আগুন রেখে ত্মাখো না কাণ্ড। ঘি গলবেই। ওদের দোষ কী? যত দোষ আমার—হ্যাঁ, হেম ঠিক একথাই বলবে। কেন আমি লক্ষ্য রাখিনি সময়মতো? কেনই বা এ হারামী চোখ ছুটোয় ঠুলি পরে ছিলুম গা?…হেমের ছেলে আমার বাড়ি এসেছে ছুবেলা—আমার ঘরে ঢুকেছে, বিছানায় গড়িয়েছে, রান্নাঘরে গিয়ে বসেছে—দোষ তো আমারই। আর একদিকেও বড় মুসকিল—আমি মুসলমান, আমার ধর্ম কাকেও বারণ করে না, ছি-ঘেন্না করে না, তুচ্ছ করে না। আমার ঘরে সুমু আসছে যাচ্ছে, ঢুকছে—আমি তা বারণ করিই বা কী করে? আমার

ধর্ম আমাকে তালিম দিয়ে বলেছে—সবাই মানুষ, সবাই খোদার কাছে সমান। আর, ওদিকে ছাখো, হেমের বাড়ি আমার মেয়ে হাজারবার যাক, তার তো যত মুরোদ ঘরের বারান্দা অব্দি! তাতে হেমের বউটি আবার ছোঁওয়াছুঁয়ি জাতবিচারে বড্ড কড়া মানুষ। হেমও গতবছরে গুরুর দীক্ষা নিয়ে এসব দিব্যি মেনেটেনে চলছে। কাজেই, বোঝা যাচ্ছে—রুবির সঙ্গে সুনুর যদি কোন মনামনি হয়ে থাকে তো সে হয়েছে আমার বাড়িতেই। কাজেই, সব দোষ আমার ঘাড়েই পড়ছে।...

সাহানাও বলবে—দোষটা আমার। কেন, না, আমার ধর্ম মানুষকে ছি-ঘেন্না না করতে শেখাক্; এটা তো সত্যি—মেয়েদের পর্দা মানতে কড়া হুঁশিয়ারী দিয়েছে। কোন্ আক্কেলে আমি রুবিকে সুনুর সঙ্গে মিশতে কোন বাধা দিইনি? তাছাড়া আরও মস্তো গলতির কথা—হয়তো গোনাহর কথা যে একটি হিন্দু ছেলের সঙ্গে আমি রুবিকে মিশতে দিয়েছি। বাড়ির জ্ঞানী মুরুব্বী হিসেবে এ কাজ একটুও ঠিক করিনি! নিজের বংশের গৌরব তো ধুলোয় লুটোবে; উপরন্তু ওই মেয়েটার জীবনটা যে বরবাদ হয়ে যাবে গা! ছি, ছি! আমি কী করব এখন? কহাত নাকখবদা দেব? কতটা পাছা উদোম করে ঘঁষড়াবো?...

আফজলের চোখ ফেটে জল আসছিল। নির্জন গোরস্থানে একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়েছিলেন। এবার বসে পড়লেন। জুতো দুটো অলক্ষ্যে কখন পা থেকে খুলে হাতে নিয়েছিলেন—মৃতদের প্রতি সম্মানে। এখন কোলে লুঙ্গির উপর রাখতে গিয়ে দেখলেন, একচাবড়া গোবর দলেছেন। তক্ষুনি মুখ বিকৃত করে জুতো দুটো উপুড় করে ঘাসের [illegible] রাখলেন। একটা কাঠি কুড়িয়ে নিবিষ্টমনে জুতোর তলা সাফ করছিলেন আফজল।...

রুবি এমনি একদলা গোবর মাখিয়ে দিয়েছে আমার মুখে। বোকা মেয়ে। এতবড় একটা পাশ দিয়েছিস, এটুকুন বুদ্ধি হল না তোর যে কোন্ গাছে আমি বাসা বাঁধছি? ও গাছটাই তোর বৈরী, মা! মাথা কুটে মরলেও তো ও তোকে আশ্রয় দিতে পারবে না! আজ আমার নুরু যদি হেমের মেয়ের সঙ্গে ভাবভালবাসা করত, বুকে ডঙ্কা বাজিয়ে চেঁচিয়ে বলতুম, বাহাদুর! সাবাস ব্যাটা! কেন বলতুম জানিস? নুরুকে আমি তোর মতই স্নেহ করি। আমি এমন বাপ নই যে ছেলে যখন এসে বলবে, এই ফলটা আমি খাব আব্বা—আমি তাতে মুখ বেঁকাব। না—তেমন বাপ হওয়া রক্তে আমার জন্ম হয়নি। আরে বাবা, সংসার ঘরকন্না করবি তুই—তোর পছন্দসই সঙ্গীটি দেখে নিবি—তাতে আফজল খাঁ মোটেও নারাজ নয়। কিন্তু রুবি, তোর ভুলের কোন মাফ নেই। কার জন্যে তুই নিজের জানটা ইস্তেমাল করছিস? সুনুর সাধ্যি আছে যে সে তোকে নিতে পারবে? দেশময় টি টি পড়ে যাবে না? ওদের সমাজের কানুন কত কড়া, তুই শিক্ষিত মেয়ে হয়েও কি জানিস নে? আমার ছেলে নুরু যদি কোন হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করে, আমার সমাজ খুব একটা আপত্তি করবে না। শুধু বলবে, ঠিক আছে মাণিক। এবার মেয়েটিকে কলমা পড়িয়ে নিও—ব্যাস আমরা খুসি। খুসি হবে আমার সমাজ। সে বলবে, আরে ভাইসাব—এ তো ভাল কথা। আল্লার ছুনিয়ায় মুসলমানের সংখ্যা আরো একজন বাড়ল। কিন্তু ওরা? হেমের মুখেই শুনেছি—হিন্দু হওয়া যায় না, হিন্দু হয়ে জন্মাতে হয়। বাস রে! কী সর্বনেশে সাংঘাতিক কথা তাহলে! তুই হতভাগী খোদার কাছে বরং কান্নাকাটি করে বল্, হে খোদা, এ ছুনিয়ায় তো হল না—পরের ছুনিয়ায় যদি...

ধুত্তেরি! কী পোকা রে বাবা!......আফজল উরুর নীচে থেকে একটা পোকা বের করে টিপে মারলেন। একদলা সবজে মাংস ঘাসের ওপর এবং কিছু তাঁর আঙুলে লেগে রইল। ঘাসে মুছে ছুটো আঙুলে ঘসে পরখ করলেন আর রক্ত বা রসের চিটচিটে ভাব কতটা আছে। তারপর শূন্যদৃষ্টে সামনের দিকে তাকালেন।......

হ্যাঁ মুহব্বৎ বলে একটা কথা আছে। আমি জানি, এ জিনিস খোদা সবাইকে সমান দেননি। আর যাকে বেশিটুকুন দিয়েছেন, হায়, তার দুঃখের সীমা থাকে না! মুহব্বতের কাজল চোখে থাকলে তখন কুঁড়েঘরের ছুঁড়িও দুনিয়ার বাদশার জন্যে ছটফট করে মরে। আবার বাদশাও ছটফট করেন ঘুঁটেকুড়ুনীর জন্যে। মুহব্বৎ বড় আজব চীজ এ দুনিয়ায়। এ জাত মানে না। এর চোখে সবাই সমান। এর কাছে কোন জাতবেজাত নেই। এই বড় ঝামেলা। তুই নাদান মেয়েমানুষ বাছা, মুহব্বতের কাছে তোর ও ইস্কুলে-পড়া বিদ্যের তো কোন দাম নেই—ওর কাছে দুনিয়াশুদ্ধ মানুষের শিখতে-ঠেকতে-সমঝাতে জীবন গেল—তুই তো একরত্তি মেয়েমানুষ। তাই তোরই বা দোষ কী? না রুবি, তোর কোন দোষ নেই। যত দোষ আমার—এই শালা বুড়ো গাধাটার!...

আফজল খাঁ দুঃখিত মুখে মাথার ওপর গাছটার দিকে তাকালেন। একটা মোটা ডাল লক্ষ্য করছিলেন তিনি।...যাব নাকি ঝুলে? বেশ হয় কিন্তু। শালাদের ভিরমি লেগে যায় তাহলে। ওরা টের পেয়ে যায় —একজন সাচ্চা খাঁটি মানুষকে খামোকা উত্যক্ত করার ঠেলাটা কী।

এবং তাঁর পক্ষে সেটা সম্ভব হলে যেন খুশিই হতেন আফজল। তাঁর ধারণা, এর ফলে আফজল নামক একটি মানুষ আসলে কী ছিলেন, সেটা স্পষ্ট করা যেত।

অথচ যেন নানা কারণেই সেটা সম্ভব নয়।

কারণগুলো কী, তিনি ব্যাকুল হয়ে খুঁজছিলেন। স্পষ্ট ধরা পড়ছিল না। শুধু একটা জিনিস বারবার তাঁর সামনে এসে দাঁড়াচ্ছিল। হেমনাথকে চৌধুরীবাড়ি পাঠিয়ে তক্ষুনি ভোরবেলা কসাইখানা গিয়েছিলেন এবং টাটকা কিছু গোশত কিনে এনেছিলেন। সাহানা ভারী চমৎকার রান্না করে। সুস্বাদু গোশতের বাটিটা তিনি অবিকল দেখতে পাচ্ছিলেন। এমনকি তার মিঠে গন্ধটাও যেন শুঁকতে পারছিলেন। এবং এইতে তাঁর মন চনমন করে উঠল। তিনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

ধুত্তেরি! চুলোয় যাক্ সব! আমার কী?…বলে আফজল উঠে পড়লেন। হন হন করে হাঁটতে শুরু করলেন। কবরখানা পেরিয়ে যাওয়া মাত্র আচমকা তাঁর গা কাঁপল। কী সর্বনেশে কথাই না মাথায় আসছিল একটু আগে! যেন জোর বাঁচা বেঁচে গেছেন—এভাবে জোরে হাঁটতে থাকলেন আফজল।

মনে মনে সবার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছিলেন তিনি। নিজেও ক্ষমা করে দিচ্ছিলেন সব্বাইকে। না—কারো কোন দোষ নেই। রুবির নেই, ঝুনুর নেই, হেমের নেই কিংবা সেই বেনামী চিঠি লিখিয়েরও নেই। সবাই নিজের-নিজের সঙ্গত কাজটিই করেছে। দোষ তুমি কাকে দেবে? কেনই বা দেবে?

মনটা খুশিতে ভরে উঠল এইসব কথা ভাবতে। এবং হঠাৎ খেয়াল হল, তাঁর পাদুটো খালি—জুতো ফেলে এসেছেন গোরস্থানে!

মুহূর্তে—ধুত্তেরি বলে আফজল ফের হাঁটতে সুরু করলেন। বাড়ির কাছে এসে ফের একবার গা কাঁপল তাঁর। ফের যেন এক সর্বনাশা বাস্তবের সামনে পৌঁছে গেছেন। রোদের তাপ লাগল প্রচণ্ড। এতক্ষণে লক্ষ্য করলেন, ঘামে শরীর স্যাঁতসেঁতে হয়ে গেছে। পাঞ্জাবীটা পিঠে সেঁটে গেছে। সূর্যটা হঠাৎ যেন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। ভীত চোখে আকাশ দেখলেন আফজল। আকাশ পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে মনে হল। পায়ের নীচে মাটিতে তাপ বেড়ে গেল। অস্থির আফজল একলাফে পুরনো জীর্ণ সদর দরজার মাথায় দেউড়িসদৃশ ইটের স্তূপ থেকে যে ছায়া জমেছিল—তার নীচে গিয়ে দাঁড়ালেন।

(রাঢ়বাংলার এইসব অঞ্চলে মিয়াবাড়ির বৈশিষ্ট্য বলতে এই প্রকাণ্ড দেউড়িটাই বোঝায়। ঘরের দেওয়াল হয়তো মাটির, উলুখড়ের ছাউনি—উঠোনের উঁচু জেলখানার পাঁচিলের মতো মাটির পাঁচিল—তারও ছাউনি খড়ের—কিন্তু সদর দরজাটা বিশাল এবং উঁচু এবং তা ইটের। দরজার মাথার ওপর অনেকটা উঁচুঅব্দি সুদৃশ্য নক্‌সার খিলান ইত্যাদি। ঘন নীল রঙের কিছু পোঁচ সেখানে লক্ষ্য করা যায়। কিছু আরবী-ফারসী শ্লোক আনাড়ী রাজমিস্ত্রীর হাতে খোদাই

করা। নয়তো বাংলায় ঈশ্বর এবং তাঁর প্রেরিত পুরুষের এক লাইন প্রশংসাবাণী থাকে উৎকীর্ণ। আর থাকে নির্মাণকাল, রাজমিস্ত্রীর নাম ইত্যাদি। সম্ভবত ইটের দালানবাড়ির মর্যাদার কথা ভেবেই নিম্নবিত্ত খান্দানী মুসলমান অন্তত সদর দরজাটিকে এমনি সুদৃশ্য করে নিজের মর্যাদার কথা জানিয়ে দিতে চাইতেন। অবশ্য কালক্রমে তার পলেস্তারা যেত টুটে। তবু সে দাঁড়িয়ে থাকত মাথা উঁচু করে সুপ্রাচীন বংশমহিমার মত।)

সদর দরজাটা বন্ধ ছিল। গভীর স্তব্ধতা ছিল চারপাশে। দরজার কপাটে কান পেতে কোন আওয়াজ শোনার চেষ্টা করলেন আফজল। না পেয়ে বুক কাঁপল। ফাটলে চোখ রাখলেন। বাড়ির ভিতরে শূন্য সাদা ধবধবে উঠোনটা চোখের ওপর জ্বলে উঠল। কোন মুরগী-বাচ্চাকেও হাঁটতে দেখলেন না।

তৃষ্ণায় বুকঅব্দি শুকনো। আফজলের ইচ্ছে করছিল, এ মুহূর্তে অভ্যাসমত রুবির হাতের এক গ্লাস জল পেলে অসীম পরাক্রমে তিনি একটা বিরাট অঘটন ঘটিয়ে ফেলতে পারেন।

কিন্তু কিছুই করা গেল না। নিজের বাড়ির দরজা থেকে নির্বোধ চোরের মত সরে এলেন আফজল। ফের অভিমান তাঁকে পেয়ে বসল। আস্তে আস্তে কষ্টের পা ফেলে তিনি রাস্তায় নামলেন। অন্য কোথাও যেতে হবে। যাবেন নাকি স্টেশনবাজারে মকবুল মিয়া দরজীর ওখানে? পুরো দিনটা দিব্যি কেটে যাবে। চা-নাস্তাও জুটতে দেরী হবে না? দুনিয়াটাকে গাল দিতে দিতে আফজল খাঁ স্টেশন-বাজারের দিকেই চললেন।

ছয়

রুবি ধুড়মুড় করে উঠে বসল।

সে কি ঘুমিয়েছিল এতক্ষণ? বাঃ রে! কী বোকাসোকা নিশ্চিন্ত অগাধ ঘুম! নিজের প্রতি বিরক্ত হল সে। ঘামে দেহ ছপছপ

করছে। ব্লাউজটা পুরো ভিজে গেছে। ঘরে এত গরম হত না—কিন্তু উত্তরের জানলাটা বন্ধ ছিল। দক্ষিণে দরজা হাট করে খোলা। জানালা খুলে দিলে হু হু করে একঝলক হাওয়া এসে ঢুকল। শরীর জুড়িয়ে গেল তার। প্রথমে জানালার বাইরের পৃথিবীটা দেখে বেলা আন্দাজ করার চেষ্টা করল সে। বেলা ঢলেছে। তারপর ঘুরে দরজার বাইরে তাকাল। উঠোনে কায়েতবাড়ির পাঁচিলের ছায়াটা সরে এসেছে। একঠ্যাঙে ধাড়ী মুরগীটা ঝিমোচ্ছে। কাল থেকে ওই লক্ষণ দেখা গেছে। মা বলছিল, ও বাঁচবে না। হয়তো দরমাশুদ্ধ সবগুলোই একে একে যাবে। তার আগে জবাই করে খাওয়া দরকার।…

আবছা গানের সুর ভেসে আসছিল ওদিকে শেফালীদের বাড়ি থেকে। এই সময়টা ভারি সুন্দর-সুন্দর গান বাজে ওদের রেডিওতে। মন চনমন করে উঠল রুবির। কিন্তু না—আজ তার দুনিয়া যে দুষমন।

দুনিয়া দুষমন…কথাটা কে যেন বলছিল? রুবির মনে পড়ল—স্পষ্ট নয়। আবছা। যখন সে শুয়ে পড়েছিল, হয়তো ঘুমের স্রোতে ভাসতে ভাসতে কাঁদছিলও—হাসির মা যেন এসে কিছু বলছিল তাকে।…দুনিয়াটা দুষমন করো না মা!…কিন্তু বুড়িটা কী টের পেল? কেমন করে টের পেল?

এ ঘুমের কোন মানে হয় না। এমন অগাধ নিশ্চিন্ত ঘুম! যখন জেগে ওঠামাত্র তুমি টের পেয়ে যাবে যে পৃথিবী পুরো বদলে গেছে—কিছুই তোমার মনের মতো হয়ে নেই। তোমার সাজানো-গোছানো ঘরটা গেছে তছনছ হয়ে। এমনকি অনেক কিছুর অর্থ বোঝা যাচ্ছে না। আগের মতো নিঃসঙ্কোচে পা ফেলা যায় না।

একটা স্বপ্ন দেখেছিল সে। মনে পড়ল। গ্রীষ্ম দুপুরের স্বপ্নগুলো নাকি এমনি আজগুবি হয়।…কতকগুলো ঘোড়া—অদ্ভুত সব চেহারা, নীল রঙ, লাল টানা চোখ। কারা সব এসেছে যুদ্ধ করতে—তারা নাকি পাকিস্তানের সৈনিক! কুসুমগঞ্জের দীঘির ওপর প্লেন উড়ছে।

ভারি যুদ্ধ হবে! শেফালী কেঁদে বলল, দাদাকে ওরা মেরে ফেলেছে।
...আর মস্তো মস্তো ডেকচিতে কী রান্না হচ্ছে। পদো সরকার কোমরে গামছা জড়িয়ে হাতে খুন্তী নিয়ে ঘুরছে। সর্বনাশ! কে বলে দিল—রুবি মুসলমান! রুবি পালাচ্ছে। উঁচুনীচু ধাপের মত রাস্তা—শুধু কবর আর কবর। রুবির পায়ে পায়ে করব।...নুরুভাই বলল, আয় রুবি। তারপর নুরুভাই ওকে জড়িয়ে ধরল। আঃ ছি ছি!... তারপর আরো কিছু ঘটেছিল। মনে পড়ছে না।

রুবির মনটা তেঁতো হয়ে গেল। উঠে দাঁড়াল সে। বাইরে এল। বারান্দায় হাসির মা খালি মেঝেয় আঁচল বিছিয়ে হাঁ করে ঘুমোচ্ছে। রান্নাঘরের দরজায় ঝাঁপ বন্ধ। পা টিপে টিপে মায়ের ঘরের দরজায় উঁকি মারল। দেখল, সাহানা বেগমও শুয়ে ঘুমোচ্ছে।

সরে এল সে। স্নান করতে হবে। গা ঘিনঘিন করছে। আরে! সেই চিঠিটা উঠোনে পড়ে রয়েছে যে! চিঠিটা তুলে আনল সে। ঘরে ঢুকে বইয়ের নীচে লুকিয়ে রাখল। তারপর আলনা থেকে শাড়ি টেনে নিল। অন্তত একবারের জন্যও নুরুভাইয়ের কথা তার মনে পড়ল। এই শাড়ি-সাবান ক'মাস আগে নুরুভাই পাকিস্তান থেকে এনে দিয়েছিল। একটু লজ্জা পেল রুবি। মনটা আরও তেঁতো হয়ে গেল। ছিঃ, কী বিশ্রী স্বপ্ন দেখল সে! নুরুভাইকে সে ভুলেও কোনদিন অন্য চোখে তো ছাখেনি! তাহলে কেন এমন হয়?

ইঁদারার ধারে এসে রুবি বালতি নামিয়ে দিল। একটু ঝুঁকে জলটা দেখে নিল। খরদাহনের দিনে অসীম আরাম খুঁজতে গভীর কালো ঠাণ্ডা জলের দিকে তাকিয়েছিল সে। কিন্তু পরক্ষণে ওই গভীরতা—আর বালতির ঝনঝন আর্তনাদ—আর ক্রমাগত নেমে চলার দৃশ্য, তার মনে একটা নির্বোধ আতঙ্ক আনল। মুখ তুলে সোজা হল। ইঁদারার ভিতর মসৃণ গোলাকার দেয়ালের দিকে তাকিয়ে তার পায়ের তলা সুড়সুড় করে উঠল।

বালতির শব্দে জেগে ঝি বুড়িটা মাথা তুলেছিল—রুবিকে দেখে মুচকি হেসে ফের শুয়ে পড়ল। আহা, বেচারার এখনও খাওয়া

হয়নি। চাট্টি ভাতের জন্যে এখনও অপেক্ষা করছে সে। এদের খাওয়া না হলে সে পাবে না। আর কেউ তো ছিল না এতক্ষণ যে বেলা বাড়ছে দেখে আগাম তার ভাতটা বেড়ে দেবে!

অনেকক্ষণ ধরে সাবান মেখে স্নান করতে থাকল রুবি। দেহমন স্নিগ্ধ হয়ে উঠল। একটা বেপরোয়া ভাব তাকে ক্রমশঃ পেয়ে বসছিল। যেন পৃথিবীকে বুড়ো আঙুলটি দেখিয়ে যা খুসি করে যাবে।

মেয়ের প্রসাধনের হরেক বস্তু আফজল জুগিয়ে আসছেন। রুবি অবশ্য সাজেগোজে সামান্যই। একটা স্নো আনলে তা অনেক দিন চলে যায়। যেটুকু বা খরচ হয়, তার বেশির ভাগ ঝুনু—নয়তো শেফালী, কিংবা অন্য কোন বন্ধুর প্রসাধন চর্চায়। রুবির জিনিসে ওদের অধিকার থাকবে না? আড়ালে সাহানা অবশ্য গজগজ করে। করবে না কেন? সংসারের দরকারি জিনিসটির বদলে আফজলের এই পাগলামির যোগান যে! এক শিশি গন্ধ তেল আনলেই সাহানা ফোঁসে—কার জন্য আনছ? দুনিয়াশুদ্ধ বিলিয়ে দিতেই তো যাবে সবটুকুন! আফজল হাসেন।…কী কথা! সুবাস কি নিজের জন্যে বেগম? ফেলেছড়িয়েই কিনা এর ইয়ে, সার্থকতা! কী রে রুবি? ভুল বলছি? তোর মতো পাস না হয় দিই নি!…রুবিও হাসে। সৎ বাপের জন্যে নিজের প্রাণটা বিলিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। নিজের বাপটা কি এত ভাল মানুষ ছিল? বিশ্বাস হয় না।

বুক গলা কাঁধ—সবখানে পাউডার বোলাচ্ছিল রুবি। মুখে স্নো ঘষল। কপালে কুমকুমের টিপ আঁকবার সাধ হল—আঁকল না। চুলে চিরুনী চালাল। পিঠে ছড়িয়ে পড়ল একটা বিপুল প্রগলভতা যেন।

পরক্ষণে নিজেকে খুবই নির্লজ্জ মনে হল তার। মুখটা আঁচলে ঘষে ফেলল। পাউডার মুছে দিল যথাসাধ্য। কিন্তু আজ নিজের চোখে নিজেকে এত আশ্চর্য সুন্দর লাগছে!

বাইরে বেরিয়ে প্রথমে সে গেল হাসির মার কাছে। বুড়ি ঘুমোয়নি। নিঃশব্দে হাসছিল। রুবি চাপা গলায় বলল, তুমি

ততক্ষণ ওই কাপড়গুলো রোদে শুকোতে দাও হাসির মা। আমি তোমার ভাতটা বেড়ে দিচ্ছি। এখানে খাবে, নাকি, নিয়ে যাবে বাড়ি? যা খুসি করো।

একটু পরে হাসির মা ভাতের থালা আঁচলে ঢেকে দ্রুত প্রস্থান করেছে। পাগল হয়েছ?…ওনাদের খাবার আগে চোখের ছামুতে আমি বসে-বসে গিলব নাকি? ক্ষিদে পেয়েছে বটে—বাড়ি যেয়েই নিশ্চিন্তে চাট্টি গিলব।

রুবি হাত ধুয়ে বারান্দায় এল। কয়েকমুহূর্ত ইতস্তত করল। তারপর ঘরে ঢুকে সাহানার পিঠে হাত রেখে মৃদুস্বরে ডাকল, মা! ও মা!

সাহানা ঘুমোয়নি—কিন্তু ওঁৎ পেতে এতক্ষণ সব আঁচ করছিল যেন। মুহূর্তে ধুড়মুড় করে উঠে বসল সে। তারপর—ছেনাল, খানকি, বেশ্যা! সরম হয়নি এখনও? এখনও তুই বেঁচে আছিস? বলে আচমকা এলোপাথাড়ি দুমদাম কিল চড় থাপ্পড় মারতে সুরু করল। …মা! আমার আহ্লাদের মা! হারামজাদীর জানশুদ্ধ নিকালে দেব আজ!…ভিজে আঁচড়ানো সুন্দর কালো ঘন চুলের ঝুঁটি ধরে সাহানা রুবির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিল বারবার।

তারপর ক্লান্ত হয়ে ক্ষান্ত দিল সে। রুবি নতমুখে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে মার হজম করছিল। এবার পা তুলতেই সাহানা গর্জাল।… কোথায় যাবি? থাক্, তুই কয়েদখানায়। আজ থেকে দুনিয়ার চাঁদসুরুয তোর মানা।

দ্রুত বেরিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল সে। শিকল তুলে দিল। তারপর বন্ধ কপাটে পিঠ রেখে হাঁফাতে থাকল। লাল উদ্‌ভ্রান্ত চোখে নিজের এতদিনের ঘরবাড়ি উঠোনটা দেখছিল সাহানা বেগম।…

তখনও কিন্তু রুবির আসল কীর্তিটা কী, একটুও জানা ছিল না সাহানার। আকবরকে হঠাৎ সবার সাক্ষাতে অমন করে অপমান করে বসা, হেমনাথের গাম্ভীর্য আর রহস্যময় কথাবার্তা—সাহানাকে এমনি ক্রুদ্ধ করে ফেলেছিল।

যদি জানা থাকত—তাহলে…

কী ঘটত? সেটা অনুমান করা হয়তো বা কঠিন, কিংবা কঠিনও নয়।

অনেক রাতে হেমনাথ আর প্রভাময়ী চুপিচুপি কথা বলছিল। ঝুনু শুয়ে পড়েছে অনেক আগে। সুনন্দ ভিতরবাড়ির বারান্দায় মাদুর পেতে ঘুমোচ্ছে। হেমনাথ বাইরের প্রাঙ্গণে সেই মাচায় খোলা আকাশের নীচে শুয়েছিলেন। প্রভা তাঁর পায়ে তেল মালিশ করছিল।…

…আজ রাত্তিরটা কিন্তু বেশ যাবে।…হেমনাথ বলছিলেন।… দেখছ? একটু একটু হাওয়া দিচ্ছে যেন!

প্রভা হাসল।…তোমার মতিভ্রম। হাওয়া কোথায়? গাছের পাতাটিও তো নড়ছে না। তবে গরমটা একটু কম।

একটা ফ্যানের ব্যবস্থা থাকলে ঘরেই শুতুম। ধুস! ফাঁকা আকাশের নীচে শুতে এমন গা বাজে!

ঘরে শুলেই পারো। হাতপাখা তো রয়েছে। আমার দিব্যি কেটে যায়।

তুমি পাখা দোলাবে? রক্ষে করো। তোমার তো সেই বালিকা-বয়স থেকে দেখছি, শুলেই নাসিকাগর্জন এবং হাঃ হাঃ হাঃ!

তুমিও কম যাও না!

আমার নাক ডাকে নাকি? কই, টের পাইনে তো!

তুমি কী-ই বা টের পাও! তোমার চোখ থেকেও নেই, কান থেকেও কালা।

কেন, কেন? কী হয়েছে?

হবে আবার কী? এমনি বলছি।

ধুৎ! খামাকা কিছু বলার পাত্রী তুমি নও। কী, বলই না খুলে?

প্রভা চুপ করে থাকল। নিঃশব্দে পায়ে হাত বোলাচ্ছিল সে।

হেমনাথ বিরক্ত।…ওই এক বদ অভ্যাস তোমার। আদত কথাটি খুলেও বলবে না—অথচ গঞ্জনা দিয়ে খোঁচা দেবে। কী ব্যাপার? সুনুর কথা? ছেড়ে দাও—ভালো লাগে না। সমবয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে এমন একটু হয়েই থাকে। তাছাড়া পিঠাপিঠি বাড়ি—ধরো যদি ও আমাদের জাতি-জ্ঞাতিই হত—সে একটুখানি সমস্যা ছিল বইকি। সে ভিন্ন জাত—আমরা ভিন্ন জাত। কোন কথাই ওঠে না এতে। আর—সুনুর এই বয়সটা কেমন জানো? কতকটা পালছাড়া বাছুরের মত—এখানে মুখ দিচ্ছে, ওখানে দিচ্ছে—ছোঁক ছোঁক করে ঘুরছে। ও বয়স আমার ছিল না? ওতে তেমন দোষের কিছু নয়।…ওটা পুরুষ চরিত্রের স্বভাবধর্ম। এই বলে হেমনাথ ফের হেসে উঠলেন।

প্রভা বলল, সুনুর কথা কি আমি ভাবছি না ভাবব? কোন্‌টা সম্ভব কোন্‌টা অসম্ভব ও ভালই জানে। কিন্তু আজকালকার ছেলে-মেয়েদের আমি বাপু বুঝতে পারিনে! বুঝলে? ওদের চালচরিত্তির, স্বভাব—সব কেমন উল্টোপাল্টা যেন! ভেতরে ভেতরে সব মেলেচ্ছর ডেঁপো। ঠাকুরদেবতায় রুচি নেই। জাতবেজাতের বালাই নেই। একসঙ্গে বনভোজন করে আসছে—এক জায়গায় খাচ্ছেদাচ্ছে।

সেটা যুগধর্ম। ছেড়ে দাও। আমাদের জীবনটা তো নমোনমো করে তীরে এনে ঠেকাতে চললুম—আমাদের আর কী?

প্রভা কান না করে নিজের কথার জের টানল।…বড্ড ভয় করে আমার। নিজের তো মরেহেজে গিয়ে মাত্র দুটিতে ঠেকেছে ঠাকুরের কৃপায়। কিন্তু ওই দুটিকেই কেমন ভয় করে। অবিশ্যি, সুনু—সুনু আমার খুব গুণী ছেলে—বুদ্ধিমান। তাকে বরং বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু…

হেমনাথ সচকিত হলেন।…কিন্তু? কে? কার কথা বলছ? কী করেছে সে?

প্রভা গলা খাটো করে বলল, ঝুনু। ঝুনুটা…

এঁ্যা? কী করেছে ঝুনু?…হেমনাথ ধুড়মুড় করে উঠে বসলেন।

প্রভা চাপা ধমক দিলেন।···সবতাতেই পৃথিবী তোলপাড় করো কেন? চুপ করে শোও।

হেমনাথ উত্যক্ত হয়ে বললেন, ঝুনু কী করেছে বলবে তো?

সেটা আমার পক্ষে বলা শক্ত। তবে—কেমন মনে হয় যেন। তেমন কোন গুরুতর কাণ্ড চোখে অবশ্য পড়েনি। তাহলেও···

তাহলেও?

ওই ছেলেটা গো—ওই যে রোগা ফরসামত—চোখে চশমাপরা মুসলমান ছেলেটা—ঝুনুর সঙ্গে পড়ে। আমাদের বাড়িও তো আসে মধ্যে মধ্যে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। ও হল আমাদের মতিউল কাজির ছেলে। কবীর! তাই বলো!

আমার কেমন মনে হচ্ছে, বুঝলে? ঝুনুর কাছে প্রায়ই ওর নামলেখা গল্পের বইটই দেখি—গানের খাতাও একটা দেখছিলুম। তারপর···অবিশ্যি, আমার ভুল হতেও পারে—আজকালকার কী ব্যাপার, বুঝিনে।

হেমনাথ রুদ্ধশ্বাসে বললেন, আর কী দেখেছ?

প্রভাও রুদ্ধশ্বাসে বলল, একদিন দুপুরবেলা ঘুমোচ্ছি—হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। তাকে লক্ষ্মীর ঝাঁপির ওপর বেড়াল উঠেছিল—ঝাঁপিটা পড়ে যেত আরেকটু হলেই। উঠে গিয়ে ধরে ফেললুম। মনে মনে বললুম, মা আমায় সময়মত জাগিয়ে দিয়েছেন! কী অলক্ষুণে কাণ্ড! তারপর বেরিয়ে ঝুনুর ঘরে গেলুম। গিয়ে দেখি সেই মুসলমান ছেলেটি ঘরের মধ্যে ঢুকে বসে রয়েছে! ও হরি, তাই এই কাণ্ড! ঝুনুর ওপর রাগ হল। কিন্তু কী বলব তখন? এদিকে ছেলেটি দৌড়ে এসে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে আর কী! একটু সরে এলুম। আশীর্বাদও করতে হল। তা—কথাটা বলব বলব করে তোমায় বলা হয়নি।

সুনু ছিল না তখন?

উহুঁ

ছুজনেই কয়েকমুহূর্ত চুপ করে থাকলেন। তারপর প্রভা একটু শুকনো হেসে বলল, ছেলেটিকে দেখে কিন্তু মুসলমান বলে মনেই হয় না। দিব্যি বামুনের ঘরের ছেলে যেন।

আজকাল কাকেও দেখে জাত চেনা কঠিন—ও তুমি কী বলছ! তাছাড়া হাটেবাজারে শহরে যাও না—দেখবে এক গেলাসে হিঁদু-মুসলমানে চা খাচ্ছে। সেটা কোন কথা নয়। কিন্তু···

ঝুনু আমার তেমন মেয়ে নয়। তবে, বয়সটা বড় শত্তুর কিনা। চোখে-চোখে রাখতে হবে। আর তাও বা কেমন করে রাখব? বাইরে গিয়ে কী করছে—জানব কেমন করে? ভাবতে অবাক লাগে, আমাদের পেটের ছেলেমেয়েরা কী হল সব? তেষ্টা পেলেই কি যেথাসেথা জল খেতে আছে? জন্তুজানোয়ার, না মানুষ সব?

সেই কথা।···বলে হেমনাথ পাছুটো ছড়িয়ে দিলেন। আকাশের নক্ষত্র দেখতে থাকলেন।

জীবনের এতগুলো বছর কাটিয়ে—এতদিনে এই প্রথম ছুজনে নিজেদের একটা গভীর অসহায়তা আবিষ্কার করছিলেন। হতাশা ওঁদের মিইয়ে দিচ্ছিল। কোন কথা বলতে পারছিলেন না কেউ। মনে হচ্ছিল—কী একটা প্রচণ্ড—ভয়ানক শক্তির প্রবাহ পৃথিবীতে আবাহমানকাল ধরে চলেছে। কিন্তু আজ যেন সে কোন বাধাই আর মানবে না। তাকে আর কোনমতে বশ মানানো যাবে না। তাকে রুখতে গেলে তার অপ্রতিরোধ্যতা পৃথিবীর এযাবৎকালের সব সাজানো সংসারকে ভাসিয়ে তছনছ করে বয়ে যাবে। চারদিক থেকে তার পায়ের পুরনো শেকলটা ভেঙে পড়ার ঝনঝন শব্দ ক্রমশঃ স্পষ্ট হচ্ছে।

আর প্রাজ্ঞ মানুষ হেমনাথ শুধু ভাবছিলেন—এ শক্তি কি মঙ্গলের না অমঙ্গলের? একি বিধ্বংসী, না সৃষ্টিশীল? একে বরণ করা ভালো, নাকি প্রত্যাখ্যান করা উচিত? কিন্তু শেষঅব্দি তাঁর পঞ্চান্ন-বছরের জমাট সংস্কারকে তিনি তাঁর সামনে সবেগে এগিয়ে যেতে দেখলেন। অস্ফুটকণ্ঠে হেমনাথ বলে উঠলেন, না, না।

সাত

কুসুমগঞ্জে এই রাতটি ছিল একটু ভিন্ন।

ভিন্ন—কারণ, এর কিছু মানুষ এযাবৎকালের ইতিহাসে সম্পূর্ণ নতুন একটি কথা নিয়ে ভাবছিল। আলোড়িত হচ্ছিল। তাদের সবারই সামনে এসে বারবার দাঁড়াচ্ছিল সেই ভয়ঙ্কর অবিশ্বাস্য শক্তি। তাদের সবার মনে একই ভয় হচ্ছিল, সাজানো বাগান এবার বিধ্বস্ত হতে চলেছে। যুগযুগান্তকালব্যাপী কোন গুহার ভিতর যেন পাথর-চাপা দেওয়া হয়েছিল কোন এক স্বাধীনতাকে—যে স্বাধীনতা বস্তুপুঞ্জে প্রাণের মত সাবলীল ও সরল,—বৃক্ষের বেড়ে-ওঠার মতো স্বচ্ছন্দ ও অবাধ—নদনদীর বহমানতার মত স্ব-স্বভাবী এবং যে স্বাধীনতায় সূর্যের উদয়াস্ত, পৃথিবীতে ঋতুচক্র, জন্মদান ও ধারানুক্রমিক বংশবহন ঘটে থাকে আর—সেই স্বাধীনতার চাপা পাথরটা থরথর করে কাঁপছিল। মনে হচ্ছিল প্রকৃতির গুহাস্রাবী সেই স্বাধীনতাস্রোত এবার সবেগে ধেয়ে আসছে দিকপ্রান্তর ভাসিয়ে।...

আফজল খাঁ চাপা গলায় কথা বলছিলেন সাহানা বেগমের সঙ্গে।

আর রুবি বারবার চেষ্টা করছিল তার বিদ্রোহের মধ্যে অসঙ্গতি খুঁজতে। সে একটা পরিপূর্ণ চেহারা তৈরী করছিল তার স্বাধীনতা-বোধের—অবিকল যে নিষ্ঠায় বাজীকর তার বাজীর মশলা দিয়ে বিস্ফোরক তৈরী করে।

আর সুনন্দ? সুনন্দরও ঘুম আসছিল না। রুবির আচরণ এবং খালেক চৌধুরী তার বাবাকে কী সব ইশারায় বলে নাকি পরোক্ষে অপমান করেছেন—এসবের মধ্যে নিজের সঠিক এবং প্রকৃত জায়গাটা কোথায়, সে ব্যাকুলভাবে খুঁজছিল। সে বিস্মিত, উত্যক্ত, বিমূঢ় হয়ে পড়ছিল। প্রচণ্ড জ্বালায় সে অস্থির হচ্ছিল।...

আর ঝুনু—ঝর্ণা? সেও সচকিত। রুবি ও সুনুদার এতদিনের সব আচরণকে একটা পটভূমি বানিয়ে নিজের কিছু আচরণের মানে বুঝতে চেষ্টা করছিল সে। বিপন্ন বোধ করছিল ঝুনু। তার মনে হচ্ছিল, এরপর আগামী দিনের পৃথিবীতে তার দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে একটা পরিণতি—যার উল্টো নাম স্বাধীনতা, কীর্তি ফাঁস করে দেওয়া সেই সরল কিংবা বোকা, নির্লজ্জ আর শক্তিমান মুক্তি—তাকে কেমন করে সামলাবে ভাবছিল সে।...

এবং কবীর, বিকেলে শেফালীদের বাড়ি এসে ঝুনুর কাছে রুবির ব্যাপারটা শুনে গেছে সে। শুনেছে খালেক চৌধুরীর হেমনাথকে অপমানের দারুণ খবরটাও। সে একটু চিন্তাশীল ভাবুক প্রকৃতির ছেলে হলেও তার সক্রিয়তার শক্তি অসাধারণ। রাজনীতির প্রতি তার উদ্যম আছে। তার পৃথিবীটা অনেকের চেয়ে আরো বড়ো। তাই তার ত্রাস অন্যখানে। এযাবৎকাল কুসুমগঞ্জে যা ঘটেনি, তাই যেন ঘটে যাবে—শীগগির রক্তের হোলিখেলা শুরু হবে। গুরুতর ত্রাসে সে কাঠ হয়ে পড়েছিল। এবং তার বিপন্ন স্বাধীনতার ওপর ঝুনুকে বিপর্যস্ত ছোটাছুটি করতে দেখছিল—যে ঝুনু কোন বিরাট গাছের গুঁড়িতে সতেজ সুন্দর এবং আকস্মিক একটা পাতার অঙ্কুর—আপাতদৃষ্টে খাপছাড়া এবং যে গাছটা ঝড়ে দুলতে সুরু করেছে।

এবং আকবর। আকবরের চোয়াল আঁটো হয়ে যাচ্ছিল বারবার। সে শুধু একটার পর একটা সিগ্রেট টানছিল। এ্যাসট্রেটা পুরো জমে গেলে সে তখন মেঝেয় ছাই ফেলছিল। ফ্যানের হাওয়ায় সে ছাই তার চোখে এসে পড়ছিল। কী যে ঝামেলা।

আফজল, মকবুল দরজীর আড্ডায় সারা দুপুরটা কাটিয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন বিকেলে। হঠাৎ খুব চমৎকার মানুষ হয়ে উঠেছিলেন তিনি। সাহানাও ততক্ষণে রুবিকে ঘরবন্দী করার সুখে শান্ত আর নিশ্চিন্ত। গায়ের ঝাল অনেকটা ঝাড়া গেছে। তার ওপর ক্ষিদে,

অনেক সময় মানুষকে বাস্তববাদী এবং স্বাভাবিক করেও ফেলে! স্বামী স্ত্রীর পক্ষে এই জিনিসটিই বেশ ফলদায়ী হয়ে উঠেছিল সম্ভবত। আফজল বাড়ি ফিরেই বলেছিলেন, কই শীগগির খানা নিকালো। পেটের কুত্তা বেদম চিল্লাচ্ছে।

সাহানা স্বামীকে দেখামাত্র স্বস্তি পেয়েছিল। একটু হেসেও ফেলেছিল সে। অনেকদিন পরে খাঁয়ের বাচ্চা 'ইসলামি জবানে' কথা বলছে! হিন্দু সংসর্গে ঘুরে-ফিরে লোকটার জবানও যেন বদলে গেছে অনেকখানি। সুরুয়াকে বলে বসে 'ঝোল', গোশত'কে বলে ওঠে 'মাংস', 'খানা নিকালো' না বলে কখনও বলে 'ভাত বাড়ো', 'হাত ধোব'র বদলে 'আঁচাবো', 'গোসলের' বদলে 'চান' এমনি সব কতরকম!

এবং খেতে বসে অভ্যাসমত আফজল রুবির খাওয়ার কথা জিগ্যেস করেছিলেন। সাহানা নিঃসঙ্কোচে বলেছিল, ওর খাওয়া হয়ে গেছে। এখন তুমি খাও তো দেখি। তারপর তার মায়ের মন মোচড় দেবারই কথা—দিয়েছিলও।

স্বামীর খাওয়া শেষ হলে—যখন বিকেলেও গড়াচ্ছে, সাহানা তাঁকে বলেছিল, অবেলায় আর গড়িয়ে কাজ নেই। দলিজে গিয়ে বরং বসো খানিক। গায়ে হাওয়া লাগবে।

দলিজ—মিয়াবাড়ির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ—সেটা ছিলই একটা। বাইরের দিকে ছোট্ট বারান্দাসমেত এ ঘরেরই একটা ছোট্ট কামরা। তাতে আছে খানতিনেক ভাঙা চেয়ার আর একটা নড়বড়ে টেবিল। তাকে কিছু উইকাটা পুরনো পত্রপত্রিকা, খবরের কাগজ—তাদের মধ্যে অনেকগুলো তথাকথিত 'মুসলিম' সম্পাদিত মুসলিম লেখকদের গল্প-কবিতা প্রবন্ধে ভরা পত্রিকা—যার মধ্যে 'মুসলিম জাহান' শীর্ষক সচিত্র প্রতিবেদনগুলো রুবিকে অনেকবার পড়ে শোনাতে হয়েছে মাকে এবং তা আব্বার তাগিদেই, কারণ এর মধ্যে দুনিয়ার গুণী মাহিলাদের পরিচিতি ও ছবি থাকত সবচেয়ে বেশি এবং আফজল তাঁর হিন্দু বন্ধুর সংসর্গে পড়ে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা বিষয়ে যথেষ্ট সংক্রামিত হয়ে পড়েছিলেন এবং শরীয়তভীতা সাহানা বেগমের মুখের ওপর

তুড়ি বাজানোর জন্যে ওইসব উদাহরণ ছিল মোক্ষম। পরে পরাজিতা এবং পিছু হটে যাওয়া সাহানার পক্ষে আর শরীয়তী আক্রমণের আশঙ্কা না থাকায় পত্রিকাগুলো এ বাড়ির খান্দানী চিৎপ্রকর্ষের নমুনা হিসেবে দলিজ ঘরের তাকে স্থান পেয়েছিল।

দেয়ালে ঝুলন্ত মক্কামদিনার ছবিসমেত কিছু ক্যালেণ্ডার যেমন রয়েছে, তেমনি আছে অনেক দেশনেতাদের ও 'হিন্দু' কবির ছবি। তারা তিন থেকে দশ বছরের পুরনো। চুনকামওঠা ফাটা দেয়ালের বেইজ্জতী ঢাকবার জন্যে তারা এখনও রয়েছে। জিন্না সাহেবের ছবিও এক সময় ছিল। দেশ ভাগের প্রথম দিন সকালেই আফজল তাকে অপসারিত করেছিলেন। তার মানে কিন্তু এই নয় যে তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন কিংবা দেশ ভাগের ব্যাপারে তাঁর কোন সুনির্দিষ্ট মতামত ছিল। জিন্না সাহেবের ছবি রাখা তখন কুসুমগঞ্জের প্রায় প্রতিটি মুসলিম পরিবারে একটা সংক্রামক রোগে পরিণত হয়েছিল—এ যেন ছিল একটা সামাজিক প্রথার বিশেষ অঙ্গ—কিংবা একটা শিষ্টাচার। এবং বস্তুত রাজনীতি-নিরাসক্ত আফজল—যিনি সময় বিশেষে বা প্রকারান্তরে নিজের জীবন ও সংসার সম্পর্কেও কমবেশি নিরাসক্ত, তিনি ওই ছবিটা প্রথার খাতিরে রাখেননি। নিজ সমাজের আরও ছোটখাটো ব্যাপারের মতই এ ছিল একটা তুচ্ছ অভ্যাস মাত্র। এবং কোন ক্যালেণ্ডারের ছবির প্রতি তাঁর না ছিল ঔৎসুক্য, না ছিল কোন ভাল লাগা মন্দ লাগার ব্যাপার। তারিখ দেখারও তাঁর দরকার হত না। ওরা ছিল নিছক দেয়ালের পোশাক।

কিন্তু দেশ ভাগের সকালে সেই প্রথম তিনি ক্যালেণ্ডার-সচেতন হয়ে পড়েছিলেন এবং সে ছিল একটা মারাত্মক ধাক্কার মত।

সারা কুসুমগঞ্জে শঙ্খধ্বনি হচ্ছে রাত বারোটার পর থেকে—তারপর মিছিল বেরিয়েছে। প্রতি বাড়ির শীর্ষে তেরঙা পতাকা উড়ছে। আফজল উঠোনে দাঁড়িয়ে ভাবছিলেন, একটা কিছু ঘটছে। হ্যাঁ—স্বাধীনতা। কী এই স্বাধীনতা? হেম যার জন্য ছমাস ফাঁকির

কষ্টে জেল খেটেছিল! আর কী এই ভারত-পাকিস্তান? খুব বিব্রত বোধ করেছিলেন আফজল। ছুঃ ছাই! এতে তাঁর ভূমিকাই যেন নেই। কেউ যেন পাত্তা দেবে না তাঁকে। বিব্রত কুণ্ঠিত মুখে তিনি বন্ধুবাড়ির দিকে তাকালেন। দেখলেন হেমনাথের বাড়ির ওপর লম্বা বাঁশে তেরঙা পতাকা উড়ছে। হেমনাথের বউ শাঁখ বাজাচ্ছে।

…সেদিন ঈদের পরব। এমনিতে বড় ছুঃখের দিন তার এ আনন্দের শুভ দিনটিতে। ঘরে নেই ঘরনী। দড়ির দোলনায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে এক বছরের মা-হারা ছেলে ওই মুকুল। সারা রাত সে ঘুমোতে ছায় না। চোখ জ্বালা করছিল আফজলের। ধার্মিক মুসল্লী না হলেও জীবনে এই প্রথম তাঁর ঈদের নমাজে যাওয়া হচ্ছে না। ছেলে ফেলে কেমন করে যাবেন? হাত পুড়িয়ে নিজেই রান্না করেন। ইচ্ছামত তেল মশলা খরচ করার সুযোগ অবশ্য মিলেছে। ভোজনবিলাসী মানুষের পক্ষে এটা অবাধ স্বাধীনতা হলেও বেশ কষ্টকর। তার ওপর ওই কচি শিশু। ঈদের দিনে এই এক মুসলিমবাড়ি সেমাই পায়েস ফিরনী হচ্ছে না! অবশ্য পড়শীরা খাঞ্চা সাজিয়ে প্রথামত এসব খাবার দিয়ে যাবেই। কিন্তু তাতে কি তৃপ্তি মেটে? ছুঃখিত আফজলের হঠাৎ চমক খেলে গেল হেমনাথের বাড়ির আকাশে রঙীন পতাকাটা দেখে। সবকিছু ভুলে গেলেন তিনি।

…পরক্ষণে চৌধুরীবাড়ির দিকে চোখ গেল। আরে? কোথায় গেল কালকের সেই সবুজ নিশানটা? তার বদলে বাঁশের ডগায় উড়ছে তেমনি তেরঙা ঝাণ্ডা। কালীবাড়ি দেখলেন। সেখানেও একই রদবদল। যেদিকে চোখ যায়, একই দৃশ্য। সব সবুজ নিশান রাতারাতি যেন মারাত্মক ত্রাসে নাকি লজ্জায় তেরঙায় পরিণত হয়েছে।

মুহূর্তে তেমনি কী দুর্বোধ্য লজ্জা বা ত্রাসে তাঁর বুক কেঁপে উঠল। চোরের মত পা টিপে দলিজ ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। জিন্নার ছবিটা পেরেকশুদ্ধ উপড়ে নিলেন। ঝরঝর করে কিছু চুণের পলেস্তারা খসে পড়ল। ভিতরের মাটি দাঁত বের করল। ছবিটা ছিঁড়ে ফেললেন। উনুনে গুঁজে দিয়ে স্বস্তি পেলেন।…

ত্রাস না লজ্জা, ভীতি না অনুতাপ—কেন রাতারাতি মুসলিম প্রভাবিত কুসুমগঞ্জের সব সবুজ নিশান চেহারা বদলে তেরঙা হয়ে উঠেছিল সেদিন সে বিচার করার দায়িত্ব সমাজবিজ্ঞানীর, সে দায়িত্ব ঐতিহাসিকের—তা আমার নয়, প্রাজ্ঞ পাঠিকা! এখানে আমি এ কাহিনীর লেখক ছিলুম শুধু দ্রষ্টা—নিতান্ত নিরাসক্ত এক দ্রষ্টা মাত্র। সমস্যাটা কোথায় জানেন? যে মুহূর্তে এ কাহিনী শোনানোর প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছি, ঠিক সেই মুহূর্তেই আমি জাতিচ্যুত দেশবিহীন রাষ্ট্রসীমানাবর্জিত এক অখণ্ড মানুষের মধ্যে হারিয়ে বসেছি নিজেকে। সারা পৃথিবী এমনকি যদি দূর গ্রহে বা নক্ষত্রে কোথাও কোন প্রাণী থাকে—আমি সেই নিখিল বিশ্বলোকে তাদেরই একজন ছাড়া কিছুই নই। অনাদিকালের প্রাণপ্রবাহে আমি এক কীটাণু-কীট হতে পারি—কিন্তু অবিচ্ছেদ্য সত্তা তো বটেই। আশাকরি, আমার সমস্যাটা আপনাকে বোঝাতে পেরেছি। আরও কি স্পষ্ট করব? হিটলারের জার্মানীতে লক্ষ লক্ষ ইহুদি নিধনে আমার যেমন যন্ত্রণা হয়েছিল, সেই নিধনযজ্ঞের মূল হোতা আইখম্যানের ফাঁসিতেও আমার বুক ভেঙে যাচ্ছিল যন্ত্রণায়। গান্ধীজীর বুকের গরম সীসের গুলি যেমন আমার বুকের ভিতর রক্তপাত ঘটিয়েছিল, তেমনি ফাঁসির দড়িতে শ্বাসরুদ্ধ নাথুরামের যন্ত্রণাও আমি অবিকল টের পেয়েছিলুম। আঃ, এর নামই তো মানুষজীবনের পরম যন্ত্রণা! অনেক দুঃখে আমাদের—এই হতভাগ্য লেখকদের শিখতে হয়েছে, জীবন মানেই যন্ত্রণা। আমরা শুধু আর্তকণ্ঠে যুগযুগান্তকাল চীৎকার করে বলি, মানুষ! মানুষ! তুমি কী করছ? এবং এই একই চীৎকার তো প্রতিধ্বনিত হয়েছিল একদিন মহিমময় পবিত্র পুরুষ সেই যন্ত্রণাদগ্ধ পয়গম্বরের মুখে—ঈশ্বর, ঈশ্বর! এদের তুমি ক্ষমা করো। এরা কী করছে তা জানে না।

তবে কিনা আবেগ পাপ। আবেগ সত্যকে গোপন করতে শেখায় এবং তা শিল্পের দুষমন। কিন্তু এ কাহিনী যাতে আবেগবর্জিত হয়, তার প্রতিশ্রুতি দিতে পারছি না বলে আমি দুঃখিত। কারণ,

কুসুমগঞ্জে উনিশশো পঁয়ষট্টি খ্রীষ্টাব্দের সেই গ্রীষ্মকালটা একটা প্রচণ্ড আবেগের স্রোত এনে ফেলেছিল কিছু নরনারীর জীবনে। আর, সেইটাই যা হঠকারিতা।……

তাই আফজল স্ত্রীর কথা মেনে নিলেন। দলিজের বারান্দায় মাতুর পেতে বসে থাকলেন। সেখপাড়ার ফজল পথ দিয়ে কোথায় যাচ্ছিল। তাকে ডেকে তার সঙ্গে চাষবাস নানা কথায় মেতে উঠলেন। খুব বর্ষা হবে এবার, চাষবাস ভাল হবে এবং তুনিয়ার মানুষের ঘরে ঘরে ফসলের বান ডাকবে। ইত্যাদি।…

ওদিকে সাহানাও শান্ত আর আশ্বস্ত। দরজার শিকল খোলার ঝনঝন শব্দটা তার মাতৃত্বে একটা ঝংকার তুলল। বাপহারা 'এতিম' মেয়েটার জন্য 'কলিজা' কেমন মোচড় দিল এতক্ষণে। সে দেখল, রুবি চুপচাপ বসে আছে অন্ধকার ঘরে। কারণ এ ঘরের জানালার সামনে বাক্সের পাঁজা। পর্দাভীতু সাহানার এই কাণ্ড। জানালা খুললেই পথটা নজরে পড়ে কিনা।

সাহানা মুখে হাসি নিয়ে মেয়ের পিঠে হাত রাখল।……পাজী মেয়ে আমার এমন মাথা খারাপ করে দ্যায়, দ্যাখো না! নে ওঠ্, খাবি চল।

রুবি জবাব দিল না। তার মায়ের এ স্বভাব তার জানা। কিন্তু কোনদিন তো মা তার গায়ে হাত তোলেনি!

ওঠ—মা আমার, সোনা আমার! সাহানা আদর করছিল মেয়েকে। রাগ মানাচ্ছিল।…যা করেছিস্, বেশ করেছিস্! ওসব বড়লোকের বড়মানুষী আমার একটুও সয় না মা। ওই হারামজাদাটাই যে এ্যাদ্দিন রাজ্যি জুড়ে তোর খিটকেল করে বেড়াচ্ছে, বিয়েতে ভাঙচি দিচ্ছে—তা কি জানতুম? জানলুম, তুই ওকে তেড়ে গেলি দেখে। সত্যি রে, তখন বুঝিনি—পরে ঠিকই বুঝলুম কেন তুই ওকে অপমান করে বসলি।…বেশ করেছিস! তু'ঘা মেরে দিলেও এখন

খুসি হতুম। তবে কী জানিস? মেজবাবুর সামনে ঝুনুর সাক্ষাতে কাণ্ডটা হল কিনা—তাই আমার মাথায় রাগ চড়ে গিয়েছিল।... কই আয় দিকি।...মাথার চুল নেড়ে দিল সাহানা।...গোসল করে ভাল করেছিস। আমার হল না মা—গা পচে বজবজ করছে। যাই—অবেলাতে এটুখানি পানি ঢেলে দিই বরং। নাকি—তখন মায়েঝিয়ে একসঙ্গে খাব?

রুবি স্তব্ধ। কাঁদছিল না মোটে—চোখ দুটো লাল, পাপড়ি ফোলা—মুখটা থমথমে।

স্তব্ধতা সম্মতি জেনে সাহানা দ্রুত ইঁদারার ধারে গেল এবং কোনমতে স্নানটা সেরে নিল। ভিজে কাপড় বদলাতে ঘরে ঢুকে দেখল, রুবি তখনও চুপচাপ বসে রয়েছে।

অগত্যা সাহানা কাপড় বদলেই মেয়েকে কতকটা কোলে তুলে হাঁফাতে হাঁফাতে এবং হাসতে হাসতে বেরোল। বারান্দায় এলে রুবি আস্তে বলল, আঃ ছেড়ে দাও।

বিকেলের চমৎকার আলোয় মেয়ের মুখটা দুহাতে ধরল সাহানা। খুঁটিয়ে দেখে নিল কোথাও মারধোরের দাগ আছে কিনা। বলল— কানের নীচেঅব্দি জোর করে মুখ ঘুরিয়ে দেখে আশ্বস্ত হল। এমন সোনার চাঁদ আমার! গুখেকোর ব্যাটাদের ঘর আলো করতে দেব ভেবেছ তোমরা! ওই চাষামাগীর বাঁদী হতে যাবে? ঝাড়ু মারো, ঝাড়ু মারো মুয়ে (মুখে)।

...সুতরাং রুবিকে খেতে বসতে হয়েছিল। কিন্তু হয়তো ক্ষিদে পড়ে গিয়েছিল অত বেলায়, অথবা দুঃখে—সে কিছু ভাত নাড়াচাড়া করে উঠে পড়েছিল। তারপর নিজের স্বাধীনতার সীমা বাজিয়ে নিতে প্রথমে নিজের ঘরে গিয়েছিল। পরে খিড়কিতেও উঁকি দিয়েছিল—এবং তখনই সাহানা শুধু বলেছিল, সোমত্ত মেয়ে সন্ধ্যেবেলা ওখানে দাঁড়াতে নেই, সরে আয়। সেটা জিনপরীর দৃষ্টি পড়ার কিংবা পূর্বঘোষিত বন্দীত্বের একটি হুঁশিয়ারী, রুবির অনুমান করা কঠিন। সে সরে এসেছিল।

না—তখনও সাহানা চিঠির ব্যাপারটা জানত না। জানতে পারল অনেকটা রাত্তিরে। রুবিকে পাশে নিয়েই আজ সে শুত। কিন্তু আফজল চোখ টিপে বলেছিলেন—কিছু জরুরি কথা আছে বেগম। রুবি ওঘরেই থাক।···

এবং আফজল চাপা গলায় একথা ওকথার পর সেই গুরুতর দুঃসংবাদটা দিলেন। আরও জানালেন, খালেক চৌধুরী হেমনাথকে কী সব বলে নাকি অপমানের চূড়ান্ত করেছেন—সকালেই সে খবর তাঁকে জানিয়ে গেছেন কাজীসায়েব। কবীরের বাবা।

সাহানা কিছুক্ষণ নিঃসাড় পড়ে রইল। কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। রুবি—তার মেয়ে রুবি 'বেগানা' (ভিন জাতের) ছেলের সঙ্গে 'বদ কাম' (অসৎ কাজ) করেছে? ওই রুবি—যার দেহের প্রত্যেকটি জায়গা এখনও সাহানার চোখের সামনে স্পষ্ট ভাসছে! এই তো সেদিন—সেদিনই তো তাকে ন্যাংটো গোসল করিয়েছে সে—সাবান মাখিয়ে দিয়েছে! সেই রুবি? রুবিরও একজন পুরুষ দরকার এবং এই বোধ থেকেই জামাই খোঁজার ব্যস্ততা সাহানার মনে। কিন্তু আশ্চর্য, বোধটা যেন আরও হাজার গুণ উজ্জ্বল হয়ে গেল মুহূর্তে। ভয়ঙ্কর হল। মারাত্মক হয়ে উঠল।

সাহানা ত্রাসে কাঠ হয়ে গেল। আঃ, হারামজাদী বোকা—হাবা মেয়ে কতখানি কী করেছে, এবং সত্যিসত্যি তার সীমানাটা কদ্দূর আঁচ করতে না পেরে সাহানা ভয় পাচ্ছিল। সত্যি যদি শয়তানীটা বেশী কিছু করে থাকে—সে তো প্রচণ্ড ভয়—ঘেন্নার কথা! ওর ওই কচিকাঁচা নরম তাজা দেহটা থেকে বিষের আঁকুর গজায় যদি! খুব বাস্তব দিক থেকেই ভাবছিল সাহানা—এবং এই সম্ভবত স্ত্রীস্বভাব। একটা মৌন হাহাকার তার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল! তার মাথা ভাঙতে সাধ যাচ্ছিল—রুবি—তার আদরের রুবির নতুন জঠরের কথা ভেবে এ যন্ত্রণা সাহানার। ওই পবিত্র নিষ্পাপ জঠরে শয়তানের থাবার দাগ পড়েনি তো?

সাহানার ভাবনা-যন্ত্রণাবোধটা এমন যেন—কোনমতে যদি আশ্বস্ত বা নিশ্চিন্ত করা যায় তাকে যে রুবি এখনও দেহের দিকে সত্যিসত্যি নষ্ট হয়নি—যা কিছু ঘটেছে মনের ক্ষেত্রে—তাহলে হেলায় তুচ্ছ করবে এ ঘটনাটা। বলে উঠবে—ছুস্! ও একটু-আধটু হয়েই থাকে মনামনি বয়সকালে। বলি, গাছটা যখন মাথা তুলে উঠেছে, ছায়াটাতো না থাকা হবে না! ছায়াও থাকবে। এবং কোন না কোনখানে সে-ছায়া পড়বেই! না হয় পাশের বাড়ির 'বেগানা' ছেলেটার ওপরই পড়েছে!

কথাটা কিন্তু আফজলই বলছিলেন।...না, এ তেমন কিছু ধর্তব্য নয়। গাছের কথাই ধরো। বলি, গাছটা যখন মাথা তুলে উঠেছে...

এ পর্যন্ত শুনেই সাহানা যেন জল থেকে ভুস করে মাথা তুলে প্রশ্বাস ফেলল। কিন্তু পরক্ষণে স্তিমিত হয়ে বলে উঠল, কিন্তু ধর্তব্য নয়ই বা কেন? ওরা যে ভিন্ন জাত। ওনারা হিঁদু—আমরা মোসলমান। এ্যাদ্দিন কানাঘুঁষো শুনেছিলুম। ভাবতুম—পাশাপাশি বাড়ি, শিক্ষিতা মেয়ে—বাইরে বেপর্দা ঘোরে। লোকে তো পাঁচকথা বলবেই। তাতে মেয়ের যা চেহারা—টুক্‌তে নেই, এতল্লাটে আর কারো ঘরে তো মিলবে না—তাই ভাবতুম, ওরা সব হিংসেয় জ্বলেপুড়ে মরছে আর পাঁচকথা রটাচ্ছে। কিন্তু হা খোদা! এ যে একেবারে সত্যিসত্যি কাণ্ড! জাত কুলনেশে মেয়ে আমার এ কী করে বসল গো! আঃ ছি ছি ছি!

আফজল চুপ করে কিছু ভাবছিলেন।

সাহানা ডাকল, বড়মিয়া?

উঁ?

আচ্ছা, এসব মিথ্যেও তো হতে পারে! উড়োচিঠির খবর। কে বললে, চিলে তোমার কান নিয়ে গেল! আগে কানটি তো দেখবে? না কী?

বড় আশা নিয়ে একথা সাহানা বলেছিল, কিন্তু তাকে মুহূর্তে হতাশ করে আফজল বললেন, আমি দেখেছি।

সাহানা নড়ে উঠল। দেখেছ? কী দেখেছ তুমি? কই, আমার তো কোনদিন তেমন কিছু চোখে পড়েনি।

আফজল ঘোঁৎঘোঁৎ করে বললেন, তুমি আবার কিছু ছ্যাখো নাকি? তোমার চোখ থাকে মাটিতে, পাছুটো আসমানে। বাড়ি থাকো তুমি, আমি থাকি বাইরে—তুমি গিন্নীবান্নী মানুষ, আমি পুরুষ মদ্দ লোক। দেখার কথা ছিল তোমারই—তা মানো?

বিচলিত সাহানা রুদ্ধশ্বাসে বলল, তা মানি। কিন্তু কী দেখেছ তুমি?

আফজল চুপ।

ওগো! বড়মিয়া?

আফজল বিরক্ত হয়ে বললেন, ধুত্তেরি, রাতদুপুরে আর বড়-মিয়া-বড়মিয়া করো না। কানে বাজে।

বলো না কি দেখেছিলে? আর দেখেছিলে যদি, আমাকেই বলোনি কেন? আমি তক্ষুণি সাবধান হতুম।

আফজল এবার বেগে অভ্যাস মতো 'নাকখপ্‌দা' 'পাছা-ঘষড়ানো' ইত্যাদি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সামলে নিয়ে বললেন, ছেড়ে দাও ভ্যানতারা। কথায় বলে চোখের ছ্যাখার রকমফের আছে। নিজের মনের আয়নায় পারার দোষ থাকলে সব চীজই (জিনিসই) এলোমেলো দেখাবে। ধরো হঠাৎ দেখলুম—সুনু ওর গালে ঠোনা মারল—হঠাৎ একপলকের দেখা, এর খারাপ ভালো সবরকম মানে হতে পারে। সেইরকম। তবে জেনে রাখো, আমি ভুল করছি না। যা ছ্যাখার ঠিকই দেখেছি। আজ উড়ো চিঠি পাবার পর একসাথে সবগুলো মিলিয়ে নিয়ে স্পষ্ট পটের ছবিখানা সামনে এসে গেছে। বুঝলে?

সাহানা সাহস পেয়ে জেদের সাথে বলল, ভালো। কিন্তু রুবি যে সত্যিসত্যি নষ্ট হয়েছে—তা কি তুমি দেখেছ?

প্রশ্নটা গুরুতর। আফজল এর ওজনটা যেন বুঝে দেখলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, ছ্যাখো, জাহেলের (মূর্খের) মত কথা বলো না। স্ত্রীপুরুষে যখন নষ্ট হবার কাম করে তখন শয়তান চাদ্দিকে,

পুরু পর্দা দিয়ে ঘিরে থাকে। আব্বা বলতেন কথাটা। এ তো গেল 'জেনা'র (ব্যাভিচারের) কাণ্ড। এমন কি স্বামীস্ত্রীও যখন—

এ পর্যন্ত শুনে লজ্জা পেয়ে সাহানা বলল, নাঃ, আমার মন বলছে, অদ্দূর গড়ায়নি ব্যাপারটা। সে সুযোগ ওরা পাবেই বা কোথা ?

আফজল আশ্চর্যভাবে উল্টো প্রশ্ন করে বসলেন, পাবে না ? বনজঙ্গল দেশ থেকে উচ্ছেদ হয়ে গেছে নাকি ? কবে যে সব বনভোজন করতে যাওয়া হয়েছিল না ?

সাহানা প্রতিবাদ করল।...যাও। ওরা দলবেঁধে ছিল তখন।

আফজল কেমন হাসলেন।...আরে বাবা, গাইবাছুরে ভাব থাকলে বনে গিয়ে দুধ দ্যায়। তাছাড়া, এ বাড়ির মধ্যেই বা কিছু হয়নি, কে বললে ?

তার মানে ?

অমন জোয়ান মেয়েকে একা আলাদা ঘরে শুতে দিয়েছ।

বলার পরই আফজল টের পেলেন, ভুল হয়েছে। সাহানা ফোঁস করে উঠল, বাঃ। আমি দিয়েছি ? শরম লাগে না বলতে ? বিবিকে না পেলে মিয়ার এদিকে ঘুম হবে না—বদ্ খোয়াব (দুঃস্বপ্ন) দেখবেন। তুমি—তুমিই তো আমার মেয়ের জন্যে জাহান্নামের দরজা খুলে দিলে !

আফজল শান্তভাবে সব হজম করে বললেন, নাঃ। সব ফায়সালা আমি করে ফেলেছি মনে মনে। সময় থাকতে থাকতে গিঁট কাটা পড়বে। খোদা যা করেন, ভালর জন্যেই করেন। নুরুর কাছেই চলে যাব। শাগগির।

সাহানা স্বামীর দিকে ঘুরল এতক্ষণে। বুকে হাত রাখল। হাতটা বোলাতে থাকল।

আফজল বলছিলেন, হ্যাঁ—আজ দিনমান ভেবে তাই সাব্যস্ত করলুম। পাকিস্তানেই চলে যাই। একদিন তো যেতেই হবে। বুড়ো বয়সে কেই বা দেখবে—শুনবে ? যে দিনকাল পড়েছে, কেউ

আর একমুঠো দিয়ে সাহায্য করবে ভেবেছ? কেউ করবে না। তা ছাড়া মিয়ামোখাদিমের সে-ইজ্জতই বা কোথা পাবে? স্যাখের পো তোমার সামনে সায়েব সেজে গট গট করে হেঁটে যাচ্ছে—সালাম দেওয়া তো দূরে থাক্। আগের দিনে আশরাফকে আতরাফ মান্যি করেছে। আশরাফ (উচ্চবর্ণ) আর আতরাফ (নিম্নবর্ণ) বসেছে আলাদা আলাদা আসনে। ছুটো-তিনটে চেয়ার থাকলেও আশরাফের ব্যাটা বসবে চেয়ারে, আতরাফের ব্যাটা মাটিতে। আজকাল কোথাও এমন দেখবে না। সেবার মঙ্গলকোট গিয়েছিলুম না লতিফ কাজীর বোনপো'র বিয়েতে? বরাতদের আসনে ডাক দিতে গিয়ে বললে, দুতরফই আছে ভাইজান—যে যার নিজের তরফে গিয়ে বসে পড়ুন। দলে কজন সেখপাড়ার মাতব্বর ছিল—তারা বসল মেঝের ফরাসে। অবশ্যি সেও বড় ভালো বন্দোবস্ত। গদী আর তাকিয়াও ছিল। ওদিকে মিয়ারা বসলেন গে তোমার তক্তপোষের ওপর। সেখানেও গদী আর তাকিয়া।

সাহানার হাতটা ঘুরছিল বুক থেকে গলায়—গলা থেকে বুকে—শব্দহীন। ভাবাপ্লুত। সে উদ্ধারের দ্রুত অগ্রসরমান নৌকাটিকে অন্ধকারে ভেসে আসতে দেখছিল।

—বুঝলে সাহানা? এ একটা আজব বানবন্যার ব্যাপার। সেই বানবন্যার স্রোতে সব একাকার হয়ে যাচ্ছে। এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তোমার আশরাফ আতরাফ ছোটবড় সব কোথায় গায়েব হয়ে যাবে। তখন হেমই বা কোথা, আমি বা কোথা? হিঁদুর খাওয়া গেলাসে মোসলমানে পানি খাচ্ছে, মোসলমানের এঁটো গেলাসে হিঁদুর পিয়াস মিটছে। দেখে এসো গে না বাজারে-শহরে—তামাম মুল্লুকে আর জাত মানামানির বালাই-ই নেই। আমাদের ছেলেপুলেরাই যা সব কচ্ছে, দেখলে ভাবলে তাক লেগে যায়। যায় না? হেমের ছেলে তোমার হাতে গোরুর গোশত খায়। এঁ্যা? ভেবে দেখেছ কখনও কথাটা?

সাহানা শুধু বলল, আঃ চুপ করো। ঘুমোও।

—তুমি ভাবোই নি। নাদান মেয়েমানুষ। হেমের খান্দানে ধ্বস ছেড়েছে, টের পাচ্ছ না।

সাহানা নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল, বেশ তো। মেজবাবুর ছেলে কলমা পড়ুক—এত যখন করে ফেলতে পারে। আমি ডঙ্কা বাজিয়ে রুবিকে ওর হাতে সঁপে দেব।

হার মেনে আফজল বললেন, ধ্বস আমার খান্দানেও ছেড়েছে। কাকে দোষ দেব? এখন আল্লা-আল্লা করে ওপারে কেটে পড়তে পারলে জান-মান-ইজ্জত বেঁচে যায়। তারপর…দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করলেন আফজল।

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থাকার পর ফের বললেন, কিন্তু ভাবতে কষ্ট হয়। ওই হেম আমার জানের দোস্ত। তার ছেলে, আমার মেয়ে। হা খোদা! কেন আমরা একজাত হয়ে জন্মালুম না! এ যে কত সুখের ব্যাপার হত—কে বুঝবে সেকথা?

আচমকা স্বামীকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠতে দেখে সাহানা স্তম্ভিত। হাতটা দ্রুত গাল পেরিয়ে চোখের ওপর গেল। আঙুল ভিজতে থাকল। পরক্ষণে সাহানাও কেঁদে ফেলল।…হ্যাঁ, সেকথা কি আমি ভাবিনি? ভেবেছি। ভেবে বুকখানা ফালাফালা হয়ে যাচ্ছে। মেজগিন্নী কতবার বলেছে—আহা, অমন সোনার চাঁদ মেয়ে কার ঘর আলো করবে গো! যদি জাতেধর্মে এক হত, আমি কি ছেড়ে দিতুম ভাবছ? ছাড়তুম না কক্ষনো। আমার ঘরে লক্ষ্মীপ্রতিমা আসত গা, সে আমার কত সুখ?…হ্যাঁ, আমারও ওই কথা ছিল। অমন আসমানের সুরুষ ছেলে—যেমন চেহারা—তেমনি চলন! দুনিয়াময় মাথা ভাঙলে কোথাও মেলে না। আঃ!… নিজের বুকে চেপে ধরল সাহানা।…আল্লার দুনিয়ায় চাঁদসুরুযে মিলন হল না!

এবং, পরস্পর পরস্পরকে কতক্ষণ ধরে দুটি মানুষ সান্ত্বনা দিচ্ছিল। চুপ করিয়ে দিতে চাচ্ছিল। কিন্তু দুজনেই ছটফট করে উঠছিল গভীর আক্ষেপে।

আট

হেমনাথ বিড় বিড় করছিলেন বারবার—না, না! না, না, না!

প্রভা বলল, কী না না করছ?

হেমনাথ বললেন, ও একটা কথা। তা ছাখো প্রভা, ভাবতে বেশ লাগে, সংসারে যদি ধর্ম একটাই হত!

কেন?

খাঁয়ের মেয়েটি বেশ। লক্ষ্মীপ্রতিমার মতো চেহারা। হাসলে যেন মুক্তো ঝরে। তেমনি শান্ত ভদ্র সভ্য। বেশ মেয়ে!

খুব গলে আছ মনে হচ্ছে?

তুমি গলোনি?

প্রভা চুপ করে থাকল।

তুমিই তো ঠাট্টা করে বলতে, সুনুর পাশে যা মানায়! বলতে না?

বলতুম।

ভাবতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে প্রভা!

আমারও কি হচ্ছে না? কিন্তু কী করব?

আফজল আমার ছেলেবেলা থেকেই সাথী। পরস্পর জীবনের কোনকিছু আমরা গোপন রাখিনি। আজ কী সুখের কথাই হত—যদি…

হ্যাঁ। হত বইকি!

হয়তো সুনুও সুখী হত।

কে জানে! এর সত্যমিথ্যা কতটুকুই বা জানি আমরা!

আমি কিছু কিছু টের পিয়েছিলুম, বুঝলে?

প্রভা উৎকর্ণ হল।

কিন্তু এ্যাদ্দিন তা নিয়ে মাথা ঘামাইনি। আজ সকালে খালেক যখন এ নিয়ে আমায় পরিহাস করল—'মেজবাবুই বউ করে ফেলুন

না খাঁয়ের মেয়েকে, যা সব শুনছি ফিসফাস চাদ্দিকে'...জানো? আমি তখনই চমকে উঠেছিলুম। মনে হচ্ছিল—খুব জানা একটা ব্যাপারের ওপর খোঁচা দিচ্ছে খালেক। কবেকার মুখস্থ পদ্য ভুলে যাবার পর একটা লাইন ধরিয়ে দিলে যেমন পুরোটা মনে পড়ে যায়—ঠিক সেইরকম। তবে কী, খালেকের এ স্পর্ধা হল কেন, তাও জানি। ও বড়লোক—তার ওপর এখন প্রভাস মুখুয্যের পার্টির চাঁই। আমি গরীব মানুষ। মুখুয্যেমশায়ের কাছে একজন গরীব হিন্দুর মানসম্মানের চেয়ে পার্টির চাঁইয়ের দামটা বেশি। এই তো হচ্ছে দিনকালের গতিক। যাক্ গে, বলল—বলল। না হয়, বন্ধুর জন্যেই কিঞ্চিৎ খেসারৎ দিলুম—এই বলে চলে এসেছিলুম। কিন্তু কথাটা আমি ভুলিনি। উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করছিলুম। একটু আগেও তো তোমায় বলছিলুম—ওটা ধর্তব্য নয়, ছেড়ে দাও। কিন্তু ছাখো, যত রাত বাড়ছে—আমার মাথায় রাজ্যের ভাবনা এসে পড়ছে। মনে হচ্ছে—এ জিনিসটা খুব বাজে নয়। কোথাও যেন এর একটা গভীর গুরুত্ব আছে। তা ছাড়া তুমিও ঝুনুর ব্যাপারটা জানালে।

ঝুনুকে আমি দেখছি।...প্রভার কথায় প্রত্যয়ের দৃঢ়তা রয়েছে।

হেমনাথ একটু চুপ করে থেকে বললেন, ঝুনুটা সমস্যা নয়। সমস্যা আফজলের মেয়ে। কারণ আফজল আমার বন্ধু। কাল থেকে আর কি সহজ মনে দুজনে একসঙ্গে কথা বলতে পারব? বিকেলে দুই বুড়ো ছড়িহাতে...ঔফ্!

কী হল?

কিছু না।

কিছুক্ষণ নীরবতা। কোথাও কোন শব্দ নেই। আকাশে নক্ষত্র জ্বলজ্বল করছে। হেমনাথ আর প্রভাময়ী নক্ষত্র দেখছিলেন নীরবে।

প্রভা!

উঁ?

শোও গে। রাত হয়েছে।

আজ তোমার কাছেই গাটা জুড়িয়ে নিই বরং। সরো একটু!

প্রভা!

উঁ?

মানুষ এমন কেন?

কেমন?

আমার ঠাকুর শ্রীচৈতন্য যবন হরিদাসকেও কোল দিয়েছিলেন। নীচ-অস্পৃশ্য-মুসলমান তিনি গণ্য করেননি। সবাই ঈশ্বরের জীব। অথচ মানুষ…

তুমি কাঁদছ গা?

প্রভাময়ী টের পাচ্ছিল, এ কান্না পরম বৈষ্ণবের প্রেমাশ্রুপাত নয়—এ কান্না মানুষের জন্যে দুঃখের। এবং সেও অনিবার্যভাবে সংক্রামিত হল। ধরা গলায় শুধু বলল, চুপ করো। কেঁদে কী হবে!

সুনু বারান্দায় শুয়েছিল। মাথাটা ইচ্ছে করেই একটু ঝুঁকিয়ে রেখেছিল—যাতে আকাশ দেখতে পায়। কী বিশাল ওই নক্ষত্রময় আকাশ! কতদূর—কতদূর! তুমি যেতে-যেতে-যেতে…চলে যাবে, শুধু চলেই যাবে…এক জন্মে কুলোবে না, জন্মজন্মান্তর ধরে হাঁটবে এক নক্ষত্র থেকে আরেক নক্ষত্রের দেশে। ইচ্ছে হলে কোথাও ছায়াপথের কোন গাছের নীচে বসে একটুখানি জিরিয়ে নিতে পারো। কিন্তু কী আশ্চর্য সে যাত্রা! কী সুখপ্রদ সে অলৌকিক ভ্রমণ!

এবং সেই ভ্রমণের মধ্যে হঠাৎ-হঠাৎ তার গা শিউরে উঠছিল। কে যেন পিছনে দ্রুত আসছে—তাকে অনুসরণ করছে, কতদিন থেকে—কোন জন্মের আগে কোন জন্মের পরে—বলছে, থামো, আমি আসছি!

অনন্ত নক্ষত্রলোকে একবার পিছু ফিরতেই তুমি রুদ্ধশ্বাস। চমকে উঠেছ। কেন? তুমি কেন এলে?

এলুম। আমার ইচ্ছে।

বা রে! আমায় যে এখনও কতদূর যেতে হবে!

আমায় সাথে নাও।

পারবে যেতে?

পারব?

ক্লান্ত হয়ে পড়বে না?

যদি পড়ি, তুমি তো আছই।

না, না!

...বিড়বিড় করে উঠল সুনন্দ। হেমনাথের মত বারবার অস্ফুট-কণ্ঠে বলছিল সে—না, না। তা হয় না।

...তুমি আমায় চুমু খেয়েছ!

আমি নই, আমার ঠোঁট—মানে, আমার দেহ।

দেহ আর তুমি কি আলাদা?

তা তো বটেই!

তবে ওই দেহটাই আমায় দিয়ে যাও।

....

কী হলো, চুপ কেন?

দেহ নিয়ে তুমি কী করবে?

বাতি যখন পেলুন না, পিদীমটাই হাতে থাক।

কী হবে যা আলো দিতে পারে না তা নিয়ে?

দিতে পারত। কিন্তু দিল না। সেই যন্ত্রণাকে আমি বাঁচিয়ে রাখব ওই আধারের মধ্যে। এই যন্ত্রণাই যত সুখ, তা তো জানো না তুমি।

রুবির মধ্যে রহস্য আছে। বড্ড অল্পভাষী—কিন্তু যখন কথা বলে, তার উত্তাপ আর চাপ পলকে তোমায় আচ্ছন্ন না করে পারে না। সেই দিনটার কথা মনে পড়ে সুনন্দ? জানালার ধারে দাঁড়িয়ে স্কুলে যাবার আগে চুল আঁচড়াচ্ছিল—তোমাকে দেখেই হেসে উঠল, ওই হাসি তোমার মনের ভিতর একটা আলো হয়ে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াল, তারপর কোথায় মিলিয়ে গেল—কিন্তু তুমি

তারপর সেটা খুঁজে হন্যে হয়ে উঠলে—সারাটি দিন তুমি কেবল ভাবলে খাপছাড়া সব ভাবনা। তোমার মনে হল, পৃথিবীতে দুঃখ দারিদ্র্য থাক, আরো কী একটা চমৎকার ব্যাপার আছে, যা জীবনকে কেবলই মাথা উঁচু করে চলতে শেখায়। পরীক্ষার ফি দিতে পারছিলে না বলে সেদিন তোমার মনে হতাশা আর কষ্ট ছিল। অথচ তোমার সারাক্ষণ কি মনে হচ্ছিল না যে একটা সুন্দর কিছু ঘটবেই? এইসব দুঃখ-দারিদ্র্য কষ্ট গ্লানি কেটে যাবে এবং নির্মল পরিপূর্ণ রৌদ্রে সবুজ মাঠে আমরা সবাই হাতধরাধরি করে নেচে-গেয়ে ঘুরব?

রুবি তোমার দিকে তাকালে তোমার সব অন্ধকার মুহূর্তে আলো হয়ে গেছে। পৃথিবীর প্রতি, মানুষের প্রতি, জীবনের প্রতি এমন কি নিজের প্রতি কত অসম্ভব অদ্ভুত বিদ্বেষ বা তিক্ততা বা ঘৃণাভাব তুমি কত সময় পোষণ করেছ। অথচ ওই মেয়েটির একটি সতেজ নীরব চাহনি তোমায় পলকে পৃথিবীকে ভাবতে শিখিয়েছে একটি মহতী সম্ভাবনা—ওই কর্ষিত উর্বর সিক্ত শস্য ক্ষেত্রের মত। মানুষকে সে পরিয়েছে অলৌকিক জ্যোতির্ময় পোশাক পুরাণের দেবদূতের মত, জীবনকে করেছে বল্গাবিহীন মুক্ত তেজস্বী ঘোড়া—যা স্বাধীনতার হ্রেষাধ্বনিতে দিঙ্‌মণ্ডল প্রকম্পিত করে, এবং নিজেকে মনে হয়েছে এক মহান্ পুরুষ—যে ইচ্ছেমতো এ পৃথিবীটাকে বদলে বাসযোগ্য করে তুলতে পারে! একি মিথ্যে সুনন্দ?

হ্যাঁ, রুবি তোমার মত একটি শান্ত নমনীয় ভীতু ছেলেকে দিনে দিনে সাহসী করে তুলছিল। তাই নিষিদ্ধ মাংস খেতে তোমার সংস্কার হই হই করে ওঠেনি। প্রতিটি সংস্কারকে এক-একটি নতুনত্বের চাবুকে তুমি জর্জরিত করে ফেলেছিলে। তোমার হাতে মাংসের পেয়ালা কাঁপছিল—যেই রুবি বলল, খাও সুনুদা, তোমার কী যে হল—আর দ্বিধাটুকুও রইল না। বমি-বমি ভাবটুকু যদি বা আসছিল পরে, রুবির সঙ্গে কথা বলতে বলতে তুমি দেখলে—ইতিমধ্যে সবটাই হজম হয়ে গেছে। সেদিন তোমার কী আনন্দ সুনন্দ! যেন একটা

রাজ্য জয় করে ফেলছে। উচ্ছ্বাসে উদ্দীপ্ত তুমি কাজি নজরুলের 'বিদ্রোহী' আবৃত্তি করে শোনালে :

আমি মানি নাকো কোন আইন···

···টর্পেডো, আমি ভীম ভাসমান মাইন···

টর্পেডো! চমৎকার একটা শব্দ। সেই নিঃশব্দ বিস্ফোরণের পর তুমি ক্লান্ত হয়ে ভাবছিলে—কিছু হারালুম না তো? না সুনন্দ, হারাওনি—বরং লাভ করলে। দেখলে, মনের জোরটা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে। সেইটেই তোমার জীবনে প্রথম জয়। রুবিই তোমায় শেখাল, সংস্কারকে জয় করো—হেরে যেয়ো না। আর মাঝে মাঝে যখন রুবির কথা তুমি ভাবতে, তোমার মনে হত—পৃথিবীতে যেন বা তোমার জীবনটার একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে—গুরুতর দায়িত্ব রয়েছে তোমার কাঁধে। এবং সে দায়িত্ব হচ্ছে—পৃথিবীটা মানুষের বাসযোগ্য করে তোলা। যদিও কাজে কিছুই করোনি—কিন্তু এই বোধটা তোমার মধ্যে জন্মেছিল। এটুকুই তো যথেষ্ট, সুনন্দ।···

সুনন্দ মুখ ঘুরিয়ে উঠোনের পাঁচিলটার দিকে তাকাল। অন্ধকার পাঁচিলটা হিমালয় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। স্তব্ধ বিশাল একটা বিরোধ!

(সচরাচর এমন পাশাপাশি দুটো অনাত্মীয় বাড়ির মধ্যসীমায় সমান্তরাল দুটো পাঁচিল থাকবার কথা। এবং দুটোর মাঝখানে সরু কুকুর-বেড়াল চলা পথ। এ দুটো বাড়ির মধ্যে পাঁচিল মাত্র একটাই। এবং তার মালিক সুনন্দরা। বোঝা যায় এই দুটি বাড়ির মধ্যে বন্ধুতার সম্পর্ক প্রায় ঐতিহাসিক)।

হঠাৎ সুনন্দর মনে হল পাঁচিলটা ক্রমশঃ উঁচু হতে হতে নক্ষত্রময় আকাশে উঠে গেল। আকাশের নক্ষত্র আর বিশালতাটা পলকে পলকে দুভাগ হতে থাকল। হিন্দুর আকাশ আর মুসলমানের আকাশ। ওদিকেরটা আর দেখাই গেল না। সুনন্দ অবাক হল। খুব ভয়ের চোখে লক্ষ্য করতে থাকল পাঁচিলটাকে। অন্ধকার বিরাট এক জান্তব সত্তা—সহস্র চক্ষু দিয়ে তার দিকে কটমট করে তাকাচ্ছে যেন।

রাগে মাথার ভিতরটা জ্বলে উঠল তার। হাত নিসপিস করল। কিন্তু বড্ড নিরস্ত্র সে—অসহায় হাত দুটো কারো উদ্দেশ্যে বাড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে প্রার্থনার ভঙ্গীতে।

শেষ রাতে ঘুমের ভিতর তলিয়ে যেতে যেতে সুনন্দ জানতে পারছিল—এতক্ষণ ঘাম ও ভাবনার মধ্যে কেবলই সে একটা শাবল খুঁজে হয়রান হয়েছে। ওটা কোথাও আছে। কোথাও ছিল। পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু পেতে হবেই। পাঁচিলটা ভেঙে ফেলবেই।

ঝর্ণা প্রথমদিকে চুপি চুপি হেসেছে। বাঃ, বেশ জমে উঠেছে! জমিয়ে দিয়েছিস রুবি! এখন শেষরক্ষে হলে হয়। …তারপর কিন্তু গম্ভীর হয়ে পড়েছে সে।

ঝর্ণা একালের মেয়ে। কলেজ যাচ্ছে। সে দিন শুনছে ভিন্ন এক বিপুল মুক্তির—যে মুক্তি তার মা-ঠাকমার মতো সামান্য ঘর-কন্না-সংসারের ঘেরাটোপে নির্বোধ কোন আপাত-পরিপূর্ণতার নয়। অঙ্কে তার মাথা ভাল খোলে বলে সুনুদা প্রায়ই বলত, ও নির্ঘাৎ মেয়ে-এনজিনিয়ার হবে। নাকি বিজ্ঞানী হবি রে ঝুনু? কিশোরী ঝুনু গাল ফুলিয়ে জবাব দিত—নাঃ, আমি দাদুর মতো ডাক্তার হবো। সুনু ভ্যাংচাত—ডাক্তার! তাও আবার দাদুর মত? সে তো ডাক্তারী পাশ করা লাগে না রে! দাদু ছিল কোয়াক—হাতুড়ে নিছক! সরকারী হাসপাতালের কম্পাউণ্ডারি থেকে যা শিক্ষা। কথা কানে গেলে বাবা হাসতে হাসতে বলতেন, বাবার নিন্দে করছিস? শুধু পাশ থাকলেই হয় না রে! উনি ছিলেন সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী। বিদ্যে মুখস্থ করে ওই দিব্যদৃষ্টিটি মেলে না। ওটা ভগবানের দান।

ঝর্ণা এখন বিজ্ঞানের ছাত্রী। কিন্তু এ গরীব পরিবারের পক্ষে সেই স্পর্ধার স্বপ্ন দেখার উৎসে ওই খ্যাতিমান ধন্বন্তরী ভদ্রলোক। এ স্বপ্নে ছিল, ঝর্ণা যাবে কলকাতা। ভর্তি হবে ডাক্তারী কলেজে। হেমনাথের দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় মেডিকেল কলেজের বড় ডাক্তার। তিনি

প্রতিশ্রুতিও দিয়ে রেখেছিলেন আগাম। কিন্তু সেটা কি হয়ে উঠল আর? অনেক বাধা আছে বা ছিল। হেমনাথ-প্রভার বাপমায়ের মন বলে নয়, বাধাগুলো অন্যরকম। ওঁদের চরিত্রে একটা জিনিস আছে —সেটা রূঢ় আত্মমর্যাদাবোধ। একপয়সাও দেওয়া যাবে না এ ছার কপালে সংসার থেকে—অন্যের নিতান্ত অনুগ্রহের উপর শেষঅব্দি নির্ভর করা বাঞ্ছনীয় মনে হয়নি ওঁদের। সুনু দুটো টিউসনী করছে। ঝুনুও একটা পেয়ে গেছে। কলেজের মাইনেটা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ওই থেকে। অতএব এখানেই চলুক পড়াশুনা। সুনন্দ আর্টস, ঝর্ণা বিজ্ঞান। পড়া শেষ হোক। তখন একটা কিছু ঘটবে।

…ঝুনু—ঝর্ণা, নিজের ভবিষ্যত ভাবছিল। তার সে ভবিষ্যতের ছবি বড় অস্পষ্ট—কিন্তু আর পাঁচজনের থেকে আলাদা। মনে হয়, পৃথিবীর দুর্গম অজ্ঞাত স্থানগুলো থেকে তার ডাক আসছে—কোন পাহাড়ের চূড়া থেকে কোন সমুদ্রের অভিযাত্রী জাহাজ থেকে, দূর আকাশের নভোযান থেকে,…কোথায় সব গড়ে উঠছে দিকপ্রসারী নগর ও বন্দর, সুউচ্চ স্কাইক্র্যাপারের শীর্ষে উড়ছে পতাকা, জটিলতম বিশাল যন্ত্রলোক…চোখধাঁধানো নীল রশ্মি, মানুষের কান যা সইতে পারে না সেইসব নির্ঘোষ, মহাকায় চালকবিহীন ট্রেন—যার চুল্লী থেকে রক্তলাল আগুনের হলকা বিচ্ছুরিত…সেইসব ধাতব আস্ফালন!

কিন্তু সে একা। আর কোথাও কেউ নেই। কেন নেই? কেন থাকবে না?…খুব কষ্ট হল তার। অসহায় মনে হল নিজেকে। বিপন্ন বোধ করল হঠাৎ। এই দরজাবন্ধ ছোট্ট গুমোট ঘর—আলোবাতাস-হীন। ওই খড়ের চাল। দেয়ালে ফাটল। কী তুচ্ছ আর নির্বোধ দাঁতো হাসি চারপাশে ঘেরা!

…জানো ঝুনু? পৃথিবীতে মানুষের যা কিছু কীর্তি—যা-কিছু সম্পদ, আমরা প্রত্যেকে তার ন্যায্য শরীক। কারণ, এযাবৎ 'সভ্যতা' বলতে যা-কিছু ঘটেছে, তা একের দান নয়। বলা হয়, গাছ থেকে টুপ করে আপেল পড়তে দেখেই নিউটন 'মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব' আবিষ্কার করে ফেললেন। কী হাস্যকর অপব্যাখ্যা একটা কীর্তির! যেন ওই

আপেল কেন পড়ল ভাবলেই রামশ্যাম অমনি একটা তত্ত্ব আবিষ্কার করতে পারত! ভুলে যেও না, তার আগেও নিউটন ছিলেন বিজ্ঞানী। তাঁর ওই বিজ্ঞানী থাকাটাই প্রকৃতপক্ষে এ তত্ত্বের উৎস। এবং তিনি যে বিজ্ঞানী ছিলেন, তাঁর সেই বিজ্ঞান-জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পিছনে ছিল আরো অনেক বিজ্ঞানীর দান। জেমসওয়াট আবিষ্কার করলেন কেটলির ঢাকনা খুলতে পারে যে বাষ্প, তার একটা শক্তি আছে। কিন্তু তার আগে যে কেটলি তৈরী করেছিল, সেও এ আবিষ্কারের ন্যায্য অংশীদার। আকাশ থেকে হঠাৎ জ্ঞানের উল্কা ঝাঁপিয়ে পড়ে না কারো সামনে। সবাই পরস্পর নির্ভরশীল। একের আবিষ্কারের পিছনে আছে অনেকের আবিষ্কার। তা না হলে তো দ্বাদশ-শতাব্দীতেই আমরা পেয়ে যেতুম আইনস্টাইনকে। খ্রীস্টের সমকালেও পেতে পারতুম কোন এ্যাটমবোমা আবিষ্কারক অটোহানকে। খ্রীস্টপূর্ব চৌদ্দ শতকে জন্মাতেন নীলস বোর! সেখপাড়ার ফজলু হত কি না জগদীশ বোস—যে খরার সময় দুঃখ করে বলে, আহা, গাছগুলো বড় কষ্ট পাচ্ছে গো!

……না, ব্যক্তির কীর্তি আমি অস্বীকার করছিনে। কিন্তু সমষ্টির অভিজ্ঞতাই তার কীর্তির পিছনে শক্তিশালী উপাদান। তা না হলে কত আইনস্টাইন অষ্ট্রেলিয়ার মাঠে ভেড়া চরাতেন! যাক্ গে, এখন আসল কথাটা শোন। কাল বিকেলে টিউসনী থেকে ফেরার পথে তুমি বকুলতলা হয়ে আসছ। সাইকেলের দোকানের পাশেই আমাকে দেখবে। না দেখতে পেলে একটু অপেক্ষা করো বাসস্ট্যাণ্ডে।

কবীর বিজ্ঞানের ছাত্র। সত্যি, ওর চেহারায় আছে কতকটা বিজ্ঞানীর আদল—ল্যাবরেটারীর মধ্যে তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাকিয়ে আছে একটা অদ্ভুত গড়নের জারের দিকে। যেন পিছনে পায়ের শব্দ পেলেই বলবে, আঃ, চুপ করো।

আমি ঝুনু।

পরে এসো। বিরক্ত করো না।

করছি না। দেখছি।

যেন পিছন ঘুরে তখন একবার হাসল।...তোমায় পারা যায় না! এবং লম্বা আঙুলটা তুলে পরক্ষণে তার জারের ব্যাপারটা গম্ভীরমুখে বোঝাতে থাকল।...

হ্যাঁ, এসবই মনে হয় কবীরকে দেখে। সবসময় অন্যমনস্ক আর ব্যস্ত—সবসময় গুরুতর তত্ত্ব যেন ওর মাথায়। পৃথিবী আর বিজ্ঞান সম্পর্কে ও যেন হেস্তনেস্ত করার দায়িত্ব পেয়ে গেছে। অথচ হঠাৎ যখন হাসে, মুহূর্তে মনে হয় কোথাও অন্ধকার রাত্রির পৃথিবীতে সূর্যোদয় হল। ভারমুক্তি ঘটল কোথাও। প্রচণ্ড ঢাকের বাদ্যির পর নীরবতার শান্তি। শুধু শান্তি নয়—যা অশ্রুত ছিল, শ্রুত হল—লোকসঙ্গীতের মত সরল দামাল সুর!

হঠাৎ অমন করে মুক্তির মুক্তো ছড়াতে জানে বলেই কবীরকে এত ভালো লাগে। রেলস্টেশনের রেঁস্তোরায় দুপুরের দিকে ছাত্রছাত্রীদের আড্ডা চলে। কোণের দিকটা ওরা বেছে নেয়। কবীর হঠাৎ বলে, তুমি জাত মানো ঝুনু?

ঝুনু হেসে খুন।

কবীর গম্ভীর হয়ে ওঠে।...হেসো না! ব্যাপারটা ভাবলে পিত্তি জ্বলে যায় না তোমার?

মোটেও না।

কেন, শুনি?

আত্মরক্ষার জন্যে।

ঝুনুর সূক্ষ্ম রসিকতার তারিফ করে কবীর বলে, শেষঅব্দি পারবে তো?

কে জানে!...বলে মুখটা নামায় ঝুনু। কানঅব্দি লাল হয়ে ওঠে।

কবীর একটু ঝুঁকে ডাকে, ঝুনু!

ঝুনু পলকে মুখ তোলে—সপ্রতিভ মুখ। চুলের গোছা সরিয়ে চাপা গলায় বলে, অসভ্যতা করো না। ওরা সবাই দেখছে আমাদের।

কবীর একটু ভয় পায় হঠাৎ। এই হঠাৎ-ভয় পাওয়া তার অভ্যাস। মনে হয়, চারপাশে একটা ষড়যন্ত্র চলেছে। ফিসফিস করে কারা যেন বলছে, এই নেড়েটা বড্ড বেড়েছে! ওকে মার। সে আস্তে আস্তে বলে, আচ্ছা ঝুনু, তোমার বাবামার কানে ওঠেনি তো কিছু?

অমনি ঝুনু ফের হেসে পদ্য বানায়।...নাহি জানি অন্তঃপুরে কী বা ঘটিতেছে। ম্লেচ্ছ পশিয়াছে কি না গোপনে মার্জার যথা দুগ্ধে মুখ রাখে।...

কবীরও হাসে।...তুমি কবিতা লেখ না কেন?

তুমি তো লেখ!

লিখি। কিন্তু ধুৎ! সে নিছক খেয়াল। পরে আর মানেই বুঝতে পারিনে।

ঝুনু চঞ্চল হয় হঠাৎ। ওই রে! সুনুদা!

কবীর ঘাড় ঘুরিয়ে ছ্যাখে। সুনন্দ কাকে খুঁজছে। এদের দিকে চোখ পড়তেই সে মুহূর্তের জন্যে চমকে ওঠে যেন। তারপর হাসিমুখে মাথাটা দোলায়। এই দিয়ে যেন সে আশ্বস্ত করে এদের। এরা সেটা টের পায়।

সুনন্দ চলে যায়। তখন কবীর ফিসফিস করে বলে, সুনু বাড়ি গিয়ে বলে দেবে না তো?

ঝুনু চোখ তাকিয়ে বলে, দিক্ না। ওরটা বলে দেবার লোক নেই বুঝি? আমি তো তোমার সঙ্গে আড্ডা দিই মাত্র—আর ও যে...

এই সময় ঝুনু বড় স্পষ্ট হয়ে উঠে কবীরের কাছে। ওকে থামতে দেখে কবীর বলে, কী? কী করে সুনু?

ঝুনু মুখ নামিয়ে বলে, জানো? দাদা গোমাংস খায়?

এঁ্যা! চমকে ওঠে কবীর। বিপুল আশা ওকে গরম করে তোলে।...ছিঃ! এটা কিন্তু উচিৎ নয়। গোমাংস খেলে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কুষ্ঠ হয়।

সত্যি?

হঁ্যা।

তুমি খাও না?

কবীর অনায়াসে মিথ্যে বলে, নাঃ।

কিন্তু ঝুনুর মনে আছে, একদিন রুবিদের বাড়ি কবীর—হঁ্যা, সে ছিল ঈদের পরব, হয়তো গোমাংসই খাচ্ছিল।...ঝুনু বলে, তোমাদের ওই মাংস খাওয়া ঈদের নাম কী যেন?

কোরবানী। কেন?

এমনি বলছি।...ঝুনু চাপা হাসে।...যাক্ গে। খেলেই বা কী। যার ভাল লাগে, সে খাবে। আমার ভালো লাগে না, খাই নে। কিন্তু যাই বলো, ওতে ভীষণ প্রোটীন আছে নাকি। যে দেশে এত খাদ্যাভাব, সে দেশে সবাই খাক্ না গোমাংস। খাদ্যসমস্যা দূর হবে।

যাঃ!......

আচ্ছা, এই যে কবীরের কথা ভাবছি, কবীর কি আমার কথা ভাবছে? ওদের বাড়িটা ইটের দোতালা। ওরা দিব্যি আছে। বাইরে থেকে দেখে খুব কৌতূহল হয়েছে, কী সব আছে ওদের ঘরে, কেমনই বা ঘরকন্না, জীবনযাপন! আর দোতালার পূবকোণের ঘরটায় কবীর থাকে। ওই ঘরটায় একবার যেতে ইচ্ছে করে। সে সাহস তো নেই। রাজ্যের লোক চেঁচিয়ে উঠবে যেন। হৈ চৈ পড়ে যাবে চাদ্দিকে। বিশ্বশুদ্ধ সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে রাজী নই বাবা! আজব জিনিসটি হয়ে উঠবো কেন বল তো? তার চেয়ে, এই দিব্যি আছি।

ঝুনুদাই বা এখন কি ভাবছে? আমি জানি, ও রুবিকে খুব—খু-উব ভালবাসে। রুবি কতটা বাসে, টের পাইনি—যা গুমোট চাপা মেয়ে। হাজার খুঁচিয়েও ওর পেটের কথা বের করার সাধ্য নেই তোমার। মনে হচ্ছে, ও এবার কষ্ট পাবে। ঝুনুদাও কষ্ট পাবে। বাবা ওদের বাড়ি যেতে আমাদের নিষেধ করে দিয়েছেন আজ। চৌধুরী নাকি বাবাকে অপমান করেছে। লে বাবা! কার দোষে কে

শাস্তি পাচ্ছে মিছেমিছি! বেশ ছিলুম আমরা—দিব্যি চলছিল মেলামেশা, বনভোজন, ঘোরাফেরা। এখন নতুন করে আরেকটা জায়গা খুঁজে মরো না!

হঠাৎ ঝুনু চমকে উঠল। রুবিকে কি খুব মারধোর করা হয়েছে? আহা, বেচারা! আর আমি···আমি যদি কোনদিন ধরা পড়ি, আমাকেও কি······

কেন? গভীর দুঃখে ঝুনুর চোখ ফেটে জল। বালিশের কোণটা আঁকড়ে ধরল সে। ডুবন্ত মানুষ যেমন অসহায়তায় খড়কুটো আঁকড়ে ধরে।

নয়

কবীর দোতালার ঘরে সোজা হয়ে বসেছিল চেয়ারে—জানালার ধারে। এখান থেকে কুসুমগঞ্জের বাইরে দূরের মাঠ ও নদী দেখা যায়। এখন অন্ধকার। শুধু কুসুমগঞ্জের এক বিস্তীর্ণ অংশে আলোর সাজানোগোছানো মালাটা লক্ষ্য করা যায়। ইলেকট্রিফায়েড গ্রাম কুসুমগঞ্জ। গ্রামনগরী। সেকালে একালে একাকার এক বিচিত্র বস্তু—ভারতবর্ষের পাঁচসালা যোজনার গর্ভ থেকে সদ্যোজাত এক কিম্ভূতদর্শন প্রাণী।

টেবিল ল্যাম্পটা নিবিয়ে তারপর ছাদে উঠে গিয়েছিল সে। একটা বালিশ আর মাদুর নিয়েছিল। ফ্যানের হাওয়ায় গা জ্বালা করে।

আলিসায় ঝুঁকে দূর দিগন্তটা লক্ষ্য করছিল সে। রহস্যময় রাত্রির পৃথিবী ওখানে আকাশের সীমান্তে একটা চাপা আহ্বান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যেন। প্রস্তুত হও নভোশ্চর, যাত্রা তোমার জানা থেকে অজানায়। সেখানে হয়তো অপেক্ষা করে আছে কোন অজ্ঞাত প্রাণী! তোমার মতই তার ফুসফুস, নাড়িভুঁড়ি, সৌন্দর্য এবং সকল বীজের প্রতি তার আছে বিস্ময়।···ফিজিকসে 'ল অফ প্যারিটি' বলে

একটা সূত্র আছে। প্রকৃতি যেন সব্যসাচীর মত ডানহাতে বাঁহাতে দুহাতেই সৃষ্টিতে পটু। অজস্র জিনিসে এই প্যারিটি বা সাদৃশ্য তুমি লক্ষ্য করবে। অজস্র জিনিস যেন জোড়া জোড়া অবস্থান করছে। আণবিক বিন্যাসের ক্ষেত্রে একে বলা যায় একটি আরেকটির অবিকল মিরর্-ইমেজ বা দর্পণবিম্ব। একটা আরেকটির ঠিক উল্টো। তুলনা দিলে বলতে হয়—তোমার ডানহাত আর বাঁহাত। এবং মজার কথা এ্যাসিমেট্রিক বা অসমানুপাতিক গঠনের বস্তুর মধ্যেই এই পরস্পর উল্টো চেহারার ভাবটি প্রবল। কিন্তু সমস্যার সুরু এখানেই। বস্তুর অবিকল প্রতিরূপ যে প্রতি-বস্তু, তার অন্তর্নিহিত শক্তিটাও উল্টো, যেমন কিনা বিদ্যুতের নেগেটিভ, পজিটিভ। দুটো মিশলেই …উঃ, মুহূর্তে জ্বলে ছাই হয়ে যাবে সব! ধরো, তুমি নভোশ্চর, যাত্রা করেছ অজ্ঞাত মহাকাশের দিকে। পথে একটা অদ্ভুত দুর্ঘটনা ঘটল। দ্বিমাত্রিক অর্থাৎ দৈর্ঘ্যপ্রস্থবিশিষ্ট একটা পুতুল-আঁকা ছবিকে ত্রিমাত্রা অর্থাৎ উচ্চতার সাহায্যে উল্টে দিলে কী হবে? পুতুলের ডানহাতটা হয়ে যাবে বাঁহাত—তার মানে পুতুলটা পুরো উল্টো হয়ে যাবে। মহাকাশযানের দুর্ঘটনাটা এভাবেই ঘটল। বিশ্বলোকে বস্তুর এ তিনটি মাত্রা ছাড়া আরো একটি মাত্রার কথা আইনস্টাইন বলেছেন—সেটা হচ্ছে সময়। চতুর্মাত্রিক বিশ্বের মহাকাশে যদি ওই পুতুলটার মতো নভোযানটি উল্টে যায় চতুর্থ মাত্রা বা সময়ের মধ্য দিয়ে—তাহলে? তাহলে তোমার যানসমেত তুমি একেবারে উল্টো মানুষটি হয়ে পড়বে। তার মানে তোমার ডানহাত হবে বাঁহাত, ফুসফুস থাকবে উল্টোদিকে, পিলে ডাইনে—বাঁয়ে যকৃত। কিন্তু তুমি টেরই পাচ্ছ না। টের পাচ্ছ না যে 'এ্যালিস ইন ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ডের' ক্ষুদে নায়িকার মত তুমি আয়নার ভিতর পৌঁছে গেছ। তারপর নামলে কোন অজ্ঞাত গ্রহে। সামনে দেখলে হঠাৎ—আ! যেন বড্ড চেনা ওই মুখ, কবে কোথাও দেখেছিলুম, ভালবেসেছিলুম, সেই মেয়ে!

বললে, তুমি!

সে হাসল। এগিয়ে এল।

হাত বাড়ালে। সে বাড়াল।

তোমার ঠোঁটে তৃষ্ণা—তৃষ্ণার্ত তার ঠোঁটে। আরো কাছাকাছি হচ্ছে দুজনে। হঠাৎ নভোযানের নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র পৃথিবী থেকে বজ্রকণ্ঠে ঘোষিত হল, সাবধান! ওকে ছুঁয়ো না!

তুমি বিস্মিত। বললে, কেন?

তুমি উল্টো মানুষ! তুমি নেগেটিভ। ও পজিটিভ। ছুঁলেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটবে। অতএব লক্ষ্মীছেলেদের মতো সরে এসো।

হায়, তোমার দৃষ্টিজুড়ে শুধু শূন্যতা, তোমার মনজুড়ে অসহায় আর্তি এবং বিষাদ। শুধু বিষাদ।...

এ কি শুধুই বিজ্ঞানীদের হাইপোথিসিস? এমন ঘটে না—ঘটছে না এ পৃথিবীতেই? কুসুমগঞ্জে? কোন নিয়ন্ত্রণঘাঁটি থেকে রোবাটের কণ্ঠে গর্জন ভেসে আসছে। কবীর, তুমি উল্টো মানুষ—কারণ তুমি মুসলমান। কবীর, হেমনাথের মেয়ে ঝর্ণাকে তুমি ছুঁতে যেও না। বিস্ফোরণ হবে।...

কবীর সরে এল। মাদুরটা বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। আকাশের নক্ষত্র দেখতে ইচ্ছে হল। চশমাটা খুলে রাখল সে। নাঃ সব ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। যাক্‌গে। কানের দুপাশটা ব্যথা করছে।...

একটার পর একটা সিগ্রেট খেয়ে গলা জ্বালা করছিল এতক্ষণে। আকবর বেরিয়ে এল। খোলা ছাদে এসে দাঁড়াল। ভাল লাগল না। নেমে গেল। ফের ঘরে ঢুকল। রেডিওর চাবি টিপল। কাঁটা ঘোরাল উদ্দেশ্যবিহান। কোথায় দুর্বোধ্য কী আওয়াজ হচ্ছে। কী ভাষা? তারপর একটা সুর ঢেউ-এর মত ভেঙে ভেঙে গড়িয়ে এল। বিশ্রী! চাবি বন্ধ করল সে। ঢক ঢক করে জল খেল। টেবিলল্যাম্পের আলোয় টেবিলে স্পোর্টসের ট্রফিগুলো ঝকঝক করছে। দেয়ালে আবছায়ায় ঝুলছে শাণিত তলোয়ারের মতো ক্রিকেটব্যাট, ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট—এই সব। খেলোয়াড় হিসেবে

তার সুনাম আছে সারা জেলায়। এর পর রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় তার যোগ দেবার কথা আছে।

কিন্তু খেলাধুলো কি খুবই আবশ্যিক ছিল জীবনের পক্ষে? শুধু ওই কঠিন নিষ্প্রাণ কিছু ট্রফি! কিছু খসখসে মোটা কাগজের সার্টিফিকেট। ও দিয়ে কী হয়? কী কাজে লাগে? বড়জোর পেতে পারো কিছু বিস্মিত চোখের চাউনি। বোকার মতো হাততালি শুনে পুলকিত হতে পারো। খুব বেশি উঁচুতে উঠে গেলে হয়তো বা কোন সুন্দরী অভিনেত্রী তোমার পাণিটি প্রার্থনা করতে পারে আচমকা খেয়ালে—সে তুমি নিগ্রো হও কিংবা মুসলমান। কিন্তু এই চিরপরিচিত কুসুমগঞ্জ—যা তোমার একান্ত নিজস্ব একটি কুসুমগঞ্জ, যা তোমার স্বপ্ন-সাধ-সংস্কার আর অভিজ্ঞতা দিয়ে বানানো, সেখানে বৃথা, উদ্দেশ্যবিহীন লাফ দিয়েছ পোল ভল্ট হাইজাম্প লংজাম্প—অকারণ চালিয়েছ হাতের বর্শা, বিদ্ধ করেছ নিছক একটুকরো কাঠ। নদীর বহতা স্রোতে উজোন কেটে সবার আগে এগিয়ে ছুঁয়েছ রঙীন একটা দড়ি—ভিজে. ঠাণ্ডা, ফ্যাকাসে, নীরক্ত, ক্লান্ত, আর অবশ হাতটা কেউ উষ্ণ নরম ভালবাসার হাতে ছোঁবে ভেবেছিলে। এবং এইসব নীড়াভিমুখী যাত্রার শেষে সত্যি সত্যি ছিল না কোন নীড়। ছিল শুধু বিশাল এক গাছ—কোটরে যার সাপের বাসা।…

…ধুস্ শালা, কোন মানে হয় না! কোন মানে হয় না!

…জুলেখার কথা নতুন করে মনে পড়ছে। আশ্চর্য, আকবর কিন্তু সত্যি সত্যি যাকে বলে মেয়েদের ভালবাসা, তা পেয়েছিল! আজ এতদিনে ধরা পড়ছে। তখন চোখ জুড়ে মন ভরে ছিল শান্তা ভীতা নম্রা অল্পভাষিনী ওই রুবি। তাই জুলেখার সঠিক ছবিটি ফোটেনি। কাঞ্চনপুরের এক গরীব চাষীর মেয়ে জুলেখা। আধন্যাংটো নিরক্ষর বাপ তার এখনও মাঠে লাঙল চষে। মেয়েকে সে লেখাপড়া শিখতে দিয়েছিল। সেখানে প্রাইমারী পাশ করে সে এল কুসুমগঞ্জ হাইস্কুলে। কো-এডুকেশন

আছে এখানে। দশ বছরের মেয়ে বার্ষিক ক্রীড়াপ্রতিযোগিতায় দৌড়-বাজীতে তাক লাগিয়ে দিল! সেখপাড়ায় মামুর বাড়ি তাকে রেখেছিল শিক্ষাব্রতী চাষী বাপ। এলাকার বড়লোকেদের কাছে মেয়ের পড়ার সাহায্য মিলছিল। ক্লাশে ফার্ষ্ট, খেলাধুলায় ফার্ষ্ট, আশ্চর্য চাষীর মেয়ে জুলেখা! আকবরের সাথে বেশ মিশে গেল নিঃসঙ্কোচে। কিন্তু ওর গড়নে যেমন, তেমনি মানসিকতায় ছিল পুরুষালী ধাঁচ। সৌন্দর্য চুলোয় যাক্, কিশোরী বয়সের সাধারণ লালিত্যটুকু থেকেও খোদাতালা তাকে বঞ্চিত করেছিলেন যেন। দূর থেকে তাকে দেখলে মনে হত একটা গরিলা হেঁটে আসছে। ক্লাশ টেনে সবাইকে ডিঙিয়ে ও চলে গেল কলকাতার রাজ্যস্তর এক দৌড় প্রতিযোগিতায়। বাজি জিতল। খবরের কাগজে ছবি ছাপা হল। ক্রীড়াসাংবাদিক ওকে খ্যাতির তুঙ্গে তুলে দিলেন। পরের বছর আন্তঃভারত প্রতিযোগিতায় বোম্বেতে গেল জুলেখা। সেখানেও বাজি জিতে নিয়ে ফিরে এল। তারপর এশিয়ান গেমসের ডাক।...জীবনের এ এক বিচিত্র পরিহাস—ওই জুলেখা!

...হঠাৎ শোনা গেল, সে পড়াশুনো ছেড়ে দিচ্ছে। তার বাপ বেঁকে বসেছে। জুলেখার সাদী হবে। খবর শুনেই আকবর দৌড়ল কাঞ্চনপুর। হাতেম সেখ সবিনয়ে জানাল, আর না বাবা, যথেষ্ট হয়েছে। মেয়েকুলে জন্মো, স্বামীর ঘর তো করতেই হবে। সে আজ করুক, বা কাল। এর পর বয়স বাড়লে তখন ওই রাক্ষুসে মেয়েটাকে কে সাদী করবে বাপু?

আকবর বলেছিল, না না! তা হয় না। ওর মধ্যে কী আছে, তুমি জানো না। সারা ছুনিয়াজোড়া নাম ওর—

হাতেম বলেছিল, নামের মুখে আমি পেচ্ছাব করি। কই, নাম দিয়ে তো আমার ভাঙা কুঁড়ে ঘরখানা দালান হয়নি। এখনও ছুবেলা বুড়োহাড়ে রোদপানি মাথায় নিয়ে ক্ষেতে খাটছি। নাম দিয়ে কি আমার মেয়ে রাজরাণী হবে বাছা?

আকবর বিরক্ত হয়ে বলেছিল, হতে পারে।

তেঁতো হাসছিল হাতেম।···চৌধুরীর ব্যাটা তুমি—গঞ্জের চৌধুরী
আমীর লোক। তা বাবা, শুনে রাগ করো না—বলো দিকি,
এই তুমি—তোমাকেই বলছি, বিয়ে করবে আমার মেয়েকে?
বলো?

আকবর বিব্রতভাবে বলেছিল, আহা, বিয়ের কথা হচ্ছে না।
খেলাধুলায়···

বাধা দিয়ে গর্জে উঠেছিল হাতেম, খেলাধুলো! হুঁ—শুধু
খেলাধুলো। ওই সার। ইদিকে জেবনটা তোমার ব্রেথা কেটে
গেল, সে হুঁশ নেই। খেলাধুলো। কী—কী পেয়েছে আমার
মেয়ে? কোন রাজপুত্তুর ডেকে বলেছে, আয়, তোর গলায় মালা
দিই? বাপ্‌ আকবর, ও যে আসলে ঘুঁটেকুড়ুনীর মেয়ে—
ঘুঁটেকুড়ুনীই থেকে গেল আসল জায়গায়। গেল না? বলো।
এর নারীজন্মের কী কাজে লাগবে গো খেলাধুলো?

হয়তো খুবই সত্যি কথাটা বলেছিল সেদিন হাতেমবুড়ো।
একদিকে তুমি ফুলে ওঠ, ছড়িয়ে পড় যেন বিপুল জোয়ার—অন্যদিকে
তোমার জীবনের খরা হু হু করে জ্বলে, সেই গভীর পাঁচিলটা ভাঙে
না! আজ এতদিনে সত্যের ঝাঁপি থেকে ফণা তুলেছে জীবনের
নিগূঢ় পরম প্রশ্নটা।

কতক্ষণ পরে জুলেখা বেরল ঘর থেকে। ও কী চেহারা তার!
কী বেশ! ছেঁড়া ময়লা সাড়ি, রুক্ষু চুল, চোখে যেন আগুন
ঝরে পড়ছে। চমকে উঠেছিল আকবর। জুলেখা কাছে এসে
সোজা তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করেছিল, কেন এসেছ?

এ কী শুনছি? আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে জুলি—বিশ্বাস করো।

জুলেখার পুরু ঠোঁটে ব্যঙ্গের কুঞ্চন দেখা দিল। মোটা নাকের
ও দুটো কাঁপল। পুরু ভুরুতে ছড়িয়ে গেল শিহরণ।···কষ্ট?
কিসের কষ্ট?

না, না। তোমার বিয়ে করা হতেই পারে না। তুমি প্রতিবাদ
করো। দরকার হলে—

দরকার হলে ?

তোমার সব দায়িত্ব আমার।

জুলেখা যেন অনেক কষ্টে হাসল।···দায়িত্ব ? কিসের দায়িত্ব শুনি ?

তোমার থাকাখাওয়ার—খেলাধুলো চালানোর—আর···

আর ?

এইসব আর কী।···আকবর পাংশুমুখে হাসছিল।

আর কিছু না ?

এবার আকবরের একটু রাগ হয়েছিল। ক্ষুব্ধভাবে সে বলেছিল, আর কিছু মানে বুঝি বিয়ে ? তোমার বিয়ে না করলেই চলছে না ?

কিছুক্ষণ নতমুখে দাঁড়িয়ে থেকে জুলেখা বলেছিল, বিয়ের কথা আমি বলিনি। সে তুমি বুঝবে না।···

সত্যি বোঝেনি আকবর। বাজি জেতার ট্রফি কেন জুলেখা প্রথমে আকবরের হাতেই তুলে দিয়ে বলত, একটু ধরবে আকবরদা ? জুলেখা 'আকবরদা' বলত হিন্দু মেয়েদের মত। ওর চালচলনেও হিন্দু মেয়েদের ছাপ পড়ছিল প্রচুর।···একবার দৌড় প্রতিযোগিতায় শেষ সীমায় পৌঁছেই জুলেখা যেন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সামনে দাঁড়িয়ে-থাকা আকবরের বুকে। ওটা কারো টের পাবার কথা নয়—সবাই ভেবেছিল, ওটা দৌড়ের ঝোঁক মাত্র। আর আশ্চর্য, যেন ভয় পেয়ে তাকে পাল্টা ধাক্কা দিয়ে বসেছিল আকবর। জুলেখা পড়ে গিয়ে চাপা গলায় বলেছিল, ধরতে পারলে না আকবরদা ?

···চুল খাড়া হয়ে যাচ্ছে আকবরের। এতদিনে সব স্পষ্ট হচ্ছে। আঃ, ভালবাসা এসেছিল ! এসেছিল ! চিনতে পারেনি।

কুসুমগঞ্জের গঙ্গায় দশমাইল সাঁতার প্রতিযোগিতা। জিয়াগঞ্জ থেকে কুসুমগঞ্জ। নৌকোয় সঙ্গে চলেছে আকবর। শেষসীমায় পৌঁছনো মাত্র জুলেখা চীৎকার করে উঠেছিল হাত বাড়িয়ে—আকবরদা !

কিন্তু ওর ভিজে ক্লান্ত অবশ হাতটা অবশেষে ধরে ফেলল আকবর নয়—অন্য কেউ। জুলেখা টলতে টলতে হাঁটছিল। স্পোর্টসক্যাম্পে জেলাশাসক অপেক্ষা করছেন। আকবর সেই খবরটা ওকে দিতে দিতে পাশে হাঁটছিল। হঠাৎ জুলেখা বলেছিল, কিন্তু তুমি কী দিচ্ছ শুনি?

আকবর শুধু হেসেছিল। কোন জবাব দিতে পারেনি।

জুলেখা ফের বলেছিল, যদি হঠাৎ পথেই এলিয়ে পড়তুম, আকবরদা, তুমি ঝাঁপ দেবে সবার আগে এই ভেবে সারা পথ বড্ড জোর পাচ্ছিলুম মনে।

তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছিলে?

বারে! পাচ্ছিলুম না? সাঁতারের সময় চোখ দুটো ছিল তোমার দিকে—আর···

হট্টগোলে ভিড়ে বাকি কথাটা শোনা হয়নি সেদিন! বাকটা কী ছিল আজ যে জানতে ইচ্ছে করে!

একটা নাড়িছেঁড়া আর্তনাদ আকবরকে জোর ঝাঁকুনি দিল। সে চুল খামচে ধরে বসে রইল নতমুখে। কোথাও কোন শব্দ নেই, কেবল দেওয়ালঘড়িতে দোলকটা দুলছে ধারাবাহিক—এবং টিক্ টক্, টিক্ টক্, টিক্ টক্······

কাঞ্চনপুর থেকে চলে আসার সময়টা স্পষ্ট মনে পড়ছে। আকবর জেদের সাথে বলেছিল, তাহলে ওই মূর্খ নিরক্ষর বাপের মতেই তুমি চলবে ঠিক করলে?

আমার বাবাকে অপমান করার অধিকার তোমার নেই আকবরদা!

জুলেখা, তোমার শক্তি আছে সাহস আছে। তুমি যা পারো, কোন মুসলিম কেন—হিন্দুমেয়েও তা পারে না বা পারবে না। তুমি রুখে দাঁড়াও।

বিদ্রোহী হতে বলছ?······জুলেখা ফের বিদ্রূপে হেসে উঠেছিল!

নিশ্চয়।

কেন?

তোমার জীবনটা যে অন্যের মতো নয়—খুবই দামী।

তোমার তাই মনে হয় বুঝি?

আলবাৎ হয়।

এ দামী জীবন কী কাজে লাগবে শুনি?

বা রে! মূর্খের মত কথা বলো না। ছুনিয়াজুড়ে তোমার নাম হবে······

বাধা দিয়েছিল জুলেখা।···হ্যাঁ, হাজার লোকের সামনে বাহবা নেব। হাততালি কুড়োব। ওরা চমকে উঠবে। আকাশ ফাটিয়ে জয়ধ্বনি দেবে। পায়রা ওড়াবে জুলেখার নামে। হয়তো ঠোঁটেও আমার ফুটে উঠবে তৃপ্তির হাসি। ট্রফি নিয়ে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াব। টেলিভিশনের পর্দায় আমার ছাব উঠবে। আকবরদা, সার্কাস দেখছ তো? সার্কাসের রিঙে একটা জানোয়ার কেমন একচাকার সাইকেল চালায়, ডিগবাজি খায়, কত আজব খেল দেখিয়ে দর্শকদের তাক লাগিয়ে ছ্যায়!

আকবর চমকে উঠেছিল।···ছি, ছি, কী বলছ জুলি!

গর্জে উঠেছিল জুলেখা।···ঠিকই বলছি। তুমি এসো আকবরদা!

এবং তারপর মুখটা দ্রুত ফিরিয়ে নিয়ে, যেন কান্না চেপে, দৌড়ে সেই কুঁড়েঘরে গিয়ে ঢুকেছিল অভিমানিনী কৃষাণনন্দিনী জুলেখা। আকবর সাইকেলের সামনের চাকাটা ঘুরিয়ে—বেরোতে সময় লেগেছিল মনে পড়ছে, আস্তে আস্তে চলে এসেছিল। কাঁচা পথ—ছুপাশে নিশিন্দাঝোপ। সে ছিল বসন্তকাল। চমৎকার একটা বিকেল। কতক্ষণ সাইকেলটা ঠেলে পায়ে হেঁটে আসছিল সে।···

গতমাসে খবর পেল। জুলেখার সঙ্গে গাঁয়েরই এক প্রাইমারি শিক্ষকের বিয়ে হয়েছে। জুলেখা কেমন ঘরকন্না করছে, দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল। কাঞ্চনপুর তার মামাবাড়ি—চাষী সেখপরিবারেই তার মায়ের জন্ম। গিয়েছিল আকবর। আশ্চর্য. জুলেখা বাড়ির পিছনের দেয়ালে, চাষীবউর মতো, কোমরে আঁচল জড়িয়ে ঘুঁটে

দিচ্ছিল—তার সাইকেলের ঘণ্টি শুনে তাকে দেখামাত্র একহাত ঘোমটা টেনে বাড়ি ঢুকে গেল !…

আজ মধ্যরাতের পৃথিবীতে নিজেকে খুবই অযোগ্য আর নির্বোধ মনে হচ্ছে আকবরের। চোয়াল আঁটো হয়ে যাচ্ছে। হাতের মুঠো শক্ত হয়ে উঠছে। তীব্র ব্যর্থতাবোধ তাকে অস্থির করছে।

…রুবি তাহলে চিঠিটা যে তার হাতের লেখা, ধরতে পেরেছিল ! এও একটা মারাত্মক ভুল। ঝোঁকের বশে কাজটা ঠিক হয়নি। কিন্তু সুনন্দ—কায়েতবাড়ির ওই হাবাতে ছোকরা একটা মুসলিম মেয়েকে নষ্ট করছে সবার আড়ালে। এও তো সহ্য করা যায় না ! কথাটা আরও রটলে বড়জোর রুবির আর বিয়েহবে না। মুসলমানদের সাধ্য নেই সুনন্দর গায়ে হাত ওঠায়। আর এই কুসুমগঞ্জের মুসলমানরাও কেমন ছাড়া-ছাড়া হয়ে পড়েছে। ছেলেবেলায় যেটুকু ঐক্য সে দেখেছে, আজ আর তা নেই। সবাই কোন না কোন রাজনৈতিক দলের লোক। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বাধলে তারা প্রাণের দায়ে একজোট হবে বটে—কিন্তু ফের যা ছিল তাই। আর সে-সংঘর্ষও এখানকার ধাতে নেই। কাছেদূরে যদি কোথাও তা ঘটে—কুসুমগঞ্জের হিন্দু-মুসলমান তাতে মোটেও নাক গলায় না। পূর্ববঙ্গের অনেক লোক এখানে ঘরবাড়ি ব্যবসাবাণিজ্য করছে বটে—কিন্তু তারা ঠিক রিফিউজি নয়। তারা সব ঝানু ব্যবসায়ী। দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু জমিদার আর মুসলমান জোতদার মিলে ঠিক করা হয়েছিল—কোথাও কোন উদ্বাস্তুশিবির বসতে দেওয়া হবে না। হয়নিও। জমিদারী উঠতে উঠতে পোড়া খাস জমিগুলোর ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল। কাজেই সরকারের দখলে বাড়তি কোন জমিই রইল না। একটা পোড়ো জায়গা অবশ্য আছে—সে ওই কুঠিবাড়ির জঙ্গল। কিন্তু তার মালিক রায়বাবুরা। মাঝে মাঝে অনেকটা ফাঁকা করে চাষবাস হচ্ছে। বাগানের চারাগাছ মাথা তুলেছে। কবছর

পরে ওটা পুরো আবাদ হয়ে যাবে। বাকি কিছু অংশ রয়েছে গঙ্গার পাড়ে—সেখানে বনদপ্তর ভূমিক্ষয়রোধী বনের পত্তন করেছে। ওইটেই হচ্ছে পিকনিক স্পট্।

এবং ওখানেই সুনু আর রুবি—

আকবর অস্ফুট বলেই ফেলল, ঝাড় শালাকে। ঝেড়ে ফ্যাল্।··· এবং হঠাৎ যেন অন্ধকারে আলো দেখল সে। কলেজের ছাত্রইউনিয়নে দলাদলি আছে। সুনুটা কবীরের বিরুদ্ধ দলে না? আকবর খেলাধূলা নিয়ে থাকে। দলবাজী করে না। ওর দারুণ পপুলারিটি আছে ছাত্রদের মধ্যে। এবার কি ভিড়ে যাবে কবীরের দলে? টিট করবে শুওরটাকে? কবীর ওর বোনের সঙ্গে প্রেম করছে। ব্যাপারটা মারাত্মক হবে।···

ঢকঢক করে জল খেল সে। শান্তি পেল। শুল। কিন্তু ঘুম এল না। বুকে দুটো হাত রেখে সিলিং ফ্যানটার দিকে তাকাল সে। আরে! ঘুরছে না যে! তখন ছাদে ওঠার সময় বন্ধ করে গিয়েছিল। ফিরে এসে আর খোলেনি। কী কাণ্ড দেখছ? তাই এত গরম আর ঘাম!

ফ্যানটা খুলে দিয়ে উবুড় হল আকবর। একহাতের আঙুলে মাথার পিছনে চুলের ওপর আলতোভাবে তবলা বাজাতে থাকল। আজ পুরো ইনসমনিয়া। স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবে।

রুবি কিন্তু গভীর ঘুমে ঢলে পড়েছিল। অগাধ নিশ্চিন্ত ঘুম। নাকি যন্ত্রণাদায়ক ফোঁড়াটা গলে গেলে যে আরাম আসে, তাই?

শেষরাতে একবার সাহানা বেরিয়ে মেয়ের দরজায় ঘুরে গেল।

কাককোকিল ডেকে উঠছে বারবার। ভোর হতে দেরী নেই। কুসুমগঞ্জের একটা অস্থির রাত এতক্ষণে শেষ হল।

দশ

কয়েকটি মানুষ—এতদিন যারা একটা বৃহত্তর সমাজবৃত্তের মধ্যে ছোট ছোট কিছু অন্তরঙ্গতার বৃত্ত রচনা করে বাস করছিল, হঠাৎ দেখল কোত্থেকে ঝড় এসে সব ভাঙচুর হয়ে গেছে। তারা অসহায় বোধ করছিল এটা ঠিকই, কিন্তু তাদের কারো কারো মনে হচ্ছিল, এ একরকম ভালই হল। অভাবিত পরিণতি থেকে বাঁচা গেল। যে-পরিণতি হয়তো বা বড় ভয়ংকরই হতে পারত।

কিন্তু অভ্যাস!

বিকেলে হেমনাথ ছড়িটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন—রুবিদের বাড়ির পিছনে এক চিলতে সবজি ক্ষেতের বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে অভ্যাসে হঠাৎ ডেকে ফেলেছেন, কই হে খাঁ সাহেব!

পরক্ষণে বুকে পড়েছে আচমকা একটা ভারি হাতুড়ি। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলে গেছেন। যেন লজ্জায় কিংবা ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে কুমোর পাড়া ঘুরে মাঠ পেরিয়ে রেল লাইনে গিয়ে উঠেছেন। ক্যানেলের ব্রীজে গিয়ে না বসলে মনের শান্তি কোনদিন মেলেনি। কিন্তু তার আগেই ব্রীজের রেলিঙে কে বসে আছে ওই? সূর্যাস্ত দেখছে! ধূসর পাঞ্জাবী, টাকপড়া মাথা, লালচে মুখ ওই লোকটা।

উল্টোদিকে চলে গেছেন হেমনাথ। বিড়বিড় করে গাল দিয়েছেন। আর কোথাও মরবার জায়গা পেল না ব্যাটা! স্টেশনের প্লাটফরমে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আপ-ডাউন দুটো ট্রেনের আসা-যাওয়া দেখা, কিছু চেনামুখের সঙ্গে হালকা দুটো কথাবার্তা, কামরার ভিতর নানা চেহারার মানুষকে খুঁটিয়ে দেখে নেওয়া—তারপর ঠিক যখন সূর্যাস্ত হচ্ছে, তখনই ওভারব্রীজে গিয়ে দাঁড়ানো—হেমনাথের বিকেলের বেড়ানোটা এই সবেই সীমাবদ্ধ থেকেছে।

কিন্তু ওভারব্রীজে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সারা ছেলেবেলা—পুরো কৈশোর—যৌবনের প্রান্তঅব্দি মনে ভেসে উঠেছে। প্রতি বিকেলটা এমনি করে কেটেছিল তাঁর। সেই সব মোহময় দিন—যখন জীবনের অনেকখানিই স্পষ্ট বোঝা যায় নি এবং এইসব আপ-ডাউন ট্রেনের আসা-যাওয়ার মধ্যে অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন সাধের রঙীন সুতো বোনা হচ্ছিল। হয়তো বা ট্রেনের কামরার জানলায় একটি নারীর মুখই হয়ে উঠেছিল সুন্দর কোন সম্ভাবনার প্রতীক। সঙ্গী ছেলেটির গায়ে চিমটি কাটতেন হেমনাথ। সেও চিমটি কাটত। যে ট্রেন চলে যাবেই—তার জানালার ফ্রেমে আঁটা সুন্দরতম ছবিটি দিয়ে যেত হয়তো পৃথিবীর সকল যুবতীর জন্য অশেষ ভালবাসা। এই দুটি ছেলে সেদিন কিন্তু একটুও ভাবতে বসেনি যে সে ছবি হিন্দু, না মুসলমান! তারা নিজেরাও হিন্দু না মুসলমান মনে রাখতে পারত না।

হেমনাথ ওভারব্রীজে দাঁড়িয়ে ভাবেন সেই দিনগুলো। তখন কি খুবই বোকা ছিলুম? তবে ছাখো, পৃথিবীর অনেক জিনিস কিংবা ঘটনার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের হিন্দুত্ব-মুসলমানত্ব পুরোটাই অদৃশ্য ও বিস্মৃত থেকে যায়।

এবং তখন মধ্যে মধ্যে হঠাৎ টের পান, তিনি খুব একা হয়ে গেছেন কুসুমগঞ্জে। এখানের কোন মানুষের সঙ্গে তো তাঁর তেমন কোন অন্তরঙ্গতা কোনদিনই ছিল না। ওই মুসলমানটা ছাড়া কারো সঙ্গে তাঁর মনের মিল যেন হতে চাইত না।...হুম, এটা বদ অভ্যেস! গোড়া থেকে এটা হয়তো ভুল হয়েছিল। কারণ পৃথিবীটা তো ঠিক ততখানি সাদাসিদে নয়। তারু চক্রবর্তী, রত্নেশ আঢ্যি, কিংবা ভুবন দাসের সঙ্গে কিঞ্চিৎ ওঠাবসা আছে নানা সূত্রে—সারাজীবনই আছে। কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে তাদের কেউই হেমনাথ যেমনটি চান, তেমন নন। যেমন ধরা যাক্, বিকেলের বেড়াতে আসার ব্যাপারটা। তারুবাবু ব্যস্ত লোক—গম পেষাই ধান ভানা কলের প্রাঙ্গণে বিকেলটা কাটিয়ে দেবেন পুরো। ইজিচেয়ারে বসে থাকবেন।

খদ্দেরদের সাথে কথা বলবেন। ছেলে বারান্দায় বসে পয়সাকড়ির হিসেব রাখছে। তাতেও কড়া নজর। সে একদফা হিসেব করার পর উনি ডেকে বলবেন, কী রে? ক' কিলো কত গ্রাম হয়েছে? তিন পয়সা দরে হচ্ছে তোমার গে···ইয়ে···

না—হেমনাথের চোখে আকাশ পৃথিবী ও জীবনকে ছাখেন না তারু চক্রবর্তী। ঠাট্টা করলে জবাব দেবেন—ভায়া হে, যদ্দিন আছি তদ্দিন ওসব টুকটাক দেখাশোনা করে ছেলের আখেরটা গুছিয়ে দিয়ে যাই। যে কাল আসছে, কেউ তো তাকিয়েও দেখবে না বিপাকে পড়লে! তোমার তো এসব ঝক্কিও নেই—দায়ও নেই।···

হেমনাথ আহত হলেন মনে মনে। তা তো বটেই। হেমনাথের দারিদ্র্য আছে। কাজেই অবসর আছে। কাজেই বিকেল, সূর্যাস্ত, আকাশ, কত কী দেখবার সুযোগ আছে। নেই কাজ তো খই ভাজ। হুম, তারু প্রকারান্তরে আমাকে অপমানই করে। ও পাকা বিষয়ী লোক। আর বিষয়ী লোকদের প্রতি আমার বড্ড ঘেন্না হয়।

রত্নেশ আঢ্যি বাজারে তাঁর দোকানের বারান্দা ছেড়ে নড়বেন না।

ভুবন দাশের একটু বেরোন অভ্যাস আছে মাঠের দিকে। কিন্তু তার পাল্লায় পড়া এক সাংঘাতিক অভিজ্ঞতা। সারা মাঠ জুড়ে যেখানে যেখানে ওর জমি আছে, বছরের সব সময়—দরকার থাক আর নাই থাক, সেগুলো দেখে বেড়ানোর জন্যেই তাঁর বিকেলে বেরোনো। গত দুদিন তিনি ডেকে গেছেন।···চলো হে, মাঠে ঘুরতে যাবে নাকি?···হেম জানেন। তাই এড়িয়ে থেকেছেন। আর ভুবন দাসও টের পেয়েছেন, হেমের সঙ্গে খাঁয়ের আড়ি! কারণটা রটে গেছে ইতিমধ্যে। পল্লবিত হয়েছে মুখে মুখে। সে আরেক ঝামেলা। সবাই এসে মুখ টিপে হেসে যায়। কী শুনলাম মেজবাবু! বামন নাকি চাঁদে হাত বাড়িয়েছে? ঘোর কলি হে!

হেমনাথ একা হয়ে পড়েছেন। ওভারব্রীজে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখতে গিয়ে মেজাজ খিচড়ে যায়। ওই মুসলমানটাকে তাঁর অস্তিত্ব

থেকে মুছে ফেলা যায় না। সে স্মৃতির মধ্যে থেকে হেঁড়ে গলায় বারবার ডাকে, হেম, হেমনাথ!...

এদিকে আফজল খুব ব্যস্ত। নুরুর কাছে চিঠি চলে গেছে। সম্পত্তি বিনিময় করা হবে। যত শীগ্‌গির সব ব্যবস্থা হয়, ততো ভাল। ছেলেকে কিছু গোপন করেন নি আফজল। লিখেছেন, আমার মান-ইজ্জতে বাজ পড়েছে বাবা। কী সাপের বাচ্চা ঘরে এনে পুষেছিলুম, ছ্যাখো।...

সাহানা এ চিঠির বয়ান জানে না। জানলে ক্ষুব্ধ তো হতই। পোষ্টাপিসের প্রাঙ্গণে বসে হাঁটুর ওপর কাগজ রেখে সবার চোখের আড়ালে আফজল এ চিঠি লিখেছেন। খামে পুরে ডাক বাকসে ফেলে স্বস্তি পেয়েছেন। নুরু এ চিঠি পেয়ে অবাক হয়ে যাবে। তার অমন গুণের সৎমাই যে এ কুৎসিত কাণ্ডের পিছনে, সে জানতে পারবে। আফজল সব দোষ মা ও মেয়ের ঘাড়ে চাপিয়ে ফেলেছেন চিঠিতে। ইচ্ছে করেই এ মিথ্যেটা বলতে হয়েছে ছেলেকে। তা না হলে শিক্ষিত বুদ্ধিমান বয়োপ্রাপ্ত ছেলে যদি রেগে বাপকেই শাস্তি দিয়ে বসে! তার চেয়ে বরং, যাক ল্যাঠা স্ত্রীলোকের ওপর দিয়ে। পরে ছেলেকে বুঝিয়ে দিলেই চলবে যে আউরত (স্ত্রীলোক) মাত্রই নির্বোধ। বুঝতেই তো পারছিস নুরু, কথায় বলে—ওরা নাক না থাকলে গু খেত! আফজল স্বভাবত একবার জোর হা হা হেসে দিলেই তখন সাহানা ও রুবির সাত খুন মাফ। নতুন করে জীবনটা আরম্ভ করা যাবে।

আফজল কাজে না হলেও বাইরে বাইরে ভীষণ ব্যস্ত। এবং সে ব্যস্ততা মনেও ঢুকেছে। মরীয়া হয়ে গেছেন কতকটা। হাজারবার স্ত্রীকে বলছেন, ছ্যা, ছ্যা! কুসুমগঞ্জ আবার একটা জায়গা! এখানে মানুষ থাকে নাকি? শুধু কুত্তার পাল। সব স্বার্থপর আর বেইমান। বেইসলামী চালচলন। শরীয়তের বালাই নেই। নামাজ পড়ে না। রোজা রাখে না। আদবকায়দা জানে না। সব একেবারে হিঁদু হয়ে গেল গা! মতিয়ুলের ছেলে কবীর সেদিন আমাকে বলছে,

নুরুদার খবর কি চাচাজি ? এ্যা—নুরুভাই নয়, নুরুদা ! তুমি দেখে নিও সানু, এপারের মুসলমানরা ভবিষ্যতে সব হিন্দু হয়ে যাবে ! রবিউদ্দীনের ছেলের নাম রেখেছে শুনেছ ? গৌতম ! মেয়ের নাম পুষ্প !...

সে এক ঝড় বইছিল আফজলের মুখে। সাহানা এবার কিন্তু হাসছিল না। কৌতুক বা রাগ করছিল না স্বামীর ওপর। মেনে নিচ্ছিল। অনেক ঠকে মিয়াসাবের আক্কেল এসেছে।

তার মানে—

হ্যাঁ, আফজল সাতদিন পেরিয়ে গেল, দাড়ি কাটেন নি। মসজিদে গেছেন। বাড়িতেও নামাজ পড়ছেন। প্রতি ভোরবেলা সাহানাও এ বাড়িতে এই প্রথম কোরানপাঠ সুরু করেছে। চাপা ক্ষীণ সুরে প্রথম কয়েকটা দিন পড়েছে। দিনেদিনে আওয়াজটা আরও বেড়েছে।

প্রভাময়ী উচ্চকিত হয়ে পাঁচিলের ওপার থেকে শুনেছেন। হেমনাথ শুনেছেন। ঝর্ণা মুখ টিপে হেসেছে। সুনু গম্ভীর হয়ে থেকেছে।

তারপর প্রভাময়ীরও পূজোআচ্চা বা ধর্মের দিকে ঝোঁকটা বেড়ে গেল। হেমনাথও ব্রাহ্মমুহূর্তে কিছুক্ষণ গুরুপ্রদত্ত রহস্যময় মন্ত্রটি জপ করার পর গীতা খুলে বসতে লাগলেন। ঝুনু হাসল। সুনন্দ আরও গম্ভীর হয়ে গেল। মনে মনে আরও রেগে গেল।

আর রুবি ?

সে স্থির। গম্ভীর এবং নির্বিকারও। ছেলেবেলায় তাকে কিছুদিন আরবী উর্দু পড়ানোর চেষ্টা করেছিল সাহানা। আফজলের ঠাট্টাতেই সেটা সে সময় বেশীদূর গড়াতে পারেনি। কেবল পবিত্র কোরানের প্রথম দিকের কিছু অংশ তার মুখস্থ হয়েছিল মাত্র। তাকে নমাজও শিখিয়েছিলেন সাহানা। পরে গৃহকর্তার চালচলনের ফলাফলস্বরূপ ধর্মচর্চা এবং দৈনন্দিন পালনীয়টুকুও আর দেখা যায় নি এ সংসারে।

এখন সাহানা রুবিকে বলছেন, খোদার দিকে মন রাখ্ মা। বুকে বল বাঁধ। তাঁকে বল্ মনে জোর দিতে।

মনে কি দুর্বল হয়ে পড়েছিল রুবি? সে এক প্রত্যূষে সাহানা যখন কোরান পাঠ করছে, তাব নমাজ শেষ, হঠাৎ 'অজু' (বিধিমতে প্রক্ষালন) করে ঘরের মেঝেয় একটা আসন বিছিয়ে নমাজে দাঁড়িয়ে গেল। অনভ্যাসে তার ভুল হচ্ছিল। 'মোনাজাতে' (যুক্তকর প্রার্থনায়) বসে যখন পাঠ করতে হয়—

'হে খোদা, আমায় ইহকাল ও পরকালের শ্রেষ্ঠ জিনিসগুলো দাও'...

সে হু হু করে কেঁদে ফেলল হঠাৎ। এই শ্লোকটার মানে সে জানত। '...রব্বানা আতানা ফির্ দুনিয়া হাসানাতাও অ'ফিল্ আখেরাতে হাসানাতাও......'

দুনিয়ার 'হাসানাত্' অর্থাৎ ইহকালের শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর যা কিছু—আখেরাত বা পরকালের 'হাসানাত' যা কিছু—সবই চাইতে হয় ঈশ্বরের কাছে। প্রতিবার নমাজের শেষে এই প্রার্থনা করতে হয় মুসলমানকে।

রুবি কাঁদল। সাহানা কোরান পাঠের মধ্যেই টের পেলেন মেয়ে কাঁদছে। সাহানাও কাঁদল—পবিত্র—শ্লোকগুলো, যা ঈশ্বরের প্রেরিত বাণী—দূর আরবের হেরা পাহাড়ের নির্জন গুহায় পরম-মানুষটিকে যা দেবদূত জিব্রাইল শুনিয়েছিলেন,—তার উচ্চারণের সঙ্গে গভীর অসহায়তার বেদনা গেল জড়িয়ে, আর বহুকাল পরে লিপিবদ্ধ সেই ঐশী বাণীসমূহের ছত্রে ছত্রে ঝরে পড়ল এক সাধারণ বাঙালী মেয়ের কিছু অশ্রু।...

আমি জানি না, মুসলমানের ঈশ্বর সে মুহূর্তে কী ভাবছিলেন। তিনি বিভ্রান্ত বিমূঢ় মানুষের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন? নাকি সকৌতুকে হেসেছিলেন? কিংবা ব্যথিত হয়েছিলেন—যখন ঊষার আকাশে তখনও জ্বলজ্বল করছিল একটা নক্ষত্র, পাখিরা বাসা ছেড়ে বেরিয়ে

পড়ছিল মাঠের দিকে, সারা প্রকৃতিজগতে সঞ্চারিত হচ্ছিল আবার একটি নূতন চেতনা ?···'সঞ্চরমান দ্রুতগামী জ্যোতিষ্কপুঞ্জের শপথ, তোমাদের প্রতিপালক একজন আছেন···' সাহানা তাঁকে বিশ্বাস করে কাঁদল।

হয়তো বা রুবিও বিশ্বাস করছিল। প্রার্থনা সম্পূর্ণ হল আরও একটি বাক্যে—'অ কি না আজাবন্নার'···এবং নরকের আগুন থেকে তুমি পরিত্রাণ করো। সে-আগুনের বর্ণনাও রুবি শুনেছে। ছুনিয়ার আগুনের চেয়ে আশি হাজার গুণ তীব্র সেই আগুন। অনন্তকাল তুমি যন্ত্রণায় ছটফট করবে।

রুবি যখন উঠল, তার মনে একটা প্রশ্নের আর্তি। কেন ? সে কি খুব পাপ করে ফেলেছে ? কবীর বলে, পাগল, পাগল! ঈশ্বর যদি কেউ থাকেনও, তিনি অত নিষ্ঠুর হবেন কেন, বুঝিনে। মানুষের যা সাজে, সৃষ্টিকর্তার তা সাজে না। কবীর তো মানেই না ঈশ্বর বলে কিছু আছে। মানে সুনন্দ। তবে তার ঈশ্বর একটু অন্যরকম। একদিন সে বলেছিল—একটা বই তোমাকে দেব রুবি, পড়ে দেখবে। বৈজ্ঞানিক জেমস জীনসের মিস্টিরিয়াস ইউনিভার্স। না—ইংরাজীতে নয়, বাংলা অনুবাদ আছে। খুব ভালো লাগবে। জানতে পারবে, এ বিশ্বলোক জুড়ে যেন অঙ্কের নিয়মে কাজ করে চলেছে এক পারব্যাপ্ত বা সর্বগত মন! জীনস্ অবশ্য বলেছেন, সে-মন যেন পুরোটাই গণিতবিদের—গণিত ছাড়া আর তার কোন অস্তিত্বই নেই। এদিকে রবীন্দ্রনাথের কথা ভেবে ছাখো। বিশ্বজুড়ে প্রাণপ্রবাহের লীলা তিনি লক্ষ্য করেছেন। ব্যক্ত ও অব্যক্ত সে-লীলা। জড় ও অজড় সবখানে তার আভাস। হয়তো সেই ঈশ্বর। সেদিক থেকে উপনিষদ আমাকে বেশ টানে। রুবি, তুমি পড়বে ? খুব ভালো। বুঝতে প্রথম প্রথম অসুবিধে হবে। পরে দেখবে, সব ঠিক হয়ে যাচ্ছে। আর, কোরানও আমার পড়া উচিত। বাংলা অনুবাদ কোথায় পাওয়া যাবে জানো ? জানো না ? তুমি ভারি নাস্তিক হয়ে গেছো রুবি। অবিকল একজন মানুষের প্রতিরূপ

কোন ঈশ্বরকে স্বীকার না করো, এই সর্বব্যাপী প্রাণের কেন্দ্রটিকে অস্বীকার করবে কেন?……

সম্ভবতঃ ধর্মের কাজই এই। সময় হলে আত্মরক্ষার বিশাল আড়াল নিয়ে সে এগিয়ে আসে। আড়ালে ঢাকা পড়েছিল দুটি পরিবার। অস্তিত্বের মূলঅব্দি ঠেসে জোর করে, হয়তো বা হাস্যকর ভাবেও, আড়ালটা পুঁতে দেওয়া হচ্ছিল। মেহের আলি পাগলার মতো চেঁচিয়ে বলছিল, তফাৎ যাও, তফাৎ যাও। সব ঝুট হ্যায়!

ধার্মিক হয়ে পড়ছিল দুটি পরিবার। এ বাড়ি সন্ধ্যাবেলা কথকতা-ভাগবতপাঠ-কীর্তন, তো ওবাড়ি পরের সন্ধ্যা 'মিলাদ-শরীফ'। সংসারের ট্যাঁক থেকে কিছু পয়সাকড়ি খসছিলই।

কিন্তু অভ্যাস!

বিকেল হলেই আফজলের পা দুটো চঞ্চল হয়ে ওঠে। ভাবনা-বিভ্রান্তি-উদ্বেগ-প্রতীক্ষার জমাটবাঁধা ব্যস্ততা হঠাৎ মনে হয় বড় অকারণ। মুহূর্তে তা মিথ্যা করে তোলে কুসুমগঞ্জের পশ্চিম মাঠের আকাশ। সেই মাঠ। ব্রীজ। অভ্যাসে সেই উদাত্ত গম্ভীর শান্ত ছুটির আহ্বান ছুটে আসে। আফজল সাড়া দিতে চান, যা-ই-ই! পারেন না।

তারপর পারলেন।

বিকেলের সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ছিলেন। ব্রীজ ফাঁকা। রেলিঙে বসে থাকছিলেন। এত একা লাগে দুনিয়াটা! হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে লক্ষ্য করেছেন—রেল লাইনের ধারে ধারে ওই একটা লম্বা ঢ্যাঙা শরীর, হাতাগুটনো সাদা পাঞ্জাবী, ধুতি, হাতে ছড়ি—লোকটা আসছে! মুখ ঘুরিয়ে বসে থেকেছেন। এখানেই আসবে নাকি? ফের তাকালে অবাক হতে হয়। লোকটা ঘুরে যাচ্ছে উল্টো দিকে। যেন এমনি হেঁটে বেড়াচ্ছে।

আফজল গজগজ করেছেন, এ জায়গাটা তো কারো বাপোতি সম্পত্তি নয়। রেলের। যার খুসি আসবে—বসবে। ওই তো ওপারে বসবার জায়গা রয়েছে। বসুক না যার খুসি! আমি তো কিনে নিইনি!

মাথায় আফজল একটা ছোট্ট আরবি টুপি পরেন আজকাল। টুপিটা একবার অকারণ খুলে ফের ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে পরেন। গরম লাগে বড্ড। তার ওপর অনভ্যাস। ফের খোলেন, হাঁটুর ওপর রাখেন, ফের পরেন। তারপর সূর্যাস্ত হয়ে গেলে নিচে ক্যানালে নেমে যান। অজু করে উঠে আসেন। রেলিঙচত্বরে নমাজে দাঁড়ান। হাঁটু দুমড়ে বসে দোওয়া পাঠের পর যখন ডাইনে-বাঁয়ে মাথা ঘুরিয়ে দুকাঁধের পাপপুণ্যের হিসাবরক্ষক দুই দেবদূত বা ফেরেশতার উদ্দেশ্যে 'আসসালামু আলাইকুম…' ইত্যাদি বলতে হয়, তখনই পিছনটা সুযোগমত দেখে নেন আফজল। দূরে হেমনাথের মূর্তি। বিড়বিড় করে আরবি ভাষায় বলে ওঠেন আফজল 'হে খোদা, শয়তানের হাত থেকে পরিত্রাণ করো!'··

না—হেমনাথ স্বয়ং শয়তান নয়। শয়তান দুজনের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে আছে!···

অনেক রাতে ঘুম ভেঙে সাহানা ছাখে, আফজল উঠোনে পায়চারি করছেন। গুনগুন করে কী সুর ধরে আওড়াচ্ছেন। কতক্ষণ পরে বোঝা যায়, বাঙালী মুসলিম কবির কোন গজল গাইছেন আফজল।

ঘুম না এলে মানুষটি বরাবর এই করতেন। চাপা গুনগুনিয়ে গাইতেন। কিন্তু সে তো এ গান নয়। সে ছিল নেহাৎ টপ্পা কী পাঁচালি, বড়জোর ভাটিয়ালি কী রেকর্ড সঙ্গীত। সাহানার কানে এখনও ভাসে—

পরাণ আমার কাঁদে।
এমনি দিনে হারিয়েছিলাম আমার সোনার চাঁদে॥

তখন এ গান শুনে অভিমান হয়েছে সাহানার। বুঝি মিয়া, বুঝি! তাতো কাঁদবেই। কাঁদতে কি মানা করছি? কাঁদো না সারা

রাত্তির। আগের বউর জন্যে মিয়ার মনে এখনও তাহলে দুঃখুটুঃখু আছে? কপাল আমার, এত করেও মন পেলাম না গা লোকটার!

আজ সাহানা খুসি।

ওদিকে রুবি একদিন নমাজ পড়ে এবং কেঁদেকেটে—ব্যস! আগের মতোই রয়ে গেল। সাহানা ইদানীং মেয়েকে একটু মেনে চলতে চেষ্টা করছে। মন যুগিয়ে চলছে। পীড়াপীড়ি করে না কোন ব্যাপারে। হেসেখেলে কথা বলে। আদর করে যখন তখন। তার মনে তো গুরুতর ভয়—পাছে জেদের বশে অবুঝ গোঁয়ার মেয়ে ফের কী করে বসে! পেটের মেয়ে যখন চোখের আড়ালে লুকিয়ে অবাঞ্ছিতের সঙ্গে প্রেম করে এবং ধরা পড়ে যায়, তখন সব বুদ্ধিমতী মা তার মেয়েকে এই চোখেই ছাখে।

তাই সাহানা রুবিকে ধর্মের ব্যাপারে আর চাপ দেয় নি।

আর রুবি আরও গম্ভীর হয়েছে। নির্বিকার হয়েছে। চুপচাপ বসে থাকে। কখনও পুরনো বই বা মাসিক পত্রিকা পড়ে। শুয়ে থাকে চুপচাপ এবং ঘুমোয়। অগাধ ঘুম।

জানলার বাইরে কদাচিৎ দেখা যায় সুনন্দকে। গাইগরুটা নিয়ে এসে বেঁধে দিল। নিভা গোয়ালিনী দুধ দুইতে এসেছে। সুনন্দ বাছুর ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আশ্রমবালকের মতো। উড়ুক্কু বড়বড় রুক্ষু চুল, খাড়া নাক, কোটরগত কালো চোখজোড়া. মোটা ঘাড়—গ্রীক ভাস্কর্যের চেহারা। খালি গা, পরনে পাজামা, খালি পা। বুকে নীলচে কিছু লোম।

পরস্পর একবার চোখাচোখি—তারপর অন্যদিকে তাকায় ওরা। রুবি বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। একটা অসহ্য অস্বস্তি তাকে অস্থির করে কয়েক মুহূর্তের জন্যে।

ওখানে নিভা চ্যাঁচায়—এট্টু টেনে ধরো না বাবা। গুঁতো মেরে আমার কোমরটা ভেঙে দিলে দেখছ না?

সুনন্দ অন্যমনস্ক। রুবিরা কি তার জন্যেই দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে? নিজেকে খুবই অপরাধী মনে হয় তার। মুরুই বা কী

ভাববে! সুনন্দর জন্যে তার বোন নিরাপদ বোধ করছিল না। ছি, ছি, এটা তার মোটেও উচিত হয়নি।

আরেক দিকে কবীর আর ঝর্ণার মাঝখানেও এসে দাঁড়িয়েছে একটা হঠকারী নির্বোধ সীমান্তরেখা। নিজেদেরই তৈরী।

পরস্পর দেখা হচ্ছে—কিন্তু কথা বলা নয়, গাম্ভীর্য। রেল-স্টেশনের রেঁস্তোরায় ঝর্ণা যায়—বান্ধবীদের সাথে। কবীর যায় না।

এমনকি কবীর সুনন্দর সঙ্গে কথা বলে না। এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে। সুনন্দকে নিয়ে বন্ধুরা সবাই যখন রুবির কথা তুলে হাসাহাসি করে, কবীর রেগে ওঠে। তার মনে হয়, রুবি হিন্দু হলে হয়তো এতখানি হৈ-চৈ করত না কেউ। কিন্তু কেন হাসে ওরা? রুবি মুসলমান বলে? রুবির কি কোন যোগ্যতাই নেই সুনন্দকে জীবনসঙ্গী হিসেবে কামনা করার মতো? সবচেয়ে রাগ হয়, যখন কবীর গ্যাখে আকবরটাও এ নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করছে। এমন কি কবীরকেও খোঁচা দেয় আকবর—কী হে বৈজ্ঞানিক! বিষণ্ণ কেন? একা বসে কী করছ? চলো, পিকনিক করে আসি একদিন।

আকবর হো হো করে হাসে।···কবীর, আর মুরগী খাওয়াবিনে আমাদের? ঝিমুনি লেগে সব পটল তুলেছে দরমায়? এঁ্যা?

কবীর সরে যায়। হনহন করে গেট পেরিয়ে গিয়ে নদীর ধারে বাঁধের ওপর বটগাছটার নিচে দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ।

সেই সময় একদিন হঠাৎ ঝুনু এসে পড়ল—মানে, যেন সোজা বাঁধ ধরে কোথাও যাচ্ছে, এমনি গতি। কবীরের পাশ দিয়ে কয়েক পা এগিয়ে যেতেই কবীর ডাকল, ঝুনু!

ঝুনু যেন শুনতেই পেল না। হাঁটতে থাকল।

কবীর ফের ডাকল, ঝুনু, শোন।

ঝুনু দাঁড়াল। মুখ ফেরাল না। বলল, বলো—সময় কম।

কবীর একটু এগোল। এদিক ওদিক তাকিয়ে নিল দ্রুত। তারপর বলল, ইয়ে—ঝুনু, তুমি রাগ করোনি তো আমার ওপর?

ঝুনু গম্ভীর হয়ে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল।···কেন?

আর যে কথা বলো না দেখা হলে ?

(আরও গম্ভীর হয়ে) সে তো তুমিও বলো না।

বলি না—কিন্তু···তুমি ভয় পাওনি তো ঝুনু ?

পেয়েছ বুঝি ?

হয়তো।

তাহলে আমিও হয়তো। ব্যস, আর কিছু কথা আছে ?

কবীর মাথা দোলাল—না। মানে, ব্যাপারটা খারাপ লাগছে কিনা—তাই···

খারাপ তো আমারও লাগছে।

মুসকিল হচ্ছে—আমি মু— মুসলমান, পার্টিসনের পরে···

ঝর্ণা বলে উঠল, এই! তোমার বুকে শুঁয়াপোকা।

কবীর লাফিয়ে উঠে বুক ঝাড়তে থাকল। তার ব্যস্ততাটা অসামান্য দেখাচ্ছিল। এবং ঠিক তখনই হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠল আগের দিনের ঝুনু।·· ইস্! এত বোকা—হাবা—বুদ্ধু আর ভীতু হবে কি না সায়েনটিস্ট! কী খোকা, ছায়েনতিত্ হবে ? উঁ ভুডুবাটু খাও গিয়ে!

কবীর হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বলল, এস। ওখানটায় বসা যাক তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। অ—নে—ক। উঃ, কী দিন না যাচ্ছিল আমার—ভাবা যায় না!

ঝুনু হাসতে হাসতে বটগাছের পিছনে একটা মোটা শেকড়ের ওপর বসল।

কদিন পরে খিড়কির ঘাটে হঠাৎ আছাড় খেল সাহানা।

পাশাপাশি দুটো ঘাট। একই পাড়ে—মধ্যে বড়জোর মিটার-দশেক ব্যবধান। ঘন স্থল-কলমীর ঝোপ জলের ধার ঘেঁসে গজিয়েছে সমান্তরাল। তার মধ্যে এক চিলতে পথে আগে দু বাড়ির যাওয়া-আসা চলত। তবে একঘাটে বসলে অন্য ঘাটটা পুরো দেখা যেত না।

স্থলকলমীর ফিকে বেগুনি বড় বড় ফুল, চওড়া পাতা, ছড়ানো ডাঁটা —একটা আড়াল তৈরী করেছিল। ছোট্ট পুকুর—মালিক তার হেমনাথ। খরার সময় জল কমে যায় একেবারে। মাছের চাষ করা হত আগে। কিন্তু খরার সময় পর পর ক'বছর মাছ চুরি হয়ে যাওয়ায় হেমনাথ উত্যক্ত হয়ে জটিল বাগ্দীকে ভাগে দিয়েছিলেন। জটিল সেই থেকে খরচ-খরচা করে খরার সময় ওদিকের বড় দীঘি থেকে জল আনিয়ে ভরে রাখে পুকুরটা। রাতবিরেতে ঘুরে যায়। মাছ ধরলে হেমনাথ তাঁর ভাগটা পান এবং সেই ভাগ থেকে খাঁয়ের বাড়ি স্বভাবত কিছু যায়। ওদিকে বিবেচক জটিলও খাঁসাহেবকে ডেকে দিয়ে যায় একটা আধসেরী পোনা। তবে কি না মাছে খাঁয়ের খুব একটা আসক্তি নেই।

সকালে জটিল মাছ ধরেছিল। খিড়কির দরজায় উঁকি মেরে সসম্ভ্রমে বলেছিল, কই গো মা জননী, রইল।

সাহানা গম্ভীর মুখে হাসির মাকে বলেছিল, দ্যাখো তো। চিলে ছোঁ দেবে।

হাসির মা লাফাতে লাফাতে মাছটা এনেছিল। এটাই তার দস্তুর। প্রায় তিনপো'টাক একটা মিরগেল মাছ। সাহানা বলেছিল, ওটা তুমি নিয়ে যেও হাসির মা। আজ দুবেলাই তো গোস্ত হচ্ছে।

কথাটা সত্য মিথ্যে যাই হোক, হাসির মা খুসি। সবতাতে তলিয়ে কিছু ভাবে না সে। কিন্তু সাহানা সেই মুহূর্তে অভ্যাসবশে আরও একটা আশা করেছিল। মেজবাবু কী করেন দেখা যাক। বেলা গড়াল। মেজবাবুর বাড়ির মাছ এল না। সাহানা আরও গম্ভীর হল। ঝাল ঝাড়তে থাকল নানা ভাবে। কারণে-অকারণে হাসির মা গাল খেল। মাঝে মাঝে এটা-ওটা সশব্দে নাড়াচাড়ার মধ্যে ঝালটা খুব বেশি আত্মপ্রকাশ করছিল। রুবি সারাক্ষণ মুখ টিপে হাসল। কিন্তু সেও শেষঅব্দি দুঃখ পেল। যা কিছু হোক, যত সামান্য হোক, পেতে পেতে একদিন অভ্যাসের বশে তার ওপর যেন একটা গভীর দাবি তৈরী হয়ে যায়। তাতে ছেদ পড়লে রাগ দুঃখ

ঝাল তো স্বাভাবিকই। আঃ, ভাবতে কী লাগে! এক সময় ফ্রকপরা
রুবি হাফপ্যাণ্ট পরা সুনন্দর ছ্যাখাদেখি ওই পুকুরের পাঁকভরা
জলে মাছ ধরেছে খরার সময়। পাঁকে বিচিত্র হয়ে গেছে ওরা।
তুই খিড়কির তুটি ঘাটে দাঁড়িয়ে তুবাড়ির তুজন মা হেসেছে আর ধমক
দিয়েছে ছেলেমেয়েদের। সুনন্দর হাত ফসকে আসা একটা বড়
জাতের পুঁটিমাছ ধরতে পেরে রুবির একদিন কী আনন্দ!

মাছ এল না তুপুরঅব্দি। আফজল বাড়ি ফিরে জটিলের মাছ
দেওয়ার কথা শুনেছিলেন। লাফিয়ে উঠেছিলেন, কই, দেখি, দেখি!
কিন্তু সাহানার ধমক খেয়ে চুপ করে গিয়েছিলেন। তারপর
হেমনাথের মাছের কথা জানতে তাঁর তীব্র ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু
কোন অছিলাই খুঁজে পাচ্ছিলেন না। একবার ভাবছিলেন—ত
কি হয়? হেম এত ছোট নয়। মাছ নিশ্চয় পাঠিয়েছে। হয়তো
ওবেলা পাতে দেখতে পাবেন। আবার ভাবছিলেন, না—পাঠায়নি।
হেম খুব গোঁড়া মানুষ। বড্ড জেদী। মাছ নিজে বা তার বউ খায়
না আর। তবে ওর ছেলেমেয়েরা খায়। বাকি মাছ বেচে ছ্যায়
জটিলকেই। এবার হেম মাছ পাঠাবে কোন্ মুখে? তাছাড়া তার
চক্ষুলজ্জা বা লোকভীতিও আছে তো!

তবে কী, ব্যাপারটা বড্ড খারাপ ছ্যাখায়, এই যা। আফজল
মনের কৌতূহল মনেই শেষঅব্দি নষ্ট করতে বাধ্য হলেন। কারণ
সতর্ক চোখে রান্নাশাল থেকে আস্তাকুঁড়অব্দি ঠাহর করেও মাছের
আঁশটি দেখা গেল না। হেমের ওপর তাঁর তীব্র ঘৃণা হচ্ছিল। তিনি
দলিজ ঘরে একটু গড়াবার চেষ্টা করে বেরিয়ে পড়েছিলেন বাজারে
মকবুল দরজীর কাছে। তারপর তো ক্যানালের রেলব্রীজ আছেই।
ওটা তো কারো নিজের সম্পত্তি নয়—খোদ সরকারের।

এবং সেই তুপুরেই ঘাটে আছাড় খেল সাহানা বেগম।

কোন কারণ ছিল না ঘাটে যাবার। সেই কাণ্ডের দিন থেকে
নিজে বা মেয়েকে পা বাড়াতে ছ্যায়নি। হাসির মাকেও ছ্যায়নি।
বলেছে, ধোওয়া পাখলানো যা করার, ইঁদারার পানিতে করবে।

পারের পানির ট্যাকসো লাগে।…হাসির মা বুড়ো মানুষ। তার কষ্ট হচ্ছে ইঁদারার জল তুলতে। সে গজগজ করে। গতিক দেখে রুবি এসে জল তুলে ছায় কখনও।

কিন্তু আজ সাহানার মনে যেন মাছের আঁশটে গন্ধ। কী খেয়াল হয়েছিল—খিড়কির দরজা খুলে ঘাটে গিয়ে হাজির হল সে। জালের চিহ্ন দেখতে গেল পাড়ের মাটিতে? দামগুলো ভাংচুর হয়েছে কতখানি —বালিকার মতো তাই কি অবলোকন করতে? অবশ্য দুঃখের সময় এখানে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকেছে সে। কতসব চিহ্ন তখন জলের ধারে, ঘাটের ওপর, স্থলকলমীর বিস্রস্ত ঝোপঝাড়ে। সরু মোটা গুগলি আর পচাপাতা মেশানো চাপ চাপ পাঁক এখানে ওখানে। ঘাটের ওপরই জাল ঝেড়েছে জটিল। ভিজে আছে দরজাঅব্দি। এক পা বাড়িয়ে উঁকি মেরে ঘুরতে গিয়ে হঠাৎ চোখ পড়েছিল স্থলকলমীর ঝোপ চিরে পাঁচিলের গা-ঘেঁষা সরু চলাচল পথটির ওপর। চোখ জ্বলে উঠেছিল মুহূর্তেই। ওটা কী? কেন দিল ওটা? কে দিল?

পথের ওপর একটা শুকনো কাঁটাঝোপ পড়ে রয়েছে। তার মানে পথটা কাঁটা দিয়ে আটকানো হয়েছে।

বিশ্বাস হচ্ছিল না। রাগে দুঃখে ঘৃণায় অস্থির হচ্ছিল সাহানা। আর সেই অস্থিরতার মধ্যে ফের একটা পা ফেলতেই পিছল মাটিতে সে আছাড় খেল সশব্দে। ককিয়ে উঠল 'মা গো' বলে।

প্রভাময়ী ঘাট থেকে উঠে যাচ্ছিল। আওয়াজটা শুনেছিল সে। সরুপথের ও প্রান্তে দাঁড়িয়ে সে দেখল, মিয়াবউ আছাড় খেয়েছে। পা ছড়িয়ে বসে আছে বিকৃতমুখে। নিষ্পলক একটুখানি দেখে নিতে গিয়ে চোখে চোখ পড়ল পরস্পর। কিন্তু কেউ কাকেও এ জন্মে চেনে না। দুজনেই যেন অন্ধ মানুষ। প্রভাময়ী দ্রুত বাড়ি ঢুকে পড়ল।

এ বাড়ি রুবি তখন একা। সদ্য স্নান করে ঘরে দাঁড়িয়ে চুলে চিরুনী চালাচ্ছে। হাসির মা ভাত নিয়ে কখন চলে গেছে।

কতক্ষণ পরে সে বেরোল। ডাকল, মা!

কোন সাড়া পেল না। তখন সে পাশের ঘর—শেষে রান্নাঘরও দেখল। তারপর চোখ পড়ল খিড়কির দরজাটা খোলা। সে ভাবল তাহলে ঘাটের দিকে গেছে সাহানা। তার ওখানে পা বাড়ানো বারণ, সে এখন কি না অসূর্যম্পশ্যা! মনের রাগেই রুবি অসূর্যম্পশ্যা হয়ে থাকতে চায়। তার মা যদি মাথা ভেঙেও বলে একবার বাড়ির বাইরে যেতে—রুবি যেন পণ করে বসে আছে—এক পাও নড়বে না এ বাড়ি থেকে। আসলে এ একটা দারুণতম অভিমান। তা হোক, রুবি সে অভিমানের মধ্যে তো সুখও পাচ্ছে।

রুবি ফিরে এল নিজের ঘরে। জানালার ধারে বসল।

ওবাড়ির প্রভা কিছুক্ষণ আপনমনে খিলখিল করে হেসেছে। কাকেও আছাড় খেতে দেখলে মানুষের হাসি পাওয়া স্বাভাবিক। তার ওপর মিয়াবউ অমন মুটকি মেয়ে—থলথলে গা গতর। ঝুনু বলল, হাসছ কেন মা?

মিছেমিছি হাসছি। প্রভা জবাব দিল।

বারে! মিছেমিছি হাসে কেউ?

প্রভা রমণীসুলভ চপলতায় চাপা গলায় বলল, ও বাড়ির বিবি… বুঝলি? ঘাটের ধারে…যেই না…হাসিতে ভেঙে পড়ছিল প্রভা। …ধপাস্ করে আছাড়!…মা গো, কি কাণ্ড!

ঝুনু লাফিয়ে উঠল।…মাসিমা আছাড় খেয়েছে?

তুই যাচ্ছিস কোথা? এই ঝুনু!…চাপা গলায় ডাকছিল প্রভা।…যে আছাড় খেল—খেল, তোর তাতে কাজ কী? ঝুনু! ভাল হবে না বলছি!

ঝুনু একদৌড়ে বেরিয়ে দেখল, সাহানা তখনও বিকৃতমুখে পা ছড়িয়ে বসে আছে। একটু-একটু ককাচ্ছে। জোর লেগেছে বোঝা যায়। উঠতে পারছে না সম্ভবত।

ঝুনু মুসকিলে পড়ে গেল। এও একরকম বিদ্রোহ—নিয়ম-ভঙ্গের দুঃসাহস। কিন্তু ওই কাঁটাটা কে দিল? হয়তো বা সে কথা

বলে উঠত, দৌড়ে যেতও—অন্তত এটুকু সে পারতও—কিন্তু হঠাৎ কাঁটাঝোপটা চোখে পড়ামাত্র তার বুকের ভিতরটা খিল ধরে গেল যেন। একটা চকিত শিহরণ খেলে গেল তার শরীরে। বিস্ময়ে দুঃখে সে হতবাক হয়ে পড়ল!

এবং সেই সময় আচমকা প্রভা এসে তার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল। ঝুনু হয়ত যেত না—কিন্তু তখন সে হতচকিত—কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

বাড়ির ভিতর গিয়ে ঝুনু আর নিজেকে চুপচাপ রাখতে পারল না। বলে উঠল, এইজন্যে তুমি হাসছ মা? ছিঃ! বেচারা পড়ে গেছে—হয়তো কোমর ভেঙে গেছে—আর তুমি···ধিক্ তোমাকে!

প্রভা রেগে লাল হয়ে গেল।···থাম্ তো! কলেজেপড়া বিদ্যে ফলাতে হবে না।

ঝুনু সদর দরজা দিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

প্রভা ডাকছিল, ঝুনু, ঝুনু! এই হতচ্ছাড়ী মেয়ে! ভালো হবে না বলছি!

হেমনাথ ঝিমোচ্ছিলেন প্রাঙ্গণের নিমগাছটার তলায়। খালি গা। একটা মোড়ায় বসে অকারণে গামছা দোলাচ্ছিলেন—যেন বাতাস লাগবে হাতপাখার মতো। যা গরম পড়তে শুরু করেছে এরি মধ্যে! ঝুনুকে দেখে বললেন, তোদের ছুটি কবে পড়ছে রে ঝুনু? এবং তক্ষুনি মনে পড়ে গেল, গ্রীষ্মের ছুটি তো আজ থেকেই। ঝুনু বলছিল না?

ঝুনু কোন জবাব দিল না। দৌড়ে চলে গেল ওদিকে। হেমনাথ একটু বিস্মিত হলেন। সেই সময় প্রভা এসে গেল। হেমনাথ বললেন, ঝুনু অমন করে কোথায় গেল গা?

প্রভার মুখটা গুম।······

ওদিকে রুবি এতদিন পরে ঝুনুকে দেখে চমকে উঠেছে। ঝুনু জানালার সামনে আসা মাত্র রুবির ঠোঁটটা কুঁচকে গেছে—সব্যঙ্গ হাসিতে।···কী রে? জাত যাবে যে! আবার কেন? মাথায় গঙ্গাজল ঢালা যাবে না? মাথাটা ন্যাড়া করে ঘোল ঢালতে হবে না?

ঝুনু ধমকে উঠল, মেলা ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করিসনে। মাসিমা…

মাসিমা আবার কে তোর? ভাগ্! গোবর খাইয়ে দেবে।

ঝুনু রেগে ক্ষেপে গিয়ে বলল, মর ছাই! কথাটা তো শুনবি—খিড়কির ওদিকে মাসিমা পড়ে গেছেন—শীগগির যা।

এবার রুবি লাফিয়ে উঠল।…মা পড়ে গেছে?

হ্যাঁ—উঠতে পারছেন না। কোমরে লেগেছে।…ঝুনু হাঁফাতে হাঁফাতে বলল।

রুবি দাঁতে ঠোঁট কামড়ে দাঁড়িয়ে রইল।…তা আমার মা পড়েছে, বেশ করেছে। তোর কী এত? এত হাঁফাচ্ছিস কেন তুই?

ঝুনু আরও রাগতে গিয়ে হেসে ফেলল।…কী রে তুই! এখনও বাচ্চা মেয়ের মতো ঝগড়া করতে পারছিস! যা না শীগগির! বেচারা ককাচ্ছে ওদিকে।

রুবি অনেক কষ্টে হাসি চাপল।…আমার মা পড়েছে—আমার মায়ের কোমর ভাঙুক। সে কারো দেখতে হবে না। তুই নিজের চরকায় তেল দে গে। ভাগ্!

যা বাবা! বিপদের খবর নিয়ে এলুম—আর চোখরাঙানী!

তুই আসিসনে কক্ষনো। আমারও জাত আছে না? প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না?

করছিস তো বাবা।

বেশ করছি!

আরে, শীগগির যা!

যাব না। মা মরুক! যেমন সাধ করে গেছে ওদিকে—যেন বাবার সম্পত্তি আছে! না দেখলে চলছিল না।

ঝুনু হঠাৎ একটু ঝুঁকে এল।…এই রুবি, সুনুদা আজ তোর কথা জিগ্যেস করছিল। কিছু বলবি ওকে? চোখের দিব্যি, সুনুদা ঘুমোয় না সারারাত্তির।

রুবি চোখ পাকিয়ে বলল, কুটনিগিরি করতে হবে না তোকে! পালা!

ঝুনু হাসল।···শুদ্ধ ভাষায় বল্। অপমান করছিস কেন? বৃন্দে দূতী বল। আরে! যা শীগগির!

রুবি ধীরে-সুস্থে পা বাড়াল।

ঝুনু তখনও জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ ডাকল, রুবি—একটা কথা শুনছি। তোরা কি সত্যি চলে যাচ্ছিস পাকিস্তান?

রুবি 'যাবোই তো···যাব না কেন' বলে চলে গেল। আস্তে আস্তে হেঁটে উঠোন পেরোল। তারপর খিড়কির দরজা পেরোতেই দেখল, সাহানা ওঠবার চেষ্টা করছে।

রুবিকে দেখে সে এতক্ষণে হিঁপিয়ে কেঁদে উঠল।···তোরা আছিস না মরেছিস রে বাছা! উহুহু, আমি এখানে মরে পড়ে থাকলেও তোদের হুঁস হত না! লাসটা শ্যালশকুনের পেটে যেত মা গো!

রুবি মাকে টেনে তুলতে তুলতে বলল, থাক্। আর আকাশ মাথায় করো না। লোকে হাসবে। মুসলমানের মেয়ে হয়ে এত বাড় কেন?

সাহানা অনেক কষ্টে মেয়েকে ভর করে পা বাড়াল। বলল, হাসবে কী মা, হাসছে! কান করে শুনলুম, ওবাড়ির দুষমন হিহি করে হাসছে। আঃ, আহা হা—কোমরের হাড় আর আস্ত নেই মা গো! পাপের জায়গায় না আসব, না এমন হবে। শয়তান ওঁৎ পেতে ছিল গা!

গুনগুন করে কাঁদতে কাঁদতে মেয়েকে ধরে সাহানা বাড়ি ঢুকছিল।···

ওবাড়ির নিমতলায় সব শুনে হেমনাথ একটু হেসে বললেন, সান্নু বউ আছাড় খেয়েছে? আরে ও তো বরাবরই আছাড় খাওয়া মেয়ে। সেবার ওদের পরবের সময় হাত ভেঙেছিল না? সান্নুবউ প্রথম যেবার ও বাড়ি এল···

প্রভা বলল, আ মর! সান্নুবউ আবার কে?

চমকে উঠে হেমনাথ দেখলেন, এতক্ষণ পুরনো হেমনাথ তাঁর গলার কথা বলছিল। সুতরাং গম্ভীর হয়ে তিনি বললেন, মরুক গে।

তুমি ঘাটের দিকে সাবধানে পা ফেলো। জটিল ঘাটের ওপর জাল ঝেড়ে পিছল করে দিয়েছিল। তা হ্যাঁ গা, ইয়ে—মাছ কিছু তো রেখেছিলে।

প্রভা টের পেয়ে বলল, কে দিতে যাচ্ছে বলো? যেচে পড়ে দিতে গেলে যদি মুখের ওপর না বলে ছায়? সাধ করে বেজাতের হাতে অপমান হতে পারব না। তাছাড়া লোকে কি বলবে? ঘরে মেয়ে আছে—একদিন তাকে তো শ্বশুরঘর করতে হবে—না কী? এতেই যা হয়েছে—

হেমনাথ বললেন, তা তো ঠিকই।

প্রভা নিষ্ঠুর মুখে বলল, কবে দেশ ছেড়ে পালাবে সেই দিন গুণছি। আরে! ঝুনু—ঝুনু পোড়ারমুখী আর আমাদের মানসম্মান রাখবে না। দেখছ কাণ্ড? খবরটা দিতে গেলি, দিয়েই চলে আসবি। তা নয়—···প্রভা পা বাড়াল।

হেমনাথ বললেন, হ্যাঁ, ছাখো তো এতক্ষণ কী করছে? দূর থেকে ডেকে নেবে। কার চোখে পড়বে, বলবে—দেখছ? ফের দিব্যি শুরু হয়েছে।

প্রভা বলল, চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে আনব না? কলেজে পড়ছে বলে মাথা কিনে নিয়েছে। ওসব আদিখ্যেতা যেখানে সাজবে, দেখাক গিয়ে।

তার আগেই ঝুনু এসে গেল অবশ্য। হাসতে হাসতে এল। কোন পাপ করিনি বাবা। ছুঁইনি, মুসলমান-মাটিতে পা দিইনি, শুধু খবরটা জানিয়ে দিয়োছ—ব্যস! এবং সে অবিকল আফজলের ভঙ্গীতে বলে উঠল,···বলো—তার জন্যে কী করতে হবে আমাকে? কহাত নাক ঘষবো—কতখানি পাছা···জিভ কেটে সে থামলো। পাছা শব্দটা অশ্লীল না?

বাপমাকে হাসাবার পক্ষে এই যথেষ্ট ছিল।

এগারো

সুনন্দ সাইকেল সারিয়ে ফিরছিল। বারোয়ারিতলায় দেখা হয়ে গেল আকবরের সঙ্গে। আকবরও সাইকেলে আসছিল। সুনন্দকে দেখে হাসিমুখে সে সাইকেলের সামনের চাকাটা ঘুরিয়ে পথ আটকাল। সুনন্দ মাটিতে পা ছুঁইয়ে বলল, কোথায় চললি রে মহামতি আকবর?

আকবর হেসে উঠল।...তুই বেশ আছিস মাইরি! চেহারা দিনেদিনে বেশ খোলতাই হচ্ছে! কুসুমগঞ্জের মেয়েগুলো শুনলুম, তোর নাম জপছে তুবেলা! হিরো হয়ে গেছিস রে!

সুনন্দ গা করল না।...চলি ভাই। কাজ আছে।

আকবর নামল সাইকেল থেকে।...কাজ তো আমারও আছে রে বাবা! চল, ওখানটায় গিয়ে বসি একটু। আয় না! আমার ওপর রাগ করছিস কেন? আমি কি তোর শত্তুর নাকি?

সুনন্দ একটু গম্ভীর হল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে সাইকেল থেকে নামল। হাঁটতে থাকল ওর পাশাপাশি। সুনন্দের চরিত্রে এই নমনীয়তাটুকু আছে—সে কাকেও এড়াতে পারে না। বটতলায় বাঁধানো চত্বরের একপাশে একজন বসে জাল বুনছে। আর কেউ নেই। অন্যপাশে বসল ওরা। আকবর সিগারেট বের করল।... নে, খা।

সুনন্দ সিগ্রেটে অভ্যস্ত নয়। পেলে খায়। সিগ্রেটটা নিল সে। ধরাল। চুপচাপ টানতে থাকল। ভাল লাগছিল না। আকবরকে সে মনে মনে ঘৃণা করে।

আকবর চাপা নিঃশব্দ হেসে ভ্রূকুটি করে ওকে দেখছিল। এবার বলল, একটা কথা তোকে বলা দরকার ভেবেছিলুম, সুনু। জানিনে, কী ভাবে নিবি। তবু বলা উচিত।

সুনন্দ ধুঁয়ো সামলাতে ভুরু কুঁচকে বলল, উঁ ?

আমি জানি, তুই আমাকে খুব—খু-উ-ব খারাপ চোখে দেখিস।

যাঃ!

যাঃ নয়, লুকোসনে। আমি জানি, রুবি তোকে কিছু বলে থাকবে।

সুনন্দ চমকে উঠল। তাকাল ওর দিকে।

তবে জেনে রাখিস, যদি কিছু করে থাকি তো, সেটা রুবির মায়ের সাহসে। তুই তো জানিস, আমার সাথে রুবির বিয়ের কথা ছিল।

সুনন্দ অস্থির হয়ে বলল, ও কথা ছেড়ে দে আকবর। অন্য কথা থাকলে বল।

আকবর মাথা দুলিয়ে বলল, না সুনু। তোর ব্যাপারটা ভাবা দরকার। আজ একটা মুসলিম ফ্যামিলিকে ভারত ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে···

সুনন্দ তীব্রস্বরে বলে উঠল, আকবর! তুই এভাবে দেখছিস কেন ব্যাপারটা ? ছিঃ!

আকবর একটু দমে গেল।···কিন্তু তাই তো দাঁড়ায় শেষঅব্দি। আর সব মুসলিমরা কীভাবে নেবে এটা ? তুই-ই বল।

মোটেও না। ওঁরা চলে যাচ্ছেন, সম্পূর্ণ আলাদা কারণে।···সুনন্দ দৃঢ়ভাবে বলল।···এখানে কী খেয়ে থাকবেন ? জমিজমা প্রায় শেষ—তার ওপর মেয়ের বিয়ে দিতে হবে—অত টাকা কোথায় ? ওখানে নুরুল আছে—ভাল চাকরী করে।

আকবর হঠাৎ ঝুঁকে এল। ওর একটা হাত ধরল।···সুনু, একটা কথা বলবো ?

বল্ না, কী বলবি।

তুই তো জাত মানিস নে। ধর্ম মানিস নে। গোমাংস খাস।

সে আজকাল অনেকে খায়। তাতে কী হয়েছে ?

তুই রুবিকে বিয়ে করবি ?

সুনন্দ ফ্যালফ্যাল করে তাকাল ওর দিকে।

বল্‌, ওকে বিয়ে করবি নাকি? আমি—আকবর বলছি, খালেক চৌধুরীর ছেলে আকবর।...নিজের বুকে আঙুল ঠুকে আকবর বলল।...এ কুসুমগঞ্জে আমি দিনকে রাত করার হিম্মত রাখি সুনন্দ। আমি বলছি। হতে পারে এটা হিন্দুপ্রধান রাষ্ট্র, হতে পারি আমি একজন সংখ্যালঘু—কিন্তু আকবর বাঘের বাচ্চা বাঘ। তুই বল্‌, ওকে বিয়ে করবি নাকি?

সুনন্দ এবার হেসে ফেলল।...কী পাগলের মতো যা তা বলছিস!

আকবরের ঠোঁটে কুঞ্চন দেখা দিল। সে বলল, সুনু, যদি সে সাহস না ছিল তোর, এখনও যদি সাহস না থাকে, কেন তুই ওকে নষ্ট করতে গেলি?

সুনন্দ ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, আকবর! আমি ওকে কিচ্ছু নষ্ট করি নি।

আলবাৎ করেছিস।

না।

আমি দেখেছি।

কী দেখেছিস?

আকবরের মুখটা লাল। সে অন্যদিকে মুখ ফেরাল। কিছু বলল না।

সুনন্দ একটু ভয় পেল। সে আপোসের স্বরে বলল, সব তোর মনের ধাঁধা রে! আমি এসব নিয়ে একটুও ভাবিনে—অথচ তুই ভাবছিস। তাছাড়া আমার কি এখন বিয়ে করার কথা ভাববার সময় হয়েছে? একটা সংসারের দায়িত্ব আছে—ঝুনুর পুরো দায়িত্ব মাথায়—নিজের পড়াশোনা আছে—তারপর ওসব যদি ভাববার ফুরসৎ পাই, ভাবব। সে ঢের দেরী। আর দায়িত্ব যদি নাও থাকত—এই বয়সে কেউ বিয়ে করে নাকি?

আকবর ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলল, যাই বল্‌, ওরা চলে গেলে—তার দায়িত্ব সবটা তোর। এরই মধ্যে মুসলিম সমাজে বলাবলি শুরু হয়েছে।

সুনন্দ বাধা দিয়ে বলল, কিচ্ছু হয়নি। সব তোর বানানো। ছাখ আকবর, তোকে অনুরোধ করছি—এ নিয়ে তুই বাড়াবাড়ি করিসনে। এর পরিণাম বিশ্রী হতে পারে।

তুই শাসাচ্ছিস ?

যাঃ! শাসাব কেন ? বলছি, রাজনীতি তো ওৎ পেতে আছে আজকাল। একেই ইস্যু করে একটা কিছু ঘটে যেতে পারে। তুই শিক্ষিত ছেলে হয়ে এসব কী ভাবছিস, বুঝিনে।

ঠিক আছে।...বলে আকবর উঠে দাঁড়াল। সাইকেলটা টেনে নিল।

সুনন্দর শরীরটা ভারি হয়ে গেছে যেন। তার উরু দুটো অবশ। সে বলল, আকবর, কেন মিথ্যে আমার ওপর রাগ করে আছিস ?

আকবর প্যাডেলে পা রেখে বলল, হ্যাঁ—আর একটা কথা। তোর বোনকে একটু সাবধান হতে বলিস। শীগগির সেও একটা ট্রাবল ক্রিয়েট করবে।

সুনন্দ সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু আকবর সাইকেলে চড়ে সাঁৎ করে চলে গেল। পাল্টা কিছু বলার সুযোগ পেল না সুনন্দ।...রাস্কেলটা খুব বাড়াবাড়ি শুরু করেছে তো! এত রাগ ওর ? আর—ঝুনুর কথা কী বলে গেল ? কবীরের প্রসঙ্গ ? সুনন্দ জানে, কবীর আর ঝর্ণার মধ্যে একটা ভালবাসার খেলা চলছে। সুনন্দর প্রশ্রয় হয়তো খুব বেশি তাতে। আজ কি আকবরের কথায় সে বোনকে শাসিয়ে দেবে নাকি ? কেন ? কোন সাংঘাতিক পরিণামের কথা ভেবে ? কী সেই পরিণাম ?

কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছিল না সুনন্দ। শুধু বাবার মুখটা বারবার মনে পড়ছিল। সারা পথ খুব আস্তে সাইকেলের প্যাডেল ঘোরাল সে। নিজেকে প্রশ্ন করল বারবার। রুবিকে কি—আজ না হোক—কোনদিন—কোন একদিন—বিয়ে করতে পারবে সে ?

না পারার কারণ তো নেই। তখন সে যদি দায়মুক্ত স্বাধীন মানুষ হতে পারে, বিয়ের আদর্শ বয়সটাও এসে যায়, বিয়ে করতে

পারে বৈকি! অবশ্যি রুবির তদ্দিন অপেক্ষা করা কি সম্ভব হবে? ওর মধ্যে হয়তো এই জোরটাও নেই। ও মেয়ে—তাছাড়া মুসলমান মেয়ে। অভিভাবকের গণ্ডী ডিঙোবার ক্ষমতা কতটুকু ওর? এদিকে হেমনাথ এবং প্রভাময়ী একটা সমস্যা অবশ্য। সেটা···

সুনন্দ উত্যক্ত হয়ে বিড়বিড় করল, মরুক গে।

তবে হেমনাথের পরিবারে আঘাতটা বড় তীব্র হবে। ভয়ঙ্কর হবে। ছেলে মুসলমানীকে বিয়ে করছে, মেয়ে মুসলমানকে!

জীবনে এই প্রথম সুনন্দ অনুভব করল, ধর্ম মানুষের শত্রুতা করতে পারে—ভীষণতম শত্রুতা। প্রেম ভালবাসা যদি পাপ না হয়, যদি একে বলি মানুষের শ্রেষ্ঠতম বৃত্তি—উৎকৃষ্টতম মানস-সম্পদ এবং এই নিয়েই তো হাজার হাজার বছর ধরে শিল্পসংস্কৃতির দীর্ঘ জয়যাত্রা—মানুষের জীবনটাই একে কেন্দ্র করে ফলে ফুলে বিকশিত হয়ে ওঠে—তাহলে ধর্ম এখানে পরম শত্রু বৈকি!

একজন মানুষ যখন হত্যা করতে যাচ্ছে, চুরি করতে চলেছে—তখন ধর্ম তাকে চোখ রাঙাক। কিন্তু একজন মানুষ যখন ভালবাসতে যাচ্ছে, তখন? সুনন্দ গভীর দুঃখে অনুভব করল এতদিনে, ধর্ম মানুষের মধ্যে সীমারেখা টেনেছে—সৃষ্টি করেছে জটিল সব ব্যবধান। ধর্ম পরিপূর্ণ মানবিক বিকাশের পথে বাধা এনেছে। অতএব—ধর্মকে অস্বীকার করা ভালো। সুযোগ পেলেই তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা দরকার।

কিন্তু—

কবীরের কথাটাই মনে পড়ল। কবীর রাজনীতি করে। অবশ্য অল্পস্বল্প করে—মুখে বলে তার ঢের বেশি। সে কার্ল মার্কস আওড়ায়। সে বলে, ধর্ম জনগণের আফিং। তবে ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে লাভ নেই—কারণ, তাতে পরোক্ষে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিই লাভবান হয়। সর্বহারার লড়াইটা ভুল পথে একটা জটিলতায় আটকে যেতে পারে। তার চেয়ে বরং ধর্মের অস্তিত্বের মূলটা কেটে দেওয়া যাক। শ্রেণী-সংগ্রাম যত তীব্রতর হবে, ধর্মের স্থানও ততো নড়ে

উঠবে সমাজে। কবীর গড়গড় করে বলে—'দা হিস্‌ট্রি অফ দা হিদারটু একজিসটিং সোসাইটি ইজ দা হিসট্রি অফ-দা ক্লাস-ষ্ট্রাগলস।...এযাবৎকালের সমাজের যে ইতিহাস, তা শ্রেণী-সংগ্রামেরই ইতিহাস। সমাজে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান কোন ব্যাপারই নয়—সমাজ সরাসরি দুভাগে বিভক্ত: শোষক এবং শোষিত।...

কথাটা ভাববার মতো। সুনন্দ ভাবল। সে আরও টের পেল, কেন আজকাল তার বয়সী সবাই এইসব মতবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। এর মধ্যে আছে একটা গভীরতর বিদ্রোহের আহ্বান। 'দার্শনিকরা এতদিন শুধু এ জগতটাকে ব্যাখ্যাই করেছেন, আজকের কথা হল—একে কেমন করে বদলাতে হবে।'

রাজনীতি করবে সে? কবীরের সমর্থিত দলের রাজনীতি? বাড়ির কাছে নেমে সুনন্দ অতি দুঃখে হাসল। আসলে সে একটা আশ্রয়ের জন্যে মাথা কুটছে—যে আশ্রয় খুব শক্ত আর নির্ভরযোগ্য—যেখানে দাঁড়িয়ে জোর গলায় বলা যায়, মানুষ একটা আশ্চর্য সম্ভাবনাময় শব্দ—বলা যায়, পৃথিবীতে মানুষ নামক প্রকৃতির সন্তানকে তার পরিপূর্ণ অধিকার আর মর্যাদা দিতে হবে।

কিন্তু এইসব ভাবনার বদলে একটা চমৎকার সকাল মারা গেল। সুনন্দ সাইকেলটা সারিয়ে আনছিল হাইওয়ের ওদিকে দুপুরঅব্দি ঘুরে বেড়াবে—তাই। সেটা হল না। আকবর রাস্কেলটা তার মাথাটা সত্যি গুলিয়ে দিয়ে গেল।

বিকেলে আফজল অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেরিয়েছিলেন।

এ এক আপদ খামোকা। হাসপাতালের ডাক্তার এসেছিলেন। শরমে তো কোমরের কাপড় সরাতেই চায় না সাহানা। রুবি জোর করে সরাল। টিপে-টুপে দেখে ডাক্তার বলেছিলেন, এক্সরে করতে হবে। আজকের মধ্যেই করা দরকার। গাড়ি করে সে ব্যবস্থাও দুপুর নাগাদ হয়েছিল। রুবি সঙ্গে গিয়েছিল। আফজল বাড়ি

বসেছিলেন। রুবি চালাক-চতুর মেয়ে—সেই পারবে'খন পারলও।

কিন্তু সাংঘাতিক কাণ্ড, হাড় ভেঙেছে সাহানার। হাসপাতালে ভরতি করা ছাড়া উপায় ছিল না। সাহানা তো কান্নাকাটি করছিল। রুবি বুঝিয়ে শুঝিয়ে রেখে এসেছে। তারপর আফজল গেছেন। চোখের জল ফেলে আশ্বস্ত করে এসেছেন বেগমকে। শীগগির সেরে যাবে—ভেবো না। দুবেলা আমরা বাপবেটি আনাগোনা করব। খাবার বাড়ি থেকেই আসবে। চোখ বুজে পড়ে থাকো—কেমন?

সাহানার কান্না থামতে চায় না। এই বেগানা জায়গায় তাকে পড়ে থাকতে হবে? কতদিন? বাড়িঘর ফেলে বেপর্দা হয়ে পর পুরুষের মধ্যে! উঃ মা গো!

আফজল বলেছেন, জোড়া লাগতে দেরী হবে না। যা সব ওষুধ লাগিয়েছে না! চুপসে শুয়ে থাকো। খোদাকে ডাকো।···আড়ালে রুবিকে বলেছেন, ও বুড়ো হাড় জোড়া লাগবে আর? কক্ষনো না। এখন ঠ্যালা সামলাও।

বিকেলে রুবিকে নিয়ে আফজল হাসপাতালে গেলেন। তারপর কাজের অছিলায় কেটে পড়লেন। রুবি যে একা ফিরবে, সে কথাটা তখনকার মতো কারো মাথায় এল না।

আফজলের আসলে দেরী হয়ে যাচ্ছিল। সেই ব্রীজটা!

হ্যাঁ, যা ভেবেছিলেন তাই। প্রতিপক্ষ দখল করে ফেলেছে আজ। হাতছুট হয়ে গেছে। থমকে দাঁড়ালেন আফজল। বারকতক টুপিটা অকারণ মাথা থেকে খুললেন আর ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে পরলেন। ভিতরটা ছটফট করছিল তাঁর। পাকিস্তানে ছেলের কাছে চলে যাবার দিন গুনছিলেন, হঠাৎ সাহানা কোমর ভেঙে ফেলল। এ অবস্থায় যাওয়ার ব্যাপারটা বেশ অনিশ্চিত হয়ে পড়ল। ভাবনা-উদ্বেগ ভরা মনকে এই সুদীর্ঘকালের নির্জন সিংহাসনটিতে বসে বাদশাহের মতো চারদিক অবলোকন করে একটা প্রশান্তি দেওয়া যেত—আপাতত তার উপায় নেই। একটু এদিকে ওদিকে অবশ্য

বসা যায়। কিন্তু এ বেলার মতো আর ওই কাফেরটার অস্তিত্ব মন থেকে মোছা ভারি কঠিন।

হেমনাথ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেছিলেন—'নেড়েটা' আসছে। ভূত একটা! আজ নাই বা এলি এখানটায়! জায়গা তো কারো রেজেস্ট্রি করা নয়। আজ তুই বরং ওভারব্রীজে চলে যা। উঁহু, তা যাবে কেন? পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করার স্বভাব যাবে কোথায়? কই, এ্যাদ্দিন আমি তো তোকে দেখা মাত্র কেটে পড়েছি—তুই পড়ছিস নে কেন?

হেমনাথ টেরচা তাকিয়ে আরও গুম হয়ে গেলেন। আফজল গটগট করে ওপাশের রেলিংচত্বরে বসে পড়লেন। উল্টোদিকে মুখ করে বসলেন। পা দুটো ঝুলিয়ে দিলেন ক্যানেলে। হেমনাথও তাই করলেন।

আফজল উত্তরে দূরের প্রসারিত শস্যশূন্য মাঠ আর আকাশের দিকে তাকাতে গিয়ে দেখলেন তাঁর চোখদুটো মাথার পিছন দিকে বসে রয়েছে। হেমনাথ ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না!

হেমনাথ দক্ষিণে কুসুমগঞ্জের বিধ্বস্ত কুঠিবাড়ির বনজঙ্গল, নদী আর নদীপারের ধূসর হয়ে ওঠা গ্রামপুঞ্জ দেখতে গিয়ে জানতে পারলেন তাঁর চোখজোড়াও সামনে নেই—মাথার পিছনে পালিয়ে গেছে।

একটু পরে ক্যানেলের তলানিতে পাঁক হাতড়ে মাছ ধরা শেষ করে ফজলু সেখ এসে গেল। অগাধ জল থেকে ভোঁস করে মাথা তুলে নিঃশ্বাস ফেলতে পারলেন আফজল।···ধুস্! কাণ্ড দেখছ? কোত্থেকে ভূতের মতো···হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ। মাছ পেলে নাকি ফজলু?

ফজলু এসে লাইনের ওপর বসল।···পেলুম দু'চাট্টে পুড়িয়ে খেতে। বসে আছেন মিয়াসায়েব?

হুঁ। আর কী করব বলো? দিনমান যা গরম পড়েছে, এখন একটু গা না জুড়োলে দম বন্ধ হয়ে যায়।

ফজলু দার্শনিক। সে বলল, গরম কি বাইরে বাইরে শুধু? আপনার গে দুনিয়ার ভেতরটাও তেতে আছে গো, বুঝলেন? আর জ্বালার কথা বলবেন না। মানুষের মধ্যে আর মানুষই নেই।

আফজল বললেন, যা বলেছ।

ফজলু এবার ঘুরেছে।···আরে! মেজবাবু যে। চোখে ছটা লেগে চিনতেই পারিনি! আদাব মেজবাবু।

হেমনাথ আদাব দিলেন। মুখটা ফেরালেন না। বললেন, ক্যানালে এখনও মাছ আছে?

আছে দু চাট্টে।···ফজলু বলল।···মেজবাবু, এবারে সাতকাঠায় আখ দিলেন না কেন? আপনার চার পাশেই তো সব গুড়ের বান ডাকালে! ছেলেমেয়েদের মিষ্টিমুখ হত।

হেমনাথ বললেন, আখ দিতে ঝামেলা আছে হে ফজলু। বিস্তর পয়সা চাই। তার ওপর···

আফজল বললেন, ফজলু, এবার রবিখন্দ কেমন তুললে?

ফজলু বলল, তুললুম। বলে সে মেজবাবুর দিকে ঘুরল। তা মেজবাবু, এবার কিন্তু আগাম বলা রইল। ছিটেফোঁটা রাখবেন কিন্তু। শুধিয়ে দেখুন মিয়া সায়েবকে—ওনার বাঁজা তিন কাঠা ডাঙা, সেখানে কী কাণ্ড করেছিলুম গত বছর। জমিটা এখন ডাকলে রা কাড়ে। চাষবাসে আমার সুনাম আছে গো।

হেমনাথ বললেন, দেখবখ'ন। ইসাক মারা গেছে—ওর ছেলেরা দাবি ছাড়ছে না। আজকাল ভাগচাষের আইন বড় কড়া হে! দেখব—তুমি বলছ যখন, নিশ্চয় দেখব।

আফজল বললেন, ফজলু, সরে এস। গাড়ি আসছে।

ফজলু হেসে বলল, মলে তো বাঁচি! জ্বালা কি একদিকে মানুষের?···বলে সে আফজলের দিকেই সরে এল।

আফজল বললেন, আর বোলো না। মানুষের বাঁচা না বাঁচা সমান। একেকটা জ্যান্ত লাস ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার চেয়ে ঘরে ঘরে সব গাড়ি এসে ঢুকুক, পিষে দিয়ে চলে যাক।

হেমনাথ কী বলতে যাচ্ছিলেন, মাল গাড়িটা এসে পড়ায় শোনা গেল না—বললেনও না। লম্বা গাড়িটার কতক্ষণ বিরক্তিকর শব্দের পর নীরবতা নামল ফের।

ফজলু একটু হাসল হঠাৎ।·· তা মিয়াসাব, মেজবাবু! একটা কথা বলব? আমি বড্ড মুখখোলা মানুষ। বলব?

একজন শুধু 'উঁ' বললেন।

এটা ভাল দেখাচ্ছে না গো!

একজন শুধু 'কী' বললেন।

এই যে দুজনা দু' দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে রয়েছেন!···ফজলু হো হো করে হেসে উঠল।···আরে বাবা! লোকে কত মুখে কত কথা বলবে—কী আসে যায় বলুন? কে কাকে ক'থালা ভাত দেবে, না পাঁচখান কাপুড় দেবে? আপনারা দুজনাই জ্ঞানী বেচক্ষণ মানুষ। আমার বয়স তো কম হল না গো! বোধ করি, মিয়াসাহেবের চে' ঢের বড়ই হবো। চুল দাড়িতে পাক ধরে গেল। দাঁত পড়ে গেল। পণ্ডিতে পড়ে শেখেন, আমরা ঠকে শিখি।

দুজনে হাঁ করে তাকিয়ে আছেন ফজলুর দিকে।

না মিয়াসাহেব—মেজবাবু। অট্টুকুন বয়স থেকে আপনাদের দেখছি। তামাম কুসুমগঞ্জো একদিকে তো আপনারা দুইজনা ছিলেন অন্যদিকে। আজ কতক্ষণ থেকে দেখছি কাণ্ডটা! দেখেই উঠে এলুম।

এবার হেমনাথ গম্ভীর হয়ে বললেন, কী দেখছ?

যা দেখবার।···ফজলু আরও হাসল।···এটা ভালো না মেজবাবু। লোকে বলে বটে, দোস্ত দুষমন হয়—কিন্তু কথাটা মিথ্যে। একশো-বার মিথ্যে। খাঁটি দোস্ত কখনও দুষমন হয় না! তাহলে দুনিয়াটা এ্যাদ্দিন উল্টে যেত। পষ্ট কথার জন্যে আমি অনেক লাঞ্ছনা পেয়েছি বটে, তবে কিনা এই হচ্ছে গে অব্যেস।

আফজল রেগে বললেন, ফজলু, ঘর যাও। বাজে বোকো না।

হেমনাথ স্তব্ধ। গম্ভীর।

ফজলু বলল, কিসের হেঁদু মোছলমান গো? ওসব হলো গো খালেক চৌধুরী আর গোভাস মুখুয্যের। গরীবের আবার হেঁদু-মোছলমান? বলবেন—আমরা আবার গরীব কিসের? বেশ তো ভদ্দলোক, মিয়া মোখাদিম আছি। দু'চার বিঘে জমি-জমাও আছে।

ওটা ভুল কথা—ভু—উ—ল ! নিজের মনে-মনেই বুঝে দেখুন গে। আপনাতে-আমাতে ভেদ নেই আসলে। সংসারের খাতা খুললে একই হিসেব।

আফজল ফের ধমক দিলেন।…ফজলু! বাজে বকো না।

হেমনাথ খিকখিক করে হাসলেন।…ফজলু কম্যুনিষ্ট পার্টির লোক কি না! ওর কথাবার্তাই আলাদা। হ্যাঁ হে ফজলু, কবে তোমাদের বড় সভা হবে শুনছিলুম ?

ফজলু বলল, এসব আমার মনের কথা মেজবাবু। আমি যা বুঝি তাই। লোকের কথায় পড়ে মিয়াসাহেব শুনলুম দেশ ছেড়ে পালাচ্ছেন। শুনে বড্ড দুঃখু হল। সবচে সাংঘাতিক কথা হল কি না—ওনারা পালাচ্ছেন নাকি মেজবাবুর অত্যাচারে। তিনি কিনা জানের দোস্ত !

হেমনাথ—আফজল দুজনেই চমকে উঠলেন।

মোছলমান পাড়ায় এ নিয়ে কথা উঠেছে। হেঁদু পাড়ায় বাবুরাও কানাঘুঁষো করছে। বড় ভয় লাগে মেজবাবু। কখনো এখানে অশান্তি হয়নি। কী জানি কী হয় !

হেমনাথ গলা ছেড়ে বললেন, কই, আমাকে তো কেউ কিছু বলেনি।

আফজল বললেন, বা রে বা ! যার বিয়ে তার খ্যাল নেই, পড়শী মল গীত গেয়ে ?

ফজলু বলল, আরও শুনলুম—চৌধুরীর ব্যাটা আকবর মেজবাবুর ছেলেকে শাসিয়েছে। তাই নিয়ে ঝগড়া হয়েছে ওনার বন্ধুদের মধ্যে। মতিয়ুল কাজীর ছেলে আর আপনার ছেলে…

হেমনাথ চমকে বললেন, সুনুর সঙ্গে ? সে কি ? আমি তো কিছু জানিনে !

আফজল হতবাক।

তাই মনে বড় দুঃখু হল মেজবাবু। দুটো মানুষ এমন করে মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকবেন খামোকা—আর মাঝখানে শ্যালশকুন এসে খেউড় গাইবে. এ কেমন হল ? এটা ঠিক না।…

বলে ফজলু হঠাৎ হনহন করে চলে গেল। লোকটাই এরকম। সবখানে ঘোরে, সব খবর রাখে। আর ফোঁপর দালালী করতে গিয়ে লাঞ্ছিত হয়।

আফজলের মাথার ওপর একঝাঁক পাখি উড়ে গেল। মুখ তুলে একবার তাদের দেখলেন। ধূসরতা ঘনিয়ে আসছিল দূরে। সূর্য ডুবে গেছে। প্রান্তরব্যাপী ফিকে একটুখানি আলো তখনও করতলের মত স্মিত উজ্জ্বলতা। বাতাস বইতে থাকল খরবেগে। আকন্দ গাছের ঝোপটা দুলতে লাগল। নিঃসঙ্গ শিমূলের ঘন-সবুজ পাতা শন শন করে উঠল। একটা ফিঙে ডেকে উঠল টেলিগ্রাফের তারে। ঝাঁ—কু—কু! ঝাঁ—কু—কু। রেল লাইনের ওপর দিয়ে চলে গেল একটা ঘূর্ণী। খড়কুটো ঘুরতে থাকল। অনেক উঁচুতে একটা শুকনো পাতা ঘুড়ির মত কাঁপছে। আফজল একটু কেসে ডাকলেন, হেম!

উঁ?

শুনলে?

শুনলুম।

গভীর স্তব্ধতা আবার।

রুবির মা কেমন আছে?

ভালো না।

প্লাষ্টার করেছে শুনলাম।

হুঁ।

তাহলে ধরো মাস ছয়েকের কমে পার পাবে না।

ছমাস!

তা বই কি! ঝুনু বলছিল—কমপাউণ্ড ফ্র্যাকচার। ঝুনু গিয়েছিল।

অ।

চলো, আমিও দেখে যাই ফেরার পথে।

হেম!

উঁ?

মুখ ফিরিয়ে হাউ মাউ করে কেঁদে ফেললেন আফজল। নির্জন মাঠ। সন্ধ্যা আসছে। বুড়োমানুষের কাঁদবার পক্ষে চমৎকার জায়গা। এবং হেমনাথ লাইন পেরিয়ে দৌড়ে গেলেন।...আ ছি ছি! আফজল, কাঁদছ কেন? আমি হেম—হেমনাথ—আমি ঠিকই আছি...আমি...

হেমনাথও কেঁদে ফেললেন।

আকাশের কোথাও দূরদুর্গমে কোটি আলোক বর্ষের পারে নাকি মানুষদের ঈশ্বর থাকেন। সেই ঈশ্বর তাঁর পবিত্র করতল স্বরূপ একটি দিনাবসান দিয়ে আড়াল করেছিলেন দুটি মানুষকে। কারণ আরও-আরও মানুষদের পক্ষে ব্যাপারটা ভারি কৌতুকপ্রদ হত।

আর, মুসলিম মিথে একটা উক্তি আছে। মানুষ যখন নাকি মলমূত্র ত্যাগ ইত্যাদি জৈবিক ক্রিয়াকলাপে রত হয়, শয়তান অদৃশ্য দাঁড়িয়ে হি হি করে হাসে। তাই মুসলিম মানুষ এ কাজের প্রারম্ভে বিশেষ একটি মন্ত্র পড়ে নেয়—তার ফলে শয়তানের চোখের সামনে একটা দুর্ভেদ্য আড়াল গড়ে ওঠে ঈশ্বরের ইচ্ছায়। শৌচ-কর্মের পর আরেকবার আরেকটি মন্ত্র পাঠ করলে তখন শয়তানের চোখের ঠুলিটা ফের খুলে পড়ে। শয়তানকে সব সময় অন্ধ করে রাখা তো ঈশ্বরের ইচ্ছা নয়। তাহলে পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য যে ব্যর্থ হবে।

হ্যাঁ, শয়তানের চোখে ঠুলি পড়ে গিয়েছিল সেদিন কিছুক্ষণের জন্যে। কারণ, বন্ধুত্বও তো জৈবিক ক্রিয়াকলাপের মতই মানুষের জন্যে অপরিহার্য। পশুর চেয়ে মানুষের জৈবিক ব্যাপারগুলো অনেক বেশি।

সেদিন রুবি অনেকক্ষণ বসে থাকার পরও আফজল এলেন না দেখে বলেছিল, আমি যাচ্ছি মা। আব্বা এখন মকবুল দরজীর খপ্পরে পড়েছে নির্ঘাৎ। রাত দুপুর করে ফেলবে।

সাহানা বলেছিল, যাবি? তবে একটা রিকসো করে যা। খবর্দার, হেঁটে যাবি নে মা।

রুবি বলেছিল, তোমার বুকের ব্যথার কথা ডাক্তারকে বলে যাচ্ছি। লজ্জা করো না। নিজেও খুলে বলবে। ওঁরা জানবেন কেমন করে বল তো—কিছু না খুলে বললে?

সাহানা চোখ বুজে ইসারা দিয়েছিল, বলবে। লজ্জা করবে না।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে রুবি পথে নামল। হাইওয়ের দুপাশে বড় বড় গাছ এখানে—ওদিকে সমান্তরাল রেল-লাইন। বাঁ দিকে কলেজ ছাড়িয়ে তারপর বাজার। সে বারোয়ারি তলার কাছে এসে রিকসো করবে ভাবল। ইলেকট্রিক আলো আছে পথের দুধারে—তবে অনুজ্জ্বল। তার বুকটা কেঁপে উঠল অকারণে। সে রিকসো করতে যাচ্ছে হঠাৎ কবীরকে দেখতে পেল।

কবীরকে দেখে তার সাহস হল সঙ্গে সঙ্গে। সে ডাকল, কবীর-ভাই।

কবীর সাইকেল থেকে নেমে অবাক।...আরে রুবি! এখানে একা কী করছ?

হাসপাতালে গিয়েছিলুম।...রুবি একটু নার্ভাস হাসল।...যা ভয় করছিল না!

কিসের ভয়? কবীর হেসে উঠল।...তুমি বলতে না জুলিদির সঙ্গে পাঞ্জা লড়বে?

জুলিদি? ও। জুলেখা?...রুবি হাঁটতে থাকল।...কবীর-ভাই, জুলেখার নাকি বাচ্চাটাচ্চা হয়ে গেছে? কী কাণ্ড!

হ্যাঁ। কবীর আস্তে আস্তে সাইকেল ঠেলছিল।...তোমার মা কেমন আছেন?

ভালো না। আবার নতুন উপসর্গ...বুকে ব্যথা।

ইয়ে—সুনুর সঙ্গে দেখা-টেখা হয় নি আর?

কথাটা বলেই অপ্রস্তুত হল কবীর। সঙ্গে সঙ্গে কথাটা ঘোরাল—বুনুর খবর কী?

রুবির মুখে কী একটা চাপা ভাব—সে কিন্তু হাসল।...ঝুনুর খবর তো তুমিই ভালো জানো।

নাঃ! শোননি, পরশু বিকেলে আমার সঙ্গে শমিতদের ঝগড়া হয়ে গেছে?

না তো! কেন?

ঝুনুর ব্যাপার নিয়ে। জাতটাত তুলে গালাগালি করছিল—আমি ভাবিনি, শিক্ষিত ছেলে সব...ছিঃ! আকবর হলে তো মারামারি হয়ে যেত!

কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটবার পর রুবি বলল, কাল সকালে আমাদের বাড়ি আসবে কবীর ভাই? আব্বা থাকবেন না—ফিরতে দুপুর হবে। আসবে?

কবীর একটু ভেবে হাসিমুখে বলল, যাবো বলছ?

ঝুনুও আসবে বলেছে।

এঁ্যা! ওরে বাবা। দরকার নেই।...কবীর হেসে উঠল।

যাও! এত ভীতু কেন তুমি? কেউ টের পাবে না।

তুমিও কম ভীতু নও।

মোটেও না।...রুবি তার ছাত্রজীবনের চপলতা ফিরিয়ে এনে বলল,—মা-বাবার মনে কি দুঃখ দিতে আছে?...এবং খিলখিল করে হাসল সে।

কবীর বলল, মায়ের কোমর ভেঙে ভারি স্ফূর্তি হয়েছে, তাই না?

রুবি বলল, আমি ভীতু নই। ভীতু কে, তাকেই জিজ্ঞেস করো।

না—ঝুনুটা ঠিক ভীতু নয়। বড্ড হিসেবী। ওর প্রেম করা সাজে না!...কবীর হাসতে লাগল।

রুবি রাগের ভান করে বলল, আমার কারো সঙ্গে প্রেমট্রেম নেই। আচ্ছা চলি কবীর ভাই। ইচ্ছে হলে এসো। আজকাল আমিই বাড়ির মালিক কি না!

রুবি হঠাৎ ডানদিকের পথে এগিয়ে গেল। কী মেয়ে! কবীর অবাক। ওদিকে তো আলোটালো নেই—সরু গলিপথ। জেলে

পাড়া। শর্টকাট করল—নাকি কবীরের সঙ্গে আর হাঁটতে চাইল না ?

কবীর সাইকেলে চেপে সোজা বাড়ির দিকে এগোল। রুবি হঠাৎ কেন যেন তার অস্বস্তি বাড়িয়ে দিয়েছে। একটা স্বাভাবিকতাকে অকারণ জটিল করে ফেলেছে না কি সে ? তাছাড়া, এত চপল চঞ্চল প্রকৃতির মেয়ে তো রুবি ছিল না।

বারো

এ ঠিক পুনর্মিলন নয়। বড়জোর বলতে পারি এটা নতুন আরম্ভ। নতুন—কাজেই ভিন্ন একটা আকৃতি-প্রকৃতি। যা ছিল, তার সঙ্গে এর তুলনা চলতে পারে না। আফজল-হেমনাথ পরস্পর ফের নিকটস্থ হলেন বটে—কিন্তু একটা গভীরতর অস্বস্তি দুজনের মনের ভিতর থেকে গেল। এখন দুজনেই কোথায়-কোথায় কদ্দুর পা ফেলবেন বা ফেলবেন না, সেই রকম হিসেবী চালচলন এবং সতর্কতা অবশ্যই রয়ে গেল দুপক্ষে।

প্রভাময়ীও দেখে এল সাহানাকে—সঙ্গে ঝুনু ছিল। কিন্তু বেশীক্ষণ বসতে পারেনি। ঝটপট কিছু খবর জেনেই দুরুদুরু বুকে পালিয়ে এল মেয়েকে নিয়ে। লোকলজ্জার মাথা খানিক খেতে হল সজ্ঞানে। কিন্তু এ অনেকখানি হেমনাথের জেদে। হেমনাথ আফজলকে বলেছিলেন ঝোঁকের বশে—মেজবউও আসবে'খন। জেদী হেমনাথের স্বভাবচরিত্র স্ত্রীর জানা আছে। তাই ওটা কিছুটা নিতান্ত কথা রাখার ব্যাপার। স্বামীকে ছোট হতে দিতে প্রভাময়ীর কষ্ট হয়।

তবে শুধু এই অজুহাতটা দেখালে প্রভাকে ছোট করে দেখানো হয়। প্রভা তা নয়। তার মনে অনেকরকম ভালমন্দ সংস্কার আছে। তার মধ্যে পরিচিত মানুষ বা প্রতিবেশীর প্রতি প্রীতির

সম্পর্ক নামে যা আছে, তা কম গভীর নয়। ধারে-কাছে যারা স্ব-সম্প্রদায়ের প্রতিবেশী, তাদের প্রায় সবার বৈষয়িক অবস্থাই হেমনাথের চেয়ে ভালো। কাজেই ছাই ফেলতে ভাঙা চুলোর মতো এই খাঁ পরিবার ছিল প্রভার প্রবলতম পড়শীক্ষুধার মধুরতম খাদ্য। এখানে কোন প্রতিযোগিতার প্রশ্নই ওঠে নি। বরং খাঁ পরিবার টাকা পয়সার হিসেব ধরলে একটু গরীবই বটে।

প্রভা সাহানাকে দেখে এল। তার কষ্ট হচ্ছিল। মিয়াবউর অমন শরীরটা কী হয়ে গেছে! বুকের ব্যথাটা বাড়ছে—কমবার লক্ষণ নেই। ডাক্তার বলেছেন, ওটা অন্য অসুখ। হার্টের দোষ আছে যে! প্রভার কেমন সন্দেহ হচ্ছিল। বুকে আঘাত লাগেনি তো আছাড় খাবার সময়? কথাটা হেমনাথকে বললে, তিনি জবাব দিলেন, আরে না, না! ডাক্তারেরা কি সেটা পরীক্ষা করেনি ভাবছ? আমার বাবা ডাক্তার ছিলেন। দেখেছি, রোগী পেট ব্যথা করছে বললে পিঠে ষ্টেথিসকোপ লাগাতেন! তবে বাবাকে লোকে বলে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী ছিলেন। তাঁর সঙ্গে একেলে ডাক্তারদের তুলনা হয়? খাঁয়ের বরাত। বাবার ভিটে ছেড়ে পালাতে চাইছে—ঈশ্বরের ইচ্ছে তা নয়।

প্রভা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, সে যাক গে। লোকে তো এরই মধ্যে পাঁচ কথা গাইছে, এর পর আমরা দেখতে গেছি শুনে ঢি ঢি পড়ে যাবে দেখে নিও।

হেমনাথ শুধু বললেন, না, না।

কিন্তু তাঁকে চিন্তিত দেখাচ্ছিল। ভাবছিলেন, হয়তো একটু বাড়াবাড়ি হল। কিন্তু দেখতে না যাওয়াও তো ভালো দ্যাখায় না। বিবেক বলে একটা কথা আছে। যেমন কি না—ছেলেয়-ছেলেয় বিবাদ করল, দুই বাবার মধ্যে বিবাদ লাগল—এ হচ্ছে সেই রকম। খাঁ বা তার বউর সঙ্গে আমাদের বিবাদ কিসের? সুনু না গেলেই হল!

কিন্তু কদিন পরেই ধাক্কা খেলেন হেমনাথ। তারু চক্রবর্তীর ধান ভানা কলের ওদিকে একটা কাজে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে একটু

বসে এলেন। সেই সময় চক্রবর্তী এই ধাক্কাটা মেরে বসলো। কী হে হেমচন্দর! বেয়ান কেমন আছে দেখলে?

হেমনাথ স্তম্ভিত।···বেয়ান কাকে বলছ?

চক্রবর্তী বললেন, আমি ভাই দুকান কাটা মানুষ। আমার মুখেরও কোন ঢাক গুড় গুড় নেই। শুনলুম, তুমি তোমার বউ ছেলে মেয়ে সব্বাই দুবেলা হাসপাতালে ধর্ণা দিচ্ছ। টিফিন কেরিয়ারে খাবার যাচ্ছে। হুঁঃ···হুঁঃ···হুঁঃ! অদ্ভুত হাসেন তারু চক্রবর্তী।

হেমনাথ নিঃশব্দে উঠে এলেন। চক্রবর্তী তাঁর পয়সাওলা সতেজ খ্যানখেনে কণ্ঠস্বরে তখনও বলছেন, ওতে দোষ নেই হে! আজকাল বামুনের ছেলেরা মেম আনছে ঘরে। জলচল হচ্ছে সব। তার ওপর বেয়ানটি নাকি বেজায় সুন্দরী—হুঁঃ হুঁঃ হুঁঃ!

অস্থির হেমনাথ প্রভাকে কথাটা বললেন না বটে, সারারাত সেদিন ঘুমোতে পারলেন না। অনেক রাতে তাঁর মাথায় একটা প্রবল জেদ জাঁকিয়ে বসতে চাচ্ছিল।···হ্যাঁ, যদি খালেকের মতো, নয়তো মুখুয্যেদের মতো পয়সা আমার থাকত—আমি এক্ষুণি তাই-ই করতুম। কলকাতা থেকে ব্যাণ্ডপার্টি আনতুম। ওমর মালাকারের বাজী পুড়ত সারারাত। কুসুমগঞ্জের কান ফাটিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে একাকার করে ফেলতুম! আমি হেমনাথ—আমি বুড়ো হয়েছি বলে কি একটুও ক্ষমতা নেই?

···তারপর রাত যত বাড়তে লাগল, হেমনাথ একটু করে সতর্ক হতে থাকলেন। আরে ছি ছি। কী সব ভাবছি। স্থিরবুদ্ধি বলে আমার সুনাম আছে। অথচ এমন আবোল-তাবোল কথা মাথায় কেন আসছে? নাঃ, লোকে আমাকে পাগল করে ফেলবে দেখছি। তার চেয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করা যাক।···

আর একদিন স্টেশনবাজারে রক্ষাকর চাটুয্যের সঙ্গে দেখা—প্রভাত মুখুয্যের শালা। বড় আড়ত আছে। টাকাপয়সা আছে বিস্তর। সম্প্রতি ট্রান্সপোর্ট খুলেছে এখানে। কুসুমগঞ্জ-জিয়াগঞ্জ রুটের নতুন

বাসমোটর সেদিন সদ্য এসেছে গ্যারেজে। গাড়িটা কিনলে নাকি দাদু? হেমনাথ জিজ্ঞেস করছিলেন। নাতির সম্পর্কেই আহ্বান করেন ওকে।

রক্ষাকর জবাব দিলে, হ্যাঁ। আপনার হাত দিয়েই আগে উদ্বোধনটা করে ফেলব ভেবেছি হেমদাদু।

হেমনাথ বুঝতে না পেরে বললেন, আমি তো নেতাফেতা নই ভায়া!

তা কেন? আমার কাকামশাইয়ের শুভকাজে বরযাত্রী যেতে হবে না? গাড়িটা প্রথম খেপে না হয় বরযাত্রীই বইবে।

একটু বুঝে হেমনাথ হেসে উঠলেন।...সুনুর কথা বলছ? আরে, আগে পাস করে বেরোক। চাকরিবাকরি হোক। তার পর তো।

সুরসিক রক্ষাকর বিস্ময়ের ভাণ করে বলল, বা রে বা! তবে যে শুনলুম, এ মাসেই সব চুকে যাচ্ছে!

হেমনাথ ফের বোকা হয়ে গেলেন।...পাগল! কী সব উড়োকথা শুনেছ!

হবে। তবে হতেই বা বাধা কিসের? আজকাল সবই চলছে। অসবর্ণে যদি আপত্ত না থাকে, তো ইয়ে--আরো এক পা বাড়িয়ে মুসলমানেই বা আপত্তি কি? সাতশো বছরের পড়শী।

হেমনাথ মুহূর্তে ফেটে পড়লেন।...রক্ষাকর, বাঁদরামির একটা সীমা আছে।

রক্ষাকর হাসতে থাকল। দাদু সবতাতেই রেগে যান। ধুৎ। ইয়ার্কিও বোঝেন না। ওরে অমলা, দাদুকে একটা কোকাকোলা দিয়ে যা। বসুন দাদু, বসুন।

হন হন করে হেমনাথ হাঁটতে থাকলেন। যদ্দূর গেলেন, পিছনে একদল মানুষের অট্টহাসি তাঁর কানে আসতে থাকল!

আফজল এই ঘোর বিপদের দিনে হেমনাথকে ফিরে পেয়ে মনে জোর পাচ্ছিলেন খুবই। নুরুর চিঠি এসে গেল। সেই হিন্দু

ভদ্রলোকও এসে দেখা করে গেলেন। যশোরে বাড়ি তাঁর। তাঁর হাত দিয়েই টাকা পাঠিয়েছে নুরু। আফজল বললেন, ওয়াইফের অসুখ। প্লাষ্টার এঁটে হাঁসপাতালে পড়ে আছেন! আপনি বরং সামনের মাসে আসুন। নুরুর কাছেই খবর পাবেন। আমিও নুরুকে খত লিখে সব জানাচ্ছি।

ভদ্রলোক বললেন, তা একটু দেখে-শুনে যেতে চাই মিয়াসাব। বিনিময় যে হবে, আগে দেখাশোনা না হলে চলবে কেন?

আফজল ব্যস্ত হয়ে বললেন, মাফ করবেন ভাই। এখন আমার মাথার ঠিক নেই! ওয়াইফ হাসপাতালে। এখন কি ওসবের সময়! আপনিই বলুন!

হতাশ হয়ে চলে গেলেন ভদ্রলোক। আফজল ছেলেকে চিঠিতে জানিয়ে দিলেন সব। কিন্তু যোগ করে দিলেন আরও একটি জরুরী এবং বাড়তি কথা।-- বাবা নুরু, তোমার মাজান আরোগ্য হইলে কপালে যদি খোদা লিখিয়া থাকেন, যাওয়া হইবে। কিন্তু ইতিমধ্যে তুমি শীঘ্র শীঘ্র যেভাবে হোক, আসিয়া রুবিকে নিয়ে যাও। রুবির ভাবগতিক ভাল দেখি না। মা হাসপাতালে থাকায় আমার সন্দেহ, সে পুনরায় গোপনে সুনুর সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিতেছে। এদিকে লোকের মুখে গঞ্জনা শুনে আমি পাগল হইতে চলিয়াছি। অতএব বাবা নুরু...ইত্যাদি।

আফজল আগে সব চিঠিই রুবিকে দিয়েই লিখিয়েছেন। কেবল রুবি-সুনন্দ সম্পর্কে সাংঘাতিক প্রথম চিঠিই তিনি নিজেই ওইরকম অনভ্যস্ত গদ্যে লিখেছিলেন। এবার লিখলেন এই চিঠিটি। লিখে নিজের হাতের লেখা ও বয়ানের প্রতি সপ্রশংস চোখে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। বাঃ, বেশ লেখা যায় তো! শুধু আলসেমি করে নিজের যেটুকু বিদ্যে ছিল জাহান্নামে দিয়ে বসেছিলুম।

এবং সেদিন অনেকটা সময় আফজলকে শুয়ে একটা পুরনো বই পড়তে দেখেছিল রুবি। বইটার নাম 'বঙ্কিমদুহিতা।' লেখক একজন মুসলমান। রুবি বাবা বা তার দাদুর সংগ্রহে যা আছে, তা সবই পড়ে

ফেলেছিল বলে, এই বইটার ইতিহাসও তার জানা। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র 'আয়েষা' নামে মুসলিম নবাবনন্দিনীকে হিন্দু রাজপুত্রের প্রেমাকাঙ্ক্ষিনীরূপে চিত্রিত করেছিলেন তাঁর 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে। এইতে এক মুসলিম লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের ওপর ক্ষেপে গিয়ে ওই উপন্যাসটি লিখে ফেলেন। এবং মুসলিমদের মধ্যে জনপ্রিয়তাও পান। ওতে বঙ্কিম নামে এক ব্রাহ্মণের কন্যার সাথে এক মুসলিম যুবকের প্রণয়কাহিনী রয়েছে। গায়ের ঝাল ঝাড়া অবশ্য যথেষ্টই হয়েছিল। রুবি সুনন্দ ঝুনু কবীর আরো অনেকে মিলে বইটা পড়েছিল। দোষগুণ আলোচনা করেছিল। কবীর বলেছিল, বিষয়টা মন্দ নয়—তবে লেখাটা বাজে।...মান্ধাতার আমলের ভাষা। সুনন্দর মতে—গল্পটা আসলে জমেই নি। ঝুনু কোন মতামত ছায় নি—গুম হয়ে বসেছিল। আর রুবি চিমটি কেটে তার কানে কানে বলেছিল, বইটা নিয়ে যা। বুকে রেখে ঘুমোস। পরে একদিন ঝুনু 'দুর্গেশনন্দিনী' দিয়ে যায় রুবিকে। বলে, শোধ নিলুম। রুবি কিন্তু পড়ার পর ভয়ে আর লজ্জায় কতদিন মনমরা হয়ে থেকেছে। এই তো কমাস আগে এসব ঘটেছিল।

বইটা এতদিন পরে আফজল খুঁজে বের করে পড়ছেন দেখে সে অবাক হয়েছিল। বুড়োরা ওই সব সেকেলে বইগুলোকে ধর্মগ্রন্থের মতো পবিত্র মনে করে।

অবশ্য আফজল কিছু না ভেবেই পড়তে শুরু করেছিলেন বইটা—নিছক পড়ার খেয়ালে—চিঠি লেখার পর নিজের শিক্ষাদীক্ষার পর্যালোচনা ছাড়া সেটা অন্য কিছু নয়। কিন্তু যত পড়েন, খিক খিক করে আপন মনে হাসেন আর বলেন, বা রে! বেশ লিখেছে তো। লড়ে যাও বাবা!...ফের কিছুটা পড়েন আর বলে ওঠেন—বহুৎ আচ্ছা!...কখনও—ওরে ব্বাস!

একজন খাঁটি সমঝদার পাঠকের কাণ্ড। রুবি টের পাচ্ছিল। তার নতুন চপলতা সেই সময় তাকে একটা কথা বলতে সুড়সুড়ি দিল। এবং রুবি বলেও ফেলল, খুব ভালো বই বুঝি?

আফজল বই থেকে মুখ বের করে বললেন, জোর লিখেছে রে।

রুবি বলল, আব্বা, তুমি বঙ্কিমচন্দ্রের কোন বই পড়েছ?

আফজল ফের বইতে চোখ রেখে বললেন, এটা শেষ করি। তা'পরে।

রুবি আর 'দুর্গেশনন্দিনী'র কথাটা তুলল না। কিন্তু তার তীব্র ইচ্ছে হচ্ছিল—'দুর্গেশনন্দিনী' পড়ে বাবা কী বলেন জানতে।...

আফজলের এই নিশ্চিন্তে উপন্যাস পড়া, হাই তোলা, গড়িমসি ঢিলেঢালা ভাবটি ছিল একটা গভীর ভাবমুক্তির প্রকাশ। স্ত্রীর অস্বাস্থ্যের চেয়ে রুবিই তাঁর কাছে বড় সমস্যা। তিনি ভাবছিলেন রুবি চলে গেলেই আর ঝামেলা নেই। হেমনাথের সঙ্গে তাঁর মিলমিশের কোন বালাই থাকবে না। হেমনাথেরও অস্বস্তি থাকবে না। তারপর সাহানা সেরে উঠুক—তখন দেশত্যাগের কথাটা ফের ভাবা যাবে। নুরু বোনের দায়িত্ব নিলে আর সমস্যা কিসের?...শেষ অব্দি আফজল ভেবে ঠিক করলেন, পাকিস্তান যাবেন না। নুরু রুবির বিয়ে লাগাক। তখন স্বামী স্ত্রী গিয়ে কাজটা চুকিয়ে ফিরে আসবেন কুসুমগঞ্জ। রুবি ঘর-সংসার করবে। কাচ্চাবাচ্চা হবে মন্দ কি। তবে নুরু যদি ওকে আরও পড়াতে চায়—সেও উত্তম প্রস্তাব। সাহানা মেয়েকে ছেড়ে থাকতে না চায়, মাঝে মাঝে গিয়ে থাকবে। বর্ডার পেরোতে খুব একটা অসুবিধে নেই। কিংবা সাহানা যদি তাঁকে ছেড়েই বরাবর ওখানে থাকতে চায়, থাকবে। হ্যাঁ, তাতে কষ্ট হবে আফজলের। এই বয়সেও শয্যায় স্ত্রী না থাকলে তাঁকে বোবায় ধরে। তখন...

কথাটা খুলে হেমনাথকে একদিন বলে ফেললেন আফজল। শেষে রসিকতা করে বললেন, তবে কী জানো হে কায়েত, আমাদের ধর্মে সে ব্যবস্থাও করা আছে। আমাদের নবীসাহেবের 'ছুন্নত' (হজরত মোহাম্মদ যে কাজগুলো করেছেন, অথচ স্পষ্ট নির্দেশ নেই কোরানে—সেগুলো অনুসরণে নাম ছুন্নত।) মেনে চললেই হবে।

হেমনাথ কথাটা টের পেলেন—দীর্ঘকালের সাহচর্যে অনেক মুসলিম প্রথা বা প্রথাসিদ্ধ কৌতুক তাঁর পরিচিত। তিনি হো হো করে হেসে ফেললেন।…সে তো হাসির মা বুড়ি আছেই তোমার।

আফজল বললেন, তৌবা! ও আজরাইলের (মৃত্যুদূতের) অরুচি। তবে জানো হেম, হুজুর পয়গম্বরসায়েব অনেক গরীবগুরবো দুঃখিনীর শেষ বয়সের ব্যবস্থা করে রেখে গেছেন। তিনি নিজেও দয়া করে এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে নিকাহ করেছিলেন। (জোর হেসে)…অবশ্যি, এ কম্ম করে ফেললে উটকো বিপদ ঘাড়ে এসে পড়বে। তখন তোমার সেবা সে করবে, না তুমি তার সেবা করবে, তাই ছাখো। হাঃ হাঃ হাঃ!

এইসব রসিকতায় হেমনাথও বেশ ভারমুক্ত হলেন। রুবি পাকিস্তানে চলে গেলে লোকের মুখে ছাই পড়বে। তিনিও বিরাট নিষ্কৃতি পাবেন। ব্রীজ থেকে ফেরার পথে তিনি আরও জোর দিয়ে বললেন, প্রস্তাবটা ভালো হে খাঁ। নুরু ওকে বরং কলেজে ভর্তি করে দিক। পাস করে বেরোলে তখন আর ভাবনা কিসের? ওখানে তো তোমাদেরই রাজত্ব—চাকরী পেতে অসুবিধে হবে না। তার ওপর এমন বুদ্ধিমতী মেয়ে—চেহারা-স্বাস্থ্যও ভাল। লুফে নেবে হে, দেখে নিও।

আফজল বন্ধুর দিকে সগর্বে তাকালেন—আবছা অন্ধকার তখন। হয়তো হেমনাথের মুখটা তাঁর স্পষ্ট দেখে নেবার ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু তারপরই একটা অসচেতন দীর্ঘশ্বাস নামল আফজলের বুক থেকে। বললেন হেম, ও চাকরী পাক না পাক, পড়াশোনা চুলোয় যাক, অন্তত তুমি তো বেঁচে যাবে ভাই। লোকে তোমাকে কীসব বলছে-টলছে আমারও কানে আসে।

হেমনাথ বললেন, বলুক, বলতে দাও। অবস্থা হীন বলেই বলা সাজছে। হতুম যদি বড় ঘরের মানুষ—বলতে পারত? প্রভাত মুখুয্যের ছোটভাই এক মাদ্রাজী খৃষ্টান মেয়েকে নাকি বিয়ে করেছে। কলকাতায় থাকে। মিলিটারী ডাক্তার। শুনেছ? গত পুজোয়

বউকে নিয়ে দেশে এল। প্রভাতের বাড়ি কত ধুমধাম হল। গাড়ি করে ভায়ের বউকে নিয়ে প্রভাত নিজে ঘুরে বেড়াল। ওর বাড়ির ছেলেমেয়েরা কালকুট্টি মেমসাজা ছুঁড়িটাকে নিয়ে হেথাহোথা সবার সামনে ঘুরল। পিকনিক করল। তার বেলা? কী দর্প হে! যেন দেবরাজের কোন অপ্সরা পেয়ে গেছে। আর—

আফজল ওঁকে থামতে দেখে তীব্র কৌতূহলে বললেন, আর?

হেম পরিতাপে মাথা নেড়ে বললেন, ছেড়ে দাও। আসলে হয়েছে কী জানো, দুশো বছর ধরে সায়েবরা দেশটা শাসন করে গেছে—'সভ্য' করে দিয়েছে—নানান যন্তরমন্তর দিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। ওরা ছিল খৃষ্টান। কাজেই বুঝতেই পারছ, অন্তত খাঁটি মেম না হোক, দিশি হলেও লোকে বুক ফুলিয়ে বলতে পারবে—রাজার জাতের জাত মেরেছি। সায়েব হয়েছি। চাকরের মনোভাব। ধুর, ধুর।

আফজল টের পাচ্ছিলেন, হেমনাথ কী অনুক্ত রাখছেন। কিন্তু সেটা খুঁচিয়ে আর ঘা বিষিয়ে দিতে চাইলেন না। সকৌতুকে বললেন, পরম বোষ্টম হয়ে এ কী বুলি হে কায়েত! এঁ্যা?

অপ্রতিভ হলেন না হেমনাথ। ...তা যদি বলো, আমার ঠাকুর শ্রীচৈতন্যের কাছে ওসব জাতবেজাত বলে কিছু ছিল না। সবাই মানুষ—ঈশ্বরের জীব। তবে কী জানো, মানুষ বড় সংস্কারান্ধ হয়ে আছে। সমাজ মানেই তো সংস্কারের গিঁট। এক সময় গায়ে জোর ছিল, রক্ত তাজা ছিল—সব অস্বীকার করেছি। আজ তো তা নেই। নয়তো...

আফজল অসমাপ্ত বাক্যটা আর সমাপ্ত করতে দিলেন না। বললেন, মরুক গে। গঞ্জনা আমাকেও কম শুনতে হচ্ছে না। ঠাট্টার চোটে কান গরম হয়ে উঠছে। লতিফ কাজীর একটুখানি মৌলবী-মৌলবী ভাবসাব আছে। সেদিন কী বলছে জানো?

অন্যমনস্ক হেমনাথ বললেন, উঁ?

খ্যাল করে শোন। কথাটা ভারি মজার হে। আমি শালা একেবারে নিম্-মোছলমান মাইরি! কথাটা জানতুম না।...আফজলের

কণ্ঠস্বরে দূর অতীতের তুখোড় যুবকটি কথা বলছিল।···মুসলমানের সঙ্গে যদি কোন অমুসলমানের বে হয়, আর সে যদি 'আহলুল কেতাব' বা গ্রন্থধারী আদি ধর্মের লোক হয়, তাহলে তাকে কলমা পড়িয়ে মুসলমান না করলেও চলে। 'আহলুল কেতাব' কোন্ ধর্ম জানো? যাদের ওপর খোদাতালা কেতাব পাঠিয়েছেন—যেমন, খ্রীষ্টান-ইহুদী। আমার ছেলে-মেয়ে কোন খ্রীষ্টান বা ইহুদী বিয়ে করলে কারো নিজের ধর্ম ছাড়বার দরকার নেই। যে-যার ধর্ম মানবে আর ঘর-সংসার করবে। বাচ্চা বিয়োবে। দিব্যি চলবে সব। লতিফ ঠাট্টা করে বললে, তোমার যে বড্ড মুসকিল খাঁসায়েব—ইয়ে—ওরা তো আহলুল কেতাব নয়। তা না হলে···

আফজল হা হা করে হেসে ফের বললেন, রাগ করিস্ নি কায়েত। আম্মো তামাসা করে বললুম, বা রে বা! সেটা কি কথা হল? আল্লার এত বড় দুনিয়া—তার মধ্যে এই ইণ্ডিয়া। ভূমণ্ডলের ম্যাপখানা খুলে দ্যাখো দিকি কাজীসায়েব! এত বড় দেশটা—ছত্রিশ কোটি লোক বসবাস করে। সব জায়গায় সব জেতের কাছে খোদার কেতাব গেল, আর এখানে এল না—এ হতেই পারে না। আলবাৎ এয়েছে কেতাব। তা কাজী গুম হয়ে বললে, কী কেতাব এয়েছে শুনি? আমি বলে দিলুম, কেন? বেদ! বেদ এয়েছে। শুনে কাজী প্রথমটা গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়লে। কী রে হেম? কথাটা উড়িয়ে দিতে পারে কেউ?

হেমনাথ হেসে ফেললেন।

আফজল বললেন, শালাকে ধাঁধায় ফেলে দিলুম মাইরি। জবাব দিতে পারে না। আমি শালা খ'য়ে খচ্চর না থাঁয়ে খচ্চর—ইস্কুলে সব কী বলত মনে আছে তোর? নে—জবাব দে। তো খানিক গুম হয়ে থেকে কাজীর বাচ্চা যেন আসমান হাতড়ে কথা পয়দা করলে। হঠাৎ শালা লাফিয়ে উঠে বললে, ফজু, (আফজলের ছেলেবেলার ডাকনাম) আমি তোর মেয়ের বে পড়াব।···জোর তামাসা জমে গেল। বুক ফুলিয়ে বললুম, আসিস। দাওৎ (নেমন্তন্ন) রইল। অমনি, মাইরি হেম, কসাইটা বুকে ছুরি চালিয়ে দিলে হে।

হেমনাথ সকৌতুকে বললেন, কী করল ?

আফজল নার্ভাস হেসে জবাব দিলেন, শুনবে ? রাগ করোন ভাই। আম্মা যখন রাগেনি, তুমিই বা রাগবে কেন ? কাজী বললে কিন্তু ওরা মোছলমানের মেয়ে নেবেই না। মুয়ে (মুখে) পেচ্ছা করে দেবে !...উঃ ! কী সাংঘাতিক কথা !

হেমনাথ অপ্রস্তুত। সতর্ক হলেন। দুজনেই যেন একটা সীম পেরিয়ে অসাবধানে লুকোচুরি খেলছিলেন। এটা সঙ্গত ছিল না গলা ঝেড়ে বললেন, ছেড়ে দে ভাই। মেয়ে তো চলেই যাচ্ছে তখন আর এসব নিয়ে মাথাব্যথার কী লাভ ?

আফজলও সতর্ক এদিকে। ভুল পায়ে অনেকখানি আসা গেছে ফেরা দরকার। বললেন, হ্যাঁ—যা হয় না—হবে না, তা নিয়ে বে লাভ নেই। একটু তামাসা করলুম আর কী ! হ্যাঁ রে, আর খৈনি খাস্ নে ?

—নাঃ। কবে ছেড়েছি সব।

এমনি জানতে ইচ্ছে হল।

তুই এক সময় তামাক খেতিস, ফজু।

আর ভাল্লাগে না।

হ্যাঁ, আবার কী ! যৌবনটা গোল্লায় দিয়েছি দুজনে। এখন ঈশ্বর সম্বল।

আফজল কতকটা নিজের মনেই বললেন, খোদা ভরসা।

মায়ের বুকের ব্যথাটা আরও বেড়ে গেছে। কোন ওষুধেই কাজ হচ্ছে না। রুবি হাসপাতাল থেকে উদ্বিগ্নমুখে বাড়ি ফিরল সেই সন্ধ্যায়। ফিরেই অবাক হল সে। মুরুভাই এসে গেছে।

খুশিতে দুলে উঠল তার মন। দৌড়ে এসে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল মুরুর ওপর।...দাদা, কখন এলে ? ইস্, আমি এদিকে ভেবে সারা...

নুরু হেসে বলল, ফের দাদা বলছিস যে বুড়ি! এখনও ছাড়িস নি দেখছি!

রুবিকে সে বুড়ি বলেই ডাকে ছেলেবেলা থেকে। রুবি বলে দাদা। এজন্যে অনেক গালমন্দ খেতে হয়েছে—কিন্তু অভ্যাস ছাড়েনি। সে কান করল না এ প্রসঙ্গে। বলল, সত্যি তোমার কথা খুব ভাবছিলুম। মায়ের অবস্থা দেখে ভালো লাগছে না। এসে এত ভাল করেছ। হাতমুখ ধোওয়া হয়েছে? ও হাসির মা, হাসির মা! শীগগির পানি দাও তো!…

রুবির ব্যস্ততা দেখে নুরু বলল, থাম্। ব্যস্ত হোস নে। আগে তোর খবর বল্।

আমার খবর আর কী! বেশ তো আছি।

নুরু একটু হাসল।…ঝুনুরা এ বাড়ি আসে না? তুই না—তুই একটা ক্ষুদে শয়তান বুড়ি। বুঝলি? তাক লাগিয়ে দিয়েছিস না রে!

রুবি রাগ করে বলল, সে তো জানিই বাবা। একথা ইনিয়ে-বিনিয়ে একশো করে লেখা হয়েছে। জেনেশুনেই তো এসেছ শাস্তিটাস্তি দিতে। দাও না। পাওনা যা—নিতেই হবে।

নুরু—আরও হেসে ফেলল।…জব্বর শাস্তি তোর পাওনা। বুঝলি? তবে সে সব হচ্ছেখন। দেশের হালচাল কিছু বল্। সব কে কেমন আছে—কে কী করছে।

রুবি জবাব না দিয়ে এক লাফে উঁচু বারান্দা থেকে নামল। হাসির মা জল তুলছিল ইঁদারা থেকে। বালতিটা কেড়ে নিয়ে বলল, কিছু খাবারটাবার করো।

শুনে নুরু বলল, কিছু না। একবারে ভাত খাবো। কী রেঁধেছ হাসির মা? নাকি বুড়ি রেঁধেছে!

হাসির মা বলল, হুঁ, তাহলেই হয়েছে! ওবেলা ডালটা দেখতে বলে দোকান গেলুম লঙ্কা আনতে—ফুরিয়ে গেছিল। আর তো বাবা গিন্নি নেই ঘরে যে কী আছে-না-আছে গেরস্থালীতে দেখবেন। তা, অম্মা! ফিরে এসে দেখি, মেয়ে ডাল পুড়িয়ে কালকুট্টি করে ফেলেছে।

রুবি ধমক দিল, এদিকে আলো দেখাও তো! গল্প পরে হবে।

নুরু বলল, কিন্তু বেশ তো গিন্নিপনা দেখাচ্ছে! নাঃ, হাসির মা মিথ্যে বলছে।...

ঘরের ছেলে ঘরে ফিরলে সংসারটা উতরোল করে খুসির হাওয়া বয়ে চলে। তাতে রোজগেরে ছেলে। কত কী সব নিয়ে আসে। এবারও এনেছে। কাপড়-চোপড় স্নো-সাবান কত কী। চা খেতে খেতে নুরু হেরিকেনের আলোয় সব বের করছিল সুটকেস থেকে।

হঠাৎ রুবি অবাক হয়ে বলল, আমার শাড়ি কই? সালোয়ার উড়নি কে পরবে?

নুরু অপ্রস্তুত হেসে বলল, তুই পরবি। পরতে দোষ কিসের? আজকাল তো সবাই পরছে।

রুবি মুখ ঘুরিয়ে বলল, ধ্যুৎ! ও তুমি ভাবীর জন্যে রেখে দাও।

ভাবীটাবী হোক্। তারপর তো!...নুরু সকৌতুকে বলল।

আমি বাবা ওসব মুসলমানী পোশাক পরব না!

দ্যাখ রুবি, যাই ভাব্, যাই কর, তুই কিন্তু আসলে মুসলমান। সে শাড়িই পর, আর মেমসায়েবের মতো গাউনই পর।...নুরু একটু ক্ষুব্ধ হয়ে বলল।...যাক্ গে। হ্যাঁ রে, এখন হাসপাতালে ঢুকতে দেবে? মাকে দেখে আসতুম। ষ্টাফ আগে যারা ছিল, তারাই আছে—না নতুন?

রুবি গম্ভীর হয়ে বলল, আগেরও আছে। নার্স রমাদি আছে। সিস্টার নতুন। চলো—আমিও সঙ্গে যাচ্ছি।

নুরু—লুঙি ছেড়ে প্যাণ্ট শার্ট পরতে ব্যস্ত হল। জিনিসগুলো বিছানার ওপর ছড়ানো। রুবি গোছাতে গিয়ে গোছাল না। এক ঝুড়ি ফল এনেছে নুরু। রুবি বলল, এসব কে খাবে? মায়ের জন্যে তো?

নুরু বলল, মা মেয়ে দুজনেই খাবে। কিছু নে। প্ল্যাস্টিকের ঝুড়ি নেই?

আছে।...

ছুজনে বেরুতে যাচ্ছে, সেই সময় আফজল এলেন। পথেই খবরটা শুনেছেন। হাঁফাতে হাঁফাতে দৌড়ে এসেছেন।...কই, নুরু কোথা? নুরু, অ নুরু!

ছেলে বাবার পায়ে 'কদমবুসি' করবার জন্য হেঁট হতেই আফজল তাকে বুকে জড়িয়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন।...আজ আমার জান ফুলে একহাত হল বাবা! ওরে! আমি আর আমি নেই রে —জাহান্নামে জ্বলছি পুড়ছি। ওরে, সবাই ভেবেছিল, আমার কেউ নেই!

নুরু বাবার কাণ্ড দেখে অপ্রস্তুত হয়েছিল। সামলে নিয়ে বলল, ছিঃ কাঁদবেন না। কাঁদবেন কেন? আমি তো আছি।

অ রুবি, ভাইকে কী খাওয়ালি? কদ্দুর থেকে আসছে রে— সে কী এখানে? হ্যাঁ রে খোকা, দেশটা বেশ ভালো—না? এমন হারামী খচ্চরের বাস নেই—সুখে-স্বচ্ছন্দে আছে সব—না? এ কুসুমগঞ্জ কি জায়গা রে বাবা? শয়তানের গুয়ে ভরতি। ছ্যাঃ ছ্যাঃ!

রুবি বলল, আমরা হাসপাতালে যাচ্ছি।

অ। তা—তুই থাক। আমিই যাই। নুরু, চল্, বাপব্যাটায় মিলে যাই।...রুবি, আজ তো গোস্তটোস্ত নেই। কী দিবি নুরুকে? বুঝলি বাবা, তোর মাও গেছে—আম্মো খাওয়া-দাওয়া ভুলেছি। ডালভাত আলু করে খাচ্ছি। অ রুবি, মুরগী আণ্ডা পাড়েনি আজ?

রুবি বলল, সে তো ছুপুরে হল।

তাই বুঝি! তাহলে হাসির মাকে বল্, সেখপাড়া থেকে আণ্ডা আনুক।

রুবি নিঃসঙ্কোচে বলল, আমার কাছে পয়সা নেই।

কেন? ছুটো টাকা দিলুম যে সকালবেলা? সব শেষ!... আফজল হাসলেন। তুই যে তোর মায়ের চেয়েও এককাঠি সরেস রে!...বলে পকেটে হাত ঢোকালেন।

রুবি বললে, হিসেব নাও না! লিখে রেখেছি।

আফজল পকেট থেকে কিছু খুচরা পয়সা বের করে বললেন, নে। কম পড়ে তো ধারে আনবে'খন। রেতের বেলা আর টাকা ভাঙিয়ে কাজ নেই।

নুরু বলল, আব্বা, সুরেশ বাবুর হাতে টাকা পাঠিয়েছিলুম দুশো। পেয়েছেন তো?

আফজল সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন, হুঁ। চল্ বাবা, রাত হয়ে যাচ্ছে।

পিছন থেকে রুবি বলল, পেয়েছেন—খরচও করে ফেলেছেন। একগাদা করে ধার হয়েছিল লোকের। কদ্দিন ফেলে রাখবে তারা? এ্যাদ্দিন বাইরে ছিলুম, টের পাইনি কিছু। এখন মা নেই ঘরে—সব জানতে পারছি। কী সংসার না চলছে!

হাসির মা সেই সুযোগে বলে দিল, সেখপাড়ায় ধার-টার দেবে না রেতের বেলা। মাগীরা বড্ড কড়া বাপু। মুখ লষ্ট হবে মাত্তর!

আফজল ধমকে উঠলেন।···খুব ধারি যে সেখদের!

নুরু বলল, রুবি—এই টাকাগুলো রাখ।

আফজল লোভার্ত চোখে তাকালেন মাত্র।

সে রাতে রুবির ঘুম আসছিল না। নুরুভাই সালোয়ার পাঞ্জাবী উড়নি কেন আনল, বুঝতে পারছিল না সে। গভীর অস্বস্তিতে ছটফট করছিল সে। বাইরের বারান্দায় ওরা বাপব্যাটা শুয়ে কথা বলছিল। দরজা বন্ধ থাকায় অস্পষ্টভাবে কানে আসছিল কথাগুলো। কিন্তু গরমে পচে মরলেও তো দরজা খুলে রাখার যো নেই। যুবতী মেয়ে। তার ওপর নানান গুজব। রুবিকেও তো আর বিশ্বাস করা যায় না।

কান পেতে রুবি টের পাচ্ছিল, বাইরে পরস্পর বেশ তর্কাতর্কি হচ্ছে চাপা স্বরে। এটা অবশ্য নতুন নয়। খরুচে স্বভাবের জন্যে নুরু বাবাকে চাকরীর টাকা পাঠানোর পর থেকে বেশ গঞ্জনা ছায়। না—

তার দোষ নেই। বেচারার পক্ষে কত টাকা পাঠানো সম্ভব? তার নিজের খরচ আছে সেখানে। এমন কিছু অঢেল মাইনে পায় না।

হ্যাঁ, সেই নিয়েই বচসা। রুবি অন্য কথা ভাবতে থাকল। ঝুনু ফাঁক পেলেই চুপিচুপি এবাড়ি আসে। কবীরও আসে। ওরা যেন বেপরোয়া হয়ে উঠেছে ক্রমশঃ। কিন্তু স্নুনুদার হল কী? ভারি গম্ভীর আর নির্লিপ্ত সে। জানালার দিকেও চোখ তুলে তাকায় না আর। প্রথম-প্রথম রাগ হত, এখন কষ্ট হয়। দুঃখ লাগে। অভিমানে চোখ ফেটে কান্না আসে। কেন তুমি তাহলে আমাকে চুমু খেয়েছিলে? বুঝেছি, সব তোমার বদমাইসি। একটা হাবাগোবা মেয়েকে পেয়েছিলে, মজা লুটবে—তারপর গা বাঁচিয়ে নিরাপদে কেটে পড়বে। বিশ্বাসঘাতক! স্বার্থপর! আর তোমার কথা ভাবব না! ভাববই না।...

কিন্তু স্মৃতি—স্মৃতি বড় দুষমন। স্মৃতির এক হাতে বেহেশত্‌ অন্য হাতে জাহান্নামে। তার এক হাতে জেব্রিলের মাটি—যা দিয়ে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছিলেন, অন্য হাতে ইস্রাফিলের শিঙ্গা—যার আওয়াজে সৃষ্টি বিধ্বস্ত হয়।

কিংবা স্মৃতি নদনদীর মতো—মৃত্যুর সাগরগামী। এককুলে তাকিয়ে দেখি ভরে উঠেছে উর্বরতা—শস্যসম্ভার-সমৃদ্ধ জনপদ—কত ঐশ্বর্য। অন্যদিকে শুধু ভয়ঙ্কর ভাঙন। সব ভেঙেচুরে পড়ে গেছে।

রুবির স্মৃতির দিকে অসহায় তাকিয়ে থাকে!......

হঠাৎ আফজলের কথা কানে এল রুবির। তাকে নিয়েই এবার কথা হচ্ছে। উঠে গিয়ে অন্ধকারে দরজার কপাটের ফাঁকে কান পাতল সে রুদ্ধশ্বাসে।

...তোমার মায়ের কথা আবার কথা? ছেড়ে দাও। যা বলেছি, তাই করো বাপু। এসেছ যখন নিতে—নিয়েই যাও। মা সেরে উঠলে গিয়ে দেখে আসবেন। এর মধ্যে বলা যায় না—আজকালকার মেয়ে সব, কিছু বিশ্বাস নেই। কী করে বসলেই হল! ঠেকাচ্ছে কে? আমি হাজার তালে ঘুরে বেড়াচ্ছি। চোখে-চোখে রাখবেই বা কে—

আর রেখেই বা কি হবে? গাইবাছুরে ভাব থাকলে তোমার গে বনে গিয়ে দুধ দেবে। বুঝলে না কথাটা? ওঁরা হিঁদুর ছেলে—বড্ড চালাক। মজা লুটে নিয়ে কেটে পড়বে। হেমকে আমি দেখছি না? কত সর্বনাশ করেছে কতজনের। আরে বাবা, তুমি এখন লায়েক হয়েছ। তুমি ছেলেও বটে—দোস্তের সমানও বটে। হক্ কথা বলব —তাতে শরম কী? ওই হেম—বুঝেছ বাপ নুরু? হেম মোছলমানও কি বাদ দিয়েছে নাকি? ও পাড়ার সেই একচোখো পান্নার মাকে মনে আছে? সেই যে—সে…ই লাইনে মাথা দিলে! মনে পড়ছে না? পড়বে না। তখন তোমার বয়েস আর কত? সাত কি আট। তা বুঝলে? কেন সোমত্ত মেয়ে লাইনে মাথা দিলে জানো? …আফজলের কণ্ঠস্বর আরও চাপা হল।…আজ হেম পরম হিঁদু বোষ্টম হয়েছে। বন্ধু মানুষ। সব পেটে রেখেছি বাবা।…মায়মুনা কানীর পেটে বাচ্চা এসে গিয়েছিল। সে হেমকে শাসালে। সাতকুড়ি টাকা দাও—আর এটার ব্যবস্থা করে দাও। নয় তো ঢিঢি ফেলে দোব। হেম করলে কী, চাকরী খোঁজার ছলে কলকাতা পালিয়ে রইল তিন মাস। মেয়েটা একদিন মনের দুঃখে…যাক্ গে। বলবে, জানের বন্ধুর খিটকেল করছি কেন। আরে বাবা, সাধে কি করছি?

নুরু বিরক্ত হয়ে বলল, আঃ, চুপ করুন তো।

না বাবা। তোমার মায়ের কথা ধরো না। কবে সেরেটেরে বাড়ি আসবে—তারপর রুবি যাবে, সে একযুগের ব্যাপার। তুমি এসেছ কথামতো—আর দোনামোনা করো না। নিয়ে যাও। সেও বাঁচুক, আমরাও বাঁচি।

নুরু বলল, মাত্র তিনদিনের ভিসা। তারপর তো যেতে হচ্ছে। দেখা যাক্—বরং মাকে বুঝিয়ে বলা যাবে। আমারও ইচ্ছে নেই যে রুবি এখানে আর একটি দিনও থাকে। স্টেশনে জয়নালের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। যা বলল, শুনে তো খুব ভয় হল। হিন্দুরা জোট পাকাচ্ছে নাকি। এদিকে আরেক কাণ্ড শুনে তো আরও ভয় পেলুম।

কী, কী, আবার কী শুনেছ?

ঝুনুর সঙ্গে নাকি কবীরকে জড়িয়ে কী সব হচ্ছে। নাকি আমাদের বাড়িতে এসবের ঘাঁটি।

আফজল চাপা গর্জে উঠলেন—সব তোমার ওই চৌধুরীর ব্যাটা আকবর করছে। এ আমি হলফ করে বলতে পারি। ওঃ! ওরে আমার চাঁদু! সেখের ঘরে আমি মেয়ে দোব ভেবেছ? আবার উল্টে আমার খান্দানকে ওই চৌধুরীর বউ মাগী কী বলে জানো? (মুখ ভেংচে বিকৃত স্বরে চৌধুরীগিন্নিকে অনুকরণ করে)…হুঁ—ওনারা তো পাঠান। আমাদের চে'ও জেতে খাটো। মুয়ে ঝাঁটা মারবার লোক নেই গা? নিজের পাছার কাপড় তুলে ত্যাখ গে কুত্তীন মাগী কাঁহেকা!

নুরু বলল, আঃ, ঘুমোন না। রাত হয়েছে।

হ্যাঁ, তুমি আবার অনেক দূর থেকে এয়েছ। পেরেসান (ক্লান্ত)। ঘুমোও।

এক মিনিটের মধ্যেই আফজলের নাক ডাকার শব্দ শোনা গেল।…

রুবি টের পেল, তার গা চুইয়ে কাপড় ভিজেছে। তারপর পা গড়িয়ে ঘাম পড়েছে মেঝেয়। বুকে খিল ধরে গেছে। শরীর হয়েছে ভীষণ একটা বোঝা। অনেক কষ্টে সে সরে এল। বিছানায় বসল। তখনও থরথর করে কাঁপছিল সে।

আকাশ ফাটিয়ে কাঁদবার ইচ্ছে হল তার। পারল না। কাঁদা অসম্ভব। ত্রাস নয়, বিস্ময়—এবং দুঃখ নয়, ক্রোধ—অবশেষে তাকে ঝাঁকুনি দিচ্ছে। রি রি করে জ্বলতে লেগেছে সারা দেহ মন। অস্ফুট স্বরে বেরিয়ে গেল তার কাঁপন্ত ঠোঁট থেকে—কুত্তার বাচ্চারা!

তেরো

গঙ্গার ধারে বাঁধের ওপর সাইকেলে আস্তে আস্তে যাচ্ছিল কবীর। বিকেলের দিকে তখন কুঠিবাড়ির জঙ্গলে পরিপূর্ণ নির্জনতা।

পাশেই ম্যুনিসিপ্যালিটির মেথরেরা আবর্জনা ফেলে যায়। তার ওপর জঙ্গল এবং সাপের আস্তানা। তাই ওদিকে কেউ বিনা কাজে পা বাড়ায় না।

পাখি ডাকছিল। লালচে রোদে ভরে ছিল সারা প্রকৃতিজগত। হাওয়া বইছিল অল্প অল্প। আর এই তো ভালোবাসার ঋতু। পাখিদের ঠোঁটে খড়কুটো। নির্জন বনে সাপেরাও জোড় বাঁধে। ঘাসফড়িঙেরাও সঙ্গ খোঁজে। প্রজাপতিরা ডিম পাড়ে গাছের ফাটলে।

বাঁধের ওপর থেকে কবীর দেখল, ঝুনু এসে গেছে। বিহ্বলতায় দুলে উঠল সে। কথা রেখেছে ঝুনু। বিস্ময় তার খুশিকে নাড়া দিচ্ছিল। ভাবতে পারে নি, সত্যি সত্যি এসে যাবে। এর আগেও অনেকবার দুজনের এমন 'রেঁদেভু' ঠিক করা হয়েছে—দুজনেই এসেছে। কিন্তু আজ এই আসার মধ্যে ভিন্ন কিছু ছিল। একটা দারুণ আবেগ কাজ করছিল যেন দুজনেরই মনে। এমন করে নির্জন জঙ্গলে পরস্পর চলে আসা—কিছু কি ঘটবে আজ? গুরুতর—কিন্তু গভীরতর সুখের?

ঝোপের আড়ালে সাইকেল শুইয়ে রেখে কবীর এগোল। ঝুনু দূর থেকে তাকে দেখতে পেয়েছিল। কবীর কাছে গিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখছিল। ঝুনু তার পাজামার নীচেটা ধরে টানল। বলল, কী দেখছ অত? কেউ নেই।

কবীর বসল।...এলেই বা কী?

ইস্! কী বীরপুরুষ!

আমরা তো কোন অন্যায় করছি নে।

আজ্ঞে না। কিচ্ছু না। ডুবু বাটু খাচ্ছি!

কবীর হেসে উঠল।...খাওয়াবে নাকি?

ঝুনু একটু সরে বসে বলল, অনেক দেরী হবে। নুরুদা এসেছে শুনেছ?

হ্যাঁ। রুবিকে নিয়ে যাবে।

মেয়েটার জন্যে কষ্ট হচ্ছে। ও বাঁচবে না।

তোমার দাদাও কি বাঁচবে?

দাদার কথা ছেড়ে দাও। দাদা না হাঁদা। সাধু-সন্ন্যেসীরাও ওর চেয়ে বুদ্ধিমান।

ঝুনু!

উঁ?

আসতে পারলে? ভেবেছিলুম, অন্তত এখানে আসতে চাইবে না।

কেন? খেয়ে ফেলবে নাকি—এলে?

ছেলেদের অত বিশ্বাস করো না। ঠকে যাবে।

কী করবে শুনি?

কবীর সাহস পেয়ে ওর দিকে হাত বাড়িয়ে বলল—এই, এমনি করে ধরে···

ঝুনু সবেগে সরে গিয়ে বলল, যাঃ! অত অসভ্য কেন তুমি?

কবীর কাঁচু-মাচু হাসল। ···না, এমনি দেখাচ্ছিলুম।

হঠাৎ দুলে উঠে ঝুনু বলল, এই! আমরা যদি সুনীল-মঞ্জুর মতো তুই তোকারি করি, কেমন হয়?

করে ফ্যাল্।

কবীর, তুই আজ কী দিয়ে ভাত খেয়েছিস রে? পরক্ষণে দুজনে একসঙ্গে হেসে উঠল। তারপর ঝুনু ফের বলল, বেশ নতুন-নতুন লাগছিল কিন্তু।

ভালো তো। চালিয়ে যাই, আয়। হ্যাঁ রে ঝুনু···

হ্যাঁ রে কব্‌রে···

এই! ওকি বলছিস্?

তুই যে ঝুনু বলছিস—অমন সুন্দর নামটা—ঝর্ণাধারা। শ্রীমতী—থুড়ি—কুমারী ঝর্ণাধারা ঘোষ।

আমার নামটা কি খারাপ? কাজী কবীরউদ্দিন আহম্মদ।

যাঃ, বড্ড বিদ্‌ঘুটে। কবীর, তোকে বরং ছোট্ট নাম দিই—কবি।

বাঃ!

আচ্ছা কবি, বিদ্রোহী কবি নজরুলও তো কাজী—তোদের মতো কবি নজরুলের বউ হিন্দু—তাই না?

কবীর মিটিমিটি হেসে বলল, হুঁ।

ঝুনু হিসেবের ভঙ্গীতে বলল, স্বামী মুসলমান, স্ত্রী হিন্দু—বেশ। তাহলে তাদের ছেলেপুলেরা কী হবে? হিন্দু, না মুসলমান?

কবীর মুহূর্তে সিরিয়াস হয়ে বলল, হিন্দু মুসলমান আবার কী? স্রেফ মানুষ। তবে যার যে ধর্মটায় বিশ্বাস হবে, তাই নেবে। ওটা কোন সমস্যাই নয়। ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার।

ঝুনু বলল, তুমি—থুড়ি, তুই, অনেকটা এগিয়ে এসেছিস। কন্তু। সরে বোস্।

মোটেও না। তুই এগিয়েছিস।

ঠিক আছে। মধ্যে এই কাঠিটা রাখলুম। গণ্ডী কিন্তু। সাবধান!

কিছুক্ষণ চুপচাপ দুজনে। তারপর কবীর পকেটে হাত ভরে অস্ফুট স্বরে বলল, একটা সিগ্রেট খাব?

ঝুনু অন্যমনস্ক ছিল। চমকে বললে, কী খাবি বললি?

সিগ্রেট। তোর আবার গন্ধ শুঁকলে বমি আসে নাকি। শুল্! কী ভেবেছিলি রে?

ঝুনু লাল গালটা ফিরিয়ে বলল, কিছু না।

আমি বলতে পারি।

যাঃ। শুধু অসভ্যতা।

ঝুনু, আমরা কি সত্যি সত্যি যা সব করছি—একেই প্রেম-ট্রেম বলে?

কে জানে। আমরা কিন্তু প্রেমট্রেম করছি নে।

ফের স্তব্ধতা। সাবধানে মুখ ঘুরিয়ে সিগ্রেট টানছিল কবীর। ঝুনু পায়ের কাছে একটা শুকনো কাঠি ভাঙছিল।

ঝুনু!

উঁ?

স্তব্ধতা। রোদ মুছে ধীরে—অতি ধীরে একটা পরিব্যাপ্ত ধূসরতা ঘনাচ্ছিল। দুর্গম হয়ে উঠছিল স্থাবরজঙ্গমসমাবৃত ঈশ্বরের বিপুল চরাচর। দিগন্তে প্রকাশিত হচ্ছিল একটা নিঃশব্দ নক্ষত্র—

যেন আকাশের দরজা খুলে ঈশ্বর এসে দাঁড়ালেন, কিন্তু তাঁকে দেখা গেল না—বোঝা গেল ওই তাঁর স্মিত সুন্দর হাসিটি।

আর সেই সময় পাখিগুলো ডেকে উঠল জোরে। ডাকতে ডাকতে গঙ্গা পেরিয়ে এসে গেল একদল শালিখ। ধূসর বালির চর থেকে ঘুরপাক খেতে খেতে একটা হাওয়া উঠে এল এদিকে। ঝোপঝাড় দুলতে থাকল। বাঁধের ঝাউগাছগুলো শন শন শব্দে মর্মরিত হল। সন্ধ্যার পৃথিবী শিহরিত হতে থাকল বারবার। দূরের মসজিদের উঁচু ছাদে দাঁড়িয়ে কে আজান দিল। ঘণ্টা বাজতে থাকল দেবী সিংহবাহিনীর মন্দিরে।

কবার ডাকল, ঝুনু!

উঁ?

তোকে একবার চুমু খাবো?

উঁ—না!

কোনদিন তোকে পাব কি না জানিনে—না পেলে বড় দুঃখ থেকে যাবে ঝুন্!

কী বললি?

ঝুন্, আমার ঝুনঝুন!

এবং সেই নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে একটি মেয়ের চোখ দুটি যখন বুজে গেছে, সমর্পিত মৌন দুটো ঠোঁটের ওপর একটি ছেলের দুটি ঠোঁটের চাপ কিছুক্ষণের জন্যে ভালবাসার সত্যকে প্রকাশ করে গেল। সেই কিছুক্ষণের জন্যে ওদের দুজনের পৃথিবীতে হিন্দু ছিল না, মুসলিম ছিল না—ধর্মাধর্ম পাপপুণ্য শুভাশুভের বাইরে পৌঁছে ওরা দেখতে পেল মানুষের রক্তের অন্তর্গত গভীরতম সত্যটিকে। যে সত্য থেকে একটি পরম স্বাধীনতার আবির্ভাব হয় এবং যে-স্বাধীনতায় সূর্য বিকিরীত করে নিজেকে, জড় থেকে চেতনা আসে, পৃথিবীতে আসে প্রাণীসমূহ এবং উদ্ভিদ, ফুল ফল বীজ ঋতু আবর্তন এবং মৃত্যুহীন ধারাবাহিকতা।...

হাসপাতালে তখন অন্য একটা কাণ্ড ঘটছিল।

নুরু সকালেই মাকে ফ্রি বেড থেকে কেবিনে রাখার ব্যবস্থা করেছিল। সাহানা গত রাত থেকে দুবার সামান্য রক্তবমি করেছে। এতদিন পরে আজ ধরা পড়েছে, সাহানার হার্টের নীচে গুরুতর আঘাত লেগেছিল। ডাক্তার বলেছেন, খুব দুঃখিত খানসাহেব—তেমন কোন সিমটম তো দেখিইনি তখন—তাছাড়া ওখানে আঘাত লাগবেই বা কী করে? কাজেই ও নিয়ে আমরা মাথা ঘামাইনি। এখন বুঝছি, আছাড় খাবার সময় জোর ধাক্কা বা ঝাঁকুনি লেগে থাকবে হার্টে। হার্টের অবস্থাও খুব ভাল ছিল না সম্ভবত। উনি তা বলেছেনও। যাক্ গে—যদ্দুর সাধ্য, কোন ত্রুটি হবে না।

কলকাতায় কোন বড় হাসপাতালে বা নার্সিংহোমের কথাও ভেবেছিল নুরু। কিন্তু এখন যা অবস্থা—রোগীকে নড়াচড়া একেবারে বারণ। আর নিয়ে যাওয়াও মুসকিল। অনেক টাকা পয়সার দরকার। ভিসার মেয়াদ বাড়ানো চাই। ওদিকে আপিসে ছুটির ব্যাপার আছে। একটা এমারজেন্সি দপ্তরে তার চাকরী। ছুটি খুব কমই মেলে।

বিকেল থেকে ওরা তিনজনে সাহানার কাছে রয়েছেন। আফজল, নুরু আর রুবি। রুবির চেহারা আজ বিভ্রান্ত—রুক্ষ—কেমন যেন ঝড়-খাওয়া গাছের মতো হতশ্রী। লাল চোখ। কথা বলছে কম। ওরা ভেবেছেন, রুবি মায়ের জন্যে উদ্বিগ্ন। এবং সেটা তো স্বাভাবিকই। সাহানা নুরুর সৎমা—কিন্তু রুবির যে গর্ভধারিণী।

অবস্থা দেখে আফজল বলছিলেন, বরং রুবি চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে তোমার কাছে থাক সানু। কেবিনে থাকবার অসুবিধে নেই। এখানেই নাইবে-খাবে। আমি খাবার-দাবার বইব'খন।

রুবি ঘাড় নেড়ে ছোট্ট করে হুঁ বলল।

সাহানা যন্ত্রণার মধ্যে হঠাৎ একটু হাসল।…নুরু কবে যাচ্ছে?

নুরু বলল, কাল দিন-রাত্তিরটা আছি। পরশু ভোরে রওনা হব।

সাহানা চুপ করে থাকল।

রুবি বলল, আমি আর বাড়ি যাচ্ছি না বরং। আব্বা, আমার কাপড়জামা আর···

সাহানা বাধা দিলে।···হচ্ছে। বাবা নুরু!

বলো মা।

তাহলে রুবির কী হল?

তুমি যা বলবে, তাই হবে।

রুবি উৎকর্ণ। আফজল বললেন, বলবে? কী বলবে আবার? ও না হয় পেটে ধরেছিল বা সাথে করে এনেছিল। তো আমিও তো বাপ বটি। বাপের কথাটা খাটবে না? বা রে বা! তুনিয়া জুড়ে চিল শকুন উড়ছে—আমার মাথা খারাপ হয়ে যাবার দাখিল। নুরু, ওকে নিয়ে যা।

রুবি সব জানে। তাই সে না হল বিস্মিত—না করল কোন প্রশ্ন।

সাহানার শুকনো ঠোঁটে সেই হাসিটি তখনও লেগে রয়েছে। মেয়ের হাতটা টেনে বুকে রাখল। বলল, রুবি, তোকে পাকিস্তান নিয়ে যাবে বলছে। যাবি মা? কলেজে পড়ার এত সাধ—নুরু পড়াবে তোকে। আমি বলছিলাম, খোদার ইচ্ছেয় সেরে উঠি—তখন না হয় যাবি। তদ্দিন থাক। আমার মনটা তোকে ছেড়ে ছট-ফট করবে মা। এ বেমারির হালে (অসুস্থ দশায়) তুই থাকবি নে! তো···দম নিয়ে সাহানা ফের বলল, যা শুনছি—না গেলেও তুষমনের ডঙ্কায় কান তালা হয়ে যাচ্ছে।···তো মনকে বুঝ দিলাম। যা। নারাজ হস নে মা। মেয়েদের আবার বাপ মায়ের ঘর বলে কিছু থাকে তুনিয়ায়? এর মায়া যখন একদিন কাটাতেই হবে—আজই কাটুক।

আফজল বললেন, বেশি কথা বলো না। বেমার বাড়বে।

সাহানা থামল না। বলতে থাকল, তুধের বাচ্চা—বাপটা চোখ বুজল। বাপের তুঃখটা আমি বুঝতে দিলুম না। ফের বাপ পেল। অনাথ এতিম তুঃখী মেয়ে আমার—নুরু···হঠাৎ কেঁদে ফেললেন

সাহানা। তারপর অন্য হাত বাড়িয়ে নুরুর হাতটা নিল সে।... নুরু, শরীয়তের খেলাপ হবে না বাবা। আমিও সুখে চোখ বুজব গোরে গিয়ে শান্তি পাব রে সোনা! আমি—আমি রুবির মা— রুবির আসল জিম্মাদার। আর, ও-দুনিয়া থেকে সেও তাকিয়ে আছে আমার দিকে, তার সাধের মেয়ের কী গতিক আমি করি দেখবে— বাবা নুরু, ইসলামে এর বারণ নেই...

আফজল রুদ্ধশ্বাসে বললেন, সানু, সানু!

নুরু রুবির দিকে তাকিয়েই চোখ ফেরাল। রুবি লাল চোখে মায়ের দিকে তাকিয়ে আছে।

সাহানা রুবির হাতটা নুরুর হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, সঁপে দিলুম। কাজীসাহেবকে ডেকে বাকি কাজটুকু করিয়ে নাও—ওগো শুনছ? দেরী করো না!...হাঁফাতে হাঁফাতে সাহানা বলল, আজরাইল এসে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি স্পষ্ট দেখছি। ওগো ভালমানুষের ছেলে, জলদি করো। আমাকে শান্তিতে যেতে দাও।

আফজল স্তব্ধ। নিষ্পলক তাকিয়ে আছেন।

সাহানা ছটফট করতে থাকল।...যাও, দেরী করো না। আজ রাতেই লোক ডেকে কাজটা সেরে ফেলো। আজরাইল এসেছে। তোমাদের পায়ে পড়ি, জলদি যাও।

দুটি অবশ হাত আস্তে আস্তে সরে গেল যে-যার জায়গায়। নুরু উঠে দাঁড়াল। তারপর হন হন করে বেরিয়ে গেল।

সাহানা ওর চলে যাওয়া দেখে ফুঁসে উঠল।...চলে গেল নুরু কেন? আমার মেয়ে কি ওর এত অযুগ্যি? কী ভেবেছে নুরু? ওর টাকায় আমার চিকিৎসে হচ্ছে! ওষুধ খাচ্ছি! এ আমার জহর—বিষ! আমি খাবো না—

আলুথালু চুল—ওঠবার চেষ্টা করছিল সাহানা। হাঁফাচ্ছিল। আফজল আর রুবি জোর করে ওকে ধরে শুইয়ে দিলেন। ঠোঁটের ফাঁকে রক্ত দেখা গেল সাহানার। আফজল চেঁচিয়ে উঠলেন, রুবি, রুবি—ওদের খবর দে মা। ফের খুন বেরুচ্ছে!

রুবি দ্রুত উঠে গেল। দরজার বাইরে নুরু দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখল। পরস্পর তাকাল। কিন্তু কথা বলল না কেউ।

তারপর নুরু ফের আস্তে আস্তে গিয়ে ঘরে ঢুকল। সাহানার কাছে গিয়ে বসল। সাহানা ফুঁসে উঠল, আমি মরি—তোমার কী বাবা? যাও—এসো না আমার কাছে! এ্যাট্টুকুন দুধের বাচ্চা মানুষ করেছিলুম বুক দিয়ে—সে তো মনে থাকবে না আর! এখন বড় হয়েছো। এখন আমার কথার কী দাম বাবা?...সাহানাকে থামানো যাচ্ছিল না। বীভৎস দেখাচ্ছিল ওর চেহারা। দাঁতের ফাঁকে, ঠোঁটে, কষায় রক্ত। আফজল রুমালে ঠোঁট মুছিয়ে দিতে চেষ্টা করছেন। সাহানা হাতের ধাক্কায় তাঁকে নিবৃত্ত করছে।

তখন নুরু আস্তে আস্তে বলল, থামো মা, থামো। তাই হবে। তোমার ইচ্ছেই মানব। এবার থামবে?

সাহানা শান্ত হলেন। হাত বাড়িয়ে ওর গালে বুলোতে বুলোতে নিঃশব্দে কাঁদতে থাকলেন।

আর সেই সময় পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে রুবি। নুরুর কথাটা পুরো শুনেছে।

বারোয়ারীতলায় এসে হঠাৎ নুরু বলল, আব্বা, আপনি এগোন। আমি—আমরা আসছি।

আফজল বললেন, এগোব? বেশ, এগোচ্ছি। আয় রুবি।

নুরু বলল, রুবি আমার সঙ্গে যাবে। আপনি যান না।

অ বেশ।...বলে আফজল পা বাড়াতে গিয়ে ঘুরলেন। ইয়ে, কথা বলবি তো বাড়ি গে বললে হত না? পথে বলে কী দরকার? আমি তো গিয়েই কাজীসাহেবের কাছে যাবো। মসজিদে যাব। পাঁচজনকে তো বলতে-টলতে হবে। দুপুর রেতে লোকজন পাব কোথায়—এখন গিয়ে না ধরে আনলে?

নুরু বিরক্ত হয়ে বলল, আঃ। আজ রাতেই যে সব করতে হবে, তার মানে কী আছে? সে সব কালও করা যেতে পারে।

উরে ব্বাস! আফজল আঁতকে বললেন।...তোমার মাকে চেনো না বাবা। ওর যা কথা, তাই কাজ। কাল সকালে যদি শোনে, এখনও 'কাজ' হয়নি—রাগে হার্টফেল করবে।

রুবি স্তব্ধ। নুরু বলল, সে আমি দেখব'খন। আপনি বাড়ি গিয়ে বস্থন গে। যাচ্ছি আমরা।

বেশ। যা ভালো বোঝ, করো বাবা। আমি এর সাতে পাঁচে নেই বলে আফজল চলে গেলেন। আপাতত হেমনাথের বাড়ি চুপিচুপি যাবেন এবং হেমনাথকে সব বলবেন। সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। কিন্তু সাহানা কাজটা কি ভাল করল? আফজল ভাবতে ভাবতে গেলেন সারাপথ।...আমি কিন্তু এদিকটা কখনো ভাবিনি কোনদিন! হাজার হোক—স্ত্রীলোকের বুদ্ধি। বেশ নরম জায়গায় কোপ মেরেছে।

বাড়ির কাছে গিয়ে আফজল একবার দাঁড়ালেন। মনটা উসখুস করছে। কে জানে কেন, মনে হচ্ছে—এটা ঠিক হবে না। মস্তো ভুল করা হচ্ছে। রুবি আর নুরু—ছুটি ভাইবোনের মতো পরস্পরকে সারাজীবন দেখে আসছে। আমিও রুবিকে মেয়ে বলে দেখে এসেছি। এখন সে নুরুর বউ হবে—তার মানে, আমার বউবিবি। ধ্যুৎ! এ কেমনটা হল গা? সাহানা মরতে বসেছে তাই—নয়তো আম্মো তো ছেলের বাপ, ছেলের জিম্মাদার—আমারও একটা কথা খাটবে না? আমার ছেলের ভালমন্দ আমাকে দেখতে হবে না তো দেখবে তার সৎমা? ধ্যুৎ, ধ্যুৎ! হেম শুনলে হয়তো হাসবে। লোকহাসানো কাণ্ডই বটে। আরে বাবা, শরীয়তে তো কত হাজারে হাজারে আইন-কান্থন রয়েছে—কতগুলো লোকে মেনে চলছে শুনি? তাহলে তো ছুনিয়াটা বেহেশত হয়ে যেত বাবা! আসলে আমরা দরকার পড়লে শরীয়তের জিগির হাঁকি—চাল-চলনে কাজে-কর্মে ছুনিয়া-দারীতে অহরহ তার উল্টো কাজ করে থাকি। যে লোকটা

গলা চড়িয়ে চড়িয়ে বলছে, আমি মোছলমান—সেই আবার বাগে পেলে চুরি করছে, জ্বেনা (ব্যাভিচার) করছে, উঠতে বসতে বউ ঠ্যাঙাচ্ছে—এমন কি আদব-কায়দারও ধার ধারে না। ঠগ বাছতে গাঁ উজোড় হয়ে যাবে বেগম, আমাকে তুমি ওসব বুঝিও না।

তবে কী, তুমি কাল বেমারিতে রয়েছ—তোমার মুখ চেয়ে কথাটা ঠেলে ফেলা কঠিন হল। সেই সমস্যা। মুহব্বৎ আমার গলা টিপে ধরলে বেগম। ভাবলুম, মরুকগে। মানুষের সব সয়—রুবি নুরুরও এটা সয়ে যাবে। তোমার আমারও সইবে। প্রথম প্রথম খারাপ লাগবে—তারপর গাসওয়া হতে থাকবে। তারপর একদিন দুনিয়াদারীর চাপে পড়ে সব একাকার হয়ে যাবে। জিন্দেগীর (জীবন) এই তো মজা। জিন্দেগীই মানুষকে খুসিমতো বদলায়। মানুষ তার হাতের পুতুল ছাড়া কী? তার ওপর গোস্বা (ক্রুদ্ধ) হয়ে কী করব?

জীবনের দিকে খুব ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছিলেন আফজল। হ্যাঁ—তাই-ই তো! আমার জীবন কি আমার এক্তিয়ারে চলে? তার নিজের ঝোঁকে নিজের গতিতে-শক্তিতে এগিয়ে চলা। তা না হলে তো কত সাধ আশা-আকাঙ্ক্ষা ইচ্ছেমাত্র মিটে যেত মানুষের। চেষ্টা করে কে কবে জীবনকে বদলাতে পেরেছে? সে যেন একটা অন্ধ ঘোড়া—তার পিঠে তুমি সওয়ার। তুমি কখনও ভয় পাও গতির দোলায়। কখনও খুসি হয়ে ওঠ চলার পুলকে। কখনও তার পায়ের নিচে শক্ত কংক্রিটের সুগম পথ। সুন্দর দেশ। কখনও এনে ফেলে সে দুর্গম মরুভূমি কিংবা অরণ্যে! মালভূমিতে। বন্ধুরতায়। চার-দিক বৃক্ষহীন; কোথাও উষর প্রান্তর। ধূ ধূ ধুলো। ঝড়। পাথরের চাঙড়। এবং নিষ্ঠুর তৃষ্ণা। জল নেই। দু'জনেই জিভ বের করে হাঁফাতে থাকো।...

গ্রামের বাইরে হাইওয়েতে এসে নুরু ডাকল, রুবি?

উঁ?

কথাগুলো পথে বলাই ভালো। কারণ, ঘরে এসব বলা যাবে না। ঘরে গেলেই তো আমাদের সবটুকু পিছনের জীবনটা সামনে এসে দাঁড়াবে। বাধা দেবে। ঘরময় ছড়িয়ে রেখেছি আমরা হাজারটা স্মৃতি। তাকে অপমান করা—আমার পক্ষে সম্ভব হবে না রুবি। এবং আমি বুঝতে পারি, তোমার পক্ষেও সম্ভব হবে না। কারণ, আজ বিকেলঅব্দি যে খাটটায় দুজনে পাশাপাশি বসে তুমি তোমার ভবিষ্যৎ ভাবীকে নিয়ে রসিকতা করেছ, যেখানে তুমি ছিলে আমার ছোট্ট অবুঝ বোনটি, এখন সেই খাটে বসে···নাঃ, তা হয় না। অন্তত আমি তো পারতুমই না।

রুবি খুব আস্তে বলল, ওটা তোমার-আমারও হিঁদুয়ানী হতে পারে। ছেলেবেলা থেকে আমরা হিন্দুদের সাথেই মানুষ হয়েছি—হয়তো তাই।

নুরু অবাক হয়ে তাকে দেখল। রুবি কেমন চাপা হাসছে। কিন্তু, ওকি তার ব্যঙ্গ? লাইট পোষ্টটা ঢেকে আছে শিরিষ গাছের আড়ালে। এক চিলতে আবছা আলোয় দেখা ও হাসি কি স্বাভাবিক রুবির? সে কি মেনে নিতে প্রস্তুত হয়েছে তবে—এই আকস্মিক পরিণতিটাকে? নুরু ধাঁধায় আটকে গেল সে-মুহূর্তে।

তাকে চুপচাপ দেখে রুবি বলল, কী কথা আছে বলছিলে?

তুমি আমাকে আর দাদা বা নুরুভাই বলছ না?

বললে খুসি হবে? আর তুমিও তো তুই বলছ না আমাকে?

নুরু হাসবার চেষ্টা করল।···বলতে বাধো-বাধো ঠেকছে। এতদিন তোমাকে তো পূর্ণ নারী বলে টের পাইনি, আজ মা পাইয়ে দিলেন! এটা আমার সম্ভ্রমবোধ হতে পারে, রুবি।

কিসের?

তোমার নারীত্বের প্রতি।

তুমি পাকিস্তান থেকে কি এত ভাল ভাল কথা শিখে এসেছ!

রুবি, তুমি হাসতে পারছ?

পারছি।

তোমার দুঃখ হচ্ছে না? কষ্ট হচ্ছে না?

না। কেন হবে?

তুমি তো সুনন্দকেই ভালবাস, রুবি।

রুবি চমকে উঠে কয়েকমুহূর্ত ওর দিকে তাকাল। তারপর মুখ নামাল। আস্তে আস্তে ফের হাঁটতে থাকল। নির্জন হাইওয়ে। মাঝে মাঝে দু'একটা রিকসো যাতায়াত করছে। দুদিকে অজস্র গাছপালা—কিন্তু কোন লোকজন দেখা যাচ্ছে না। আলোর এলাকা শেষ হল। অন্ধকারের মধ্যে ওরা একটু দাঁড়াল। দুজনেই পরস্পরকে চেনার চেষ্টা করল। তারপর নুরু বলল, চল—ওই ব্রীজটার ওপর গিয়ে বসি।

সামান্য তফাৎ রেখে ওরা বসল। ব্রীজের দুধারে কোন গাছ নেই বলে অন্ধকার এখানে ঘন নয়। মাথার ওপর আকাশ। নক্ষত্রময় বিশালতা। রুবি দুহাত ভর করে বুক চিতিয়ে আকাশ দেখছিল। নুরু বলল, তুমি যদি কথাটায় রাগ করো, তাহলে বলব, তোমার মধ্যে এখনও অনেক দীনতা আছে। এখনও তোমার মনকে তুমি বুঝতে পারোনি। কিংবা নিজের সঙ্গে বিশ্রী লুকোচুরি খেলছ। রুবি?

উঁ?

ভালবাসাকে আমি শ্রদ্ধা করি। না—এটা কোন পাপ নয়। এটা মানুষের কোন ছলনা নয়—এটা একটা ভয়ঙ্কর সত্য। তবে সবার জীবনে এ জিনিসের দেখা মেলে না। তাদের দুর্ভাগ্য রুবি। যাদের জীবনে ভালবাসা ঘটে যায়, তারা ছাড়া এর স্বরূপ কেউ টের পায় না। অন্যেরা নাক কুঁচকে বলে—ও, প্রেম? সে তো নিছক সেক্সের ব্যাপার! অমুকে-অমুকে প্রেম করছে? সে তো তাহলে একটা সেক্সুয়েল এ্যাডজাস্টমেণ্ট? তারা মূর্খ। মানি, সেক্স ছাড়া প্রেম সোনার পাথুরবাটি। কিন্তু প্রেম ভালবাসা কখনো শুধু সেক্স নয়। এটা মানুষের আদিম জীবনেও ছিল—আজও আছে। এ খুব রহস্যময় ব্যাপার। আমার মাথাকে গোলমাল করে দ্যায়। সাইকলজি বলে, এ নাকি কোন কমপ্লেক্স। ভালবাসার পাত্রপাত্রী বাবা-মায়ের চরিত্রের আদলে মিলে গেলেই নাকি...বোগাস।

রুবি একটু হেসে বলল, তুমি প্রেম করেছ নিশ্চয় !

নুরু অবাক হল না। কারণ, বস্তুত এসব সময়েরই একটা অনিবার্য ফসল—যা ওরা কুড়োবার জন্যে একই জমিতে নামতে বাধ্য হয়েছে। নুরু হাসল।···কে জানে ! আমার কথা থাক্। আমি তোমার কথা শুনতে চাই রুবি। আমি তো জানি, তুমি চাপা মেয়ে ছিলে—কিন্তু তোমার সে ছিল এতদিন একটা সঞ্চয়ের লম্বা মরশুম। জীবনের অনেকখানি তুমি এরই মধ্যে চিনে ফেলেছ। ওটা তোমাকে দেখেই টের পেয়েছি। এখন, আমার কথার জবাব দাও। খুব ভেবে জবাব দেবে কিন্তু। সমস্যাটা মোটেও সহজ নয়।

কী জবাব দেব ?

তুমি কি সুনন্দকে ভালবাস ? সত্যি সত্যি ? নাকি তোমার কোন ক্ষণিক খেয়াল ?

রুবি স্তব্ধ।

ভেবে জবাব দেবে, বলেছি। তুমি ভাবো—ততক্ষণে আমি সিগ্রেট খেয়ে নিই। ···নুরু সিগ্রেট জ্বালাল। নিঃশব্দে টানতে থাকল।

একটা ট্রাক উজ্জ্বল আলো ফেলে আসছিল। গাছের ছায়াগুলো সাঁৎ সাঁৎ করে সরে যাচ্ছিল মাঠের দিকে। ট্রাকটা চলে যাবার পর রুবি বলল, আমি কিছু ভেবে দেখিনি।

কী ?

কাকে ভালবাসি, না বাসিনে।

আমার কাছে লজ্জা করো না রুবি। তোমার কোন ভয় নেই। আমাকে কি তুমি চেনো না ? আমি একটুও বদলাই নি। তুমি খুলে বলো।

রুবি স্তব্ধ।

রুবি, তাহলে জানব, তোমার মধ্যে ফাঁকি আছে। তুমি স্বার্থপর হয়ে গেছ।

জোর করে একটা বলিয়ে নিতে চেষ্টা করছ তো ?

মোটেও না।

তোমার যদি এত বিশ্বাস যে আমি ওকে ভালবাসি, তাহলে আর জিগ্যেস করছ কেন?

রুবি! ছিঃ! কেঁদো না।

না, কাঁদব কেন? আমি কাঁদতে পারিনে।

শুধু তোমার মুখ দিয়ে শুনতে চাই—তুমি ওকে ভালবাস কি না।

শুনলে কী করবে?

সে আমার ব্যাপার।

তাহলে মায়ের কথাটা রাখবে কিংবা রাখবে না—এই ব্যাপার তো?

হয়তো।

রুবি একটু চুপ করে থেকে বলল, বেশ। বলছি। আমি সুনন্দকে ভা-ভালবাসি।

নুরু হেসে উঠল।···তবু গলাটা কাঁপল? ভীতু কোথাকার!

বলো, এবার কী বলতে চাও।

রুবি! ফের তুমি কাঁদছ?

না।

তুমি কাঁদছ!

না না না। আমি কাঁদি নি।

চলো, ফেরা যাক্। ওঠ।

রুবি উঠল না। নুরু ওর হাত ধরে টানতেই সে হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে ওর পা দুটো জড়িয়ে ধরল। কান্না-ভেজা গলায় বলে উঠল, নুরু ভাই, তুমি আমাকে বাঁচাও। তোমার পায়ে ধরে বলছি—আমাকে তুমি মেরে ফেলো না। তোমাকে আমি বড় ভাই বলে চিরদিন জেনে আসছি—কেমন করে···

নুরু ওর মুখে হাত চাপা দিল।·· রুবি, রুবি! ছিঃ! কী ভেবেছিস তুই আমাকে? তুই আমার বোনই আছিস। ওঠ, কেউ দেখলে কী ভাববে।

ওরা ফিরে আসছিল। নিঃশব্দে।

বারোয়ারিতলায় পৌঁছে নুরু মুখ খুলল। তুই কষ্ট পাবি রুবি। ঠিক বলতে পারিনে—তবে আমার মন বলছে রে! সুনন্দকে আমি জানি। ওর মধ্যে সংস্কার নেই, সাহসও আছে—কিন্তু ওর মধ্যে আবার ছাপোষা সংসারী ভাবও বড্ড বেশি। সেইটেই খুব ভয়ের কথা। তাছাড়া—ওর পাস করে বেরোন, চাকরী-বাকরী—তারপর··· সে ঢের দেরী। ততদিন কি তার টান টিকবে? অবশ্য আমি এখনও জানিনে, সে তোকে ভালবাসে কি না। তোর কী মনে হয় রে? সে তোকে সত্যি সত্যি ভালবাসে?

রুবি খুব আস্তে বলল, আমি কেমন করে বলব?

না—মানে, তোর কী মনে হয়?

কিছু মনে হয় না। তুমি অন্য কথা বলো নুরুভাই।

নুরুভাই বলছিস যে। দাদা নয় কেন?

এত হিসেব করে কিছু বলতে পারি নে।

হ্যাঁ রে, রুবি! তাহলে ফের আমরা নিরাপদে ভাইবোন হয়ে গেলুম। কেমন?

এতক্ষণে রুবির মুখে হাসি ফুটল। সে বলল, বাড়ি গিয়ে হয়তো দেখবে—আব্বা কাজীকে নিয়ে উঠোনে বিয়ের মজলিস বসিয়েছে। সামলাবে কী করে?

তুই বসে মজা দেখিস না? কী করি! নুরু হাসতে লাগল।

তারপর মাকে কী বলবে?

এ যুগে অতখানি পিতৃমাতৃভক্ত না হলেও চলে রে। ওঁরা সব ওঁদের যুগের ধারণা দিয়ে আমাদের চালাতে চান। বাস্তবে তা তো কখনো হয় না। সময়ের মজাটাই এই। এক যুগের শাসন-কানুন পরের যুগে কাজ দেয় না। বুঝতে পারলি? মা মনে কষ্ট পাবেন—এই তো? সে বরং কিছু মিথ্যে বলে এড়িয়ে যাওয়া যাবে।

রুবি বলতে যাচ্ছিল, মা এমন মানুষ—যা মাথায় আসবে···

কিন্তু পাশেই সাইকেল থেকে নেমেছে হাসপাতালের চাঁদঘড়ি জমাদার।···এই যে মিয়াদিদি—যাচ্ছিলুম আপনাদের বাড়িই।···

মিয়াদাদা যে ! কবে এলেন গো ? আদাব, আদাব। খবর ভালো তো ?

নুরু বলল, কী ব্যাপার ?

চাঁদঘড়ি বলল, ডাক্তার বোসবাবু আসতে বললেন। আপনার মায়ের অবস্থা ভাল না। মেয়ের নাম করছেন বারে বারে। তাই…

রুবি ঘুরল। নুরুও।

সাহানা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল, তখন রাত বারোটা। কোন কথাই বলতে পারেনি। আফজল যখন পৌছলেন, তখন সাহানার লাসটা বিছানায় স্থির হয়ে আছে। এলিয়ে-পড়া কালো চুলের মধ্যে ধবধবে একটা মুখ—এত সুন্দর দেখাচ্ছিল সাহানাকে ! সে-মুহূর্তে রুবিকে তার পাশে দেখাচ্ছিল যমজ বোনের মতো। এবং মৃত্যুর পর যে মানুষকে সুন্দরতর দ্যাখায়, সে নাকি জীবনের পরম তৃপ্তিটিকে সাথে নিয়ে চলে যেতে পেরেছে। সাহানা তৃপ্ত। কিন্তু সে-তৃপ্তিটি কিসের ? নুরু রুবিকে গ্রহণ করেছে—তাই ?

সেও তো কথা। নুরুর মতো ছেলের কাছে রুবিকে গছাতে পেরে সাহানা স্বভাবতই সুখী হবে। নুরু রুবিকে এত বুঝতে পারে—এত স্নেহ করে ! অন্যে কি অমন করে বুঝবে—না দেখবে ? সেখানে সম্পর্কটা তো নিছক স্বার্থের। ঘরকন্না করা, দুনিয়াদারি, বাচ্চা বিয়োন, দেহের সুখ দেওয়া !

সকালেই দাফন-কাফন (মৃতের স্নান এবং পোশাক পরানো) হয়ে গেল। লাস যখন কবরে নিয়ে গেল, পিছনে—কিছু তফাতে হেমনাথ যাচ্ছিলেন। গোরস্থান যতক্ষণ জানাজা পড়া (মৃতের জন্যে প্রার্থনা) হল, তিনি চুপচাপ একপ্রান্তে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকলেন। সবাই চলে গেলে তারপর আফজল এলেন তাঁর কাছে। ডাকলেন, হেম, এসেছ ?

হেমনাথ ওঁর কাঁধে হাত রাখলেন। সহ্য করো ফজু। সতী-লক্ষ্মী বেহশতে তোমার জন্যে অপেক্ষা করবেন।

তাছাড়া আর বলার কী-ই বা ছিল! কিন্তু এতক্ষণে আফজল আর পারলেন না—প্রচণ্ড শোকের বিস্ফোরণ ঘটল। দুহাতে জড়িয়ে ধরে বুকে মাথা ভাঙছিলেন আফজল।

আর হেমনাথ ভালই জানেন—এই লোকটির মধ্যে বরাবর একটি শিশু বেঁচে রয়েছে। তাকে এত ভাল লাগে বলেই তো যত সমস্যা।

ঘরে রুবির পাশে ঝুনু। প্রভাময়ী আগাগোড়া উঠোনে দাঁড়িয়ে ছিল। তারপর বারান্দায় উঠেছিল। দরজায় গিয়ে কপাটে হাত রেখে কিছু সান্ত্বনা দিয়েছিল রুবিকে। এবং চলে আসবার সময় ইঁদারাতলার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ হু হু করে কেঁদে ফেলেছিল।

খিড়কির বাইরে সরু পথের ওপর কাঁটার বোঝাটা আজ ভোবে নিজেই সরিয়ে দিয়েছিল প্রভা।

এক সময় নুরু গোরস্থান থেকে একা ফিরে এল। বারান্দায় গিয়ে চুপচাপ বসে রইল। সেই সময় এল সুনন্দ। নুরু ডাকল, আয়। বোস।

সুনন্দ বলল, কাল থেকে ছিলুম না। এইমাত্র এসে সব শুনলুম। তুই এসেছিস, শুনেছিলুম—কিন্তু···হ্যাঁ রে, ওরা প্রথমে ডায়গোনেসিস করতেই পারে নি—না?

নুরু বলল, বোস। সিগ্রেট খা। তোকে খুঁজছিলুম।

চৌদ্দ

আকবর চড়া গলায় ডাকছিল, কবীর, এই কবীর!

কবীর দোতলার জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে বলল, কী রে

নেমে আয়। কথা আছে। শিগগির!

নিচের ঘরের দরজা খুলে কবীর বলল, আয়।

না—শোন।

আকবরের কণ্ঠস্বরে কী ছিল, কবীর উদ্বিগ্ন মুখে নেমে এল। সামনের বটগাছটার নিচে গিয়ে দাঁড়াল দুজনে। কবীর বলল, কী ব্যাপার?

কাল সন্ধ্যায় তোকে দীপুরা মেরেছে?

কবীর চমকে উঠল।...আরে না, না। মারবে কেন? এমনি —সামান্য তর্কাতর্কি হয়েছিল। তারপর সুনীল, মৃগেন, লঙ্কাদা এসে গেল। মিটিয়ে দিল। যাঃ, তেমন কিছু নয়।

লুকোস নে কবীর। আমি সব শুনেছি। যখন তুই খেলার মাঠে এলি, ঝুনু তোর সঙ্গে ছিল? সত্যি বলবি।

কবীর নার্ভাস হয়ে বলল, ছিল। বারণ করলুম—ওখানে দীপুরা আছে—আমার সঙ্গে দেখলে ক্ষেপে যাবে। ঝুনু শুনল না। তারপর...

আকবর ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলল, তারপর?

খেলার মাঠের ধারে আমি বসলুম। ঝুনুও কাছে বসল। তখন দীপুরা সব খেলা শেষ করে জটলা করছিল। বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। উঠতে যাচ্ছি—হঠাৎ দীপু, রত্নেশ, কাজল আরো ক'জন এসে জাত তুলে গাল দিতে লাগল।

ঝুনু কিছু বললে না?

হ্যাঁ—ওর মুখ তো জানিস। ভীষণ প্রতিবাদ করল। তখন ওরা তাকে কুৎসিত কথা বলতে লাগল।

তারপর, তারপর?

আমি বললুম, ওকে যা তা বলছ কেন? আমাকে যা বলার বলো! হঠাৎ দীপু আমার কলার ধরে মাথায় ঘুঁষি মেরে বসল।

আর তুই শালা মার খেয়ে গেলি!

আরে না! শোন না! আমিও ঘুঁষি মারলুম—কিন্তু ওরা দলে বেশি। তাছাড়া সঙ্গে সাইকেল আছে। ওদিকে ঝুনু চেঁচিয়ে তখন সুনীলকে ডাকতে লেগেছে। মাঠের ওদিক থেকে সঙ্গে সঙ্গে

ওরা এসে গেল। লঙ্কাদাকে তো জানিস! কবীর হেসে ফেলল। ...ভয়ে ওরা শাসাতে-শাসাতে পালিয়ে গেল। সামান্য ব্যাপার!

সামান্য ব্যাপার? জাত তুলে গাল দেবে, সামান্য ব্যাপার?

...আকবর ফুঁসে উঠল। কই, সুনীল-মঞ্জুকে নিয়ে মাথা কারো খারাপ হয় না। তুই মুসলমান বলে...

কবীর বলল, আকবর! প্লীজ, তুই এটা কম্যুনাল বলে নিসনে।

আকবর গর্জে উঠল। শালা—এর নাম ইণ্ডিয়া। ভারতবর্ষ। সেকুলার রাষ্ট্র। হিন্দুর যেমন অধিকার, মুসলমানেরও তেমনি অধিকার। সব শালা খাজনা দিয়ে বাস করি। কী ভেবেছে রে ওরা? আয়, আমার সঙ্গে!

কবীর বলল, আঃ আকবর! ভুলে যাস নে—সুনীল, লঙ্কাদারাও ছিল—তারা আমার হয়ে ওদের বকেছে!

ওটা মুখেই! নেহাৎ তুই রবিয়ুল কাজীর ছেলে—তাই। তুই সুনীল হলে লঙ্কা কী করত ভেবে দেখেছিস? সবকটাকে স্ট্যাব করে খুনের বান ডাকাত না?

প্লীজ, প্লীজ আকবর! এটা রটলে ঝুনুর ক্ষতি হবে।

আরে যা যা! ক্ষতি হবে বলে জাতের অপমান সইতে হবে নাকি?

না, আকবর। তুই যা।

তাহলে তুই যাবি নে?

কবীর গোঁ ধরে বলল, না।

ঠিক আছে। বলে আকবর সাইকেল চেপে বোঁও করে চলে গেল।

কবীর দুঃখিত মনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর বাড়ি ঢুকল। ওপরের ঘরে গিয়ে অভ্যাসমত চিৎ হয়ে শুল সে। এমুহূর্তে যদি মহাকাশযাত্রী হওয়া যেত, কত সুখেরই না হত! পৃথিবীটা ভুল মানুষে ভুল ব্যাপারে ভুল কথাবার্তায় দিনে দিনে ভরে উঠছে। শ্বাসরোধকর অবস্থা। ভাবতে গেলে মাথা খারাপ হয়ে যায়।

এই একটা মুহূর্তের কথা যদি ধরি—এইমাত্র কত লক্ষ লক্ষ জন্ম ঘটল, মৃত্যু ঘটল। কাদের মধ্যে ভালবাসা জাগল, কাদের ভাল-বাসার বাতিগুলো গেল নিভে। হয়তো এই মুহূর্তেই কে কোথায় কার গলাটা পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে কাটছে—হয়তো ঠিক এখনই কার সময় হয়েছে বলার—তোমাকে ভালবাসি! আশ্চর্য, অদ্ভুত, বিচিত্র। এক-একটা মুহূর্তের মধ্যে লক্ষ লক্ষ ঘটনা—লক্ষ ভাবনার মালা গাঁথা। এই গভীর রহস্য আর সম্ভাবনা আর সত্য আর বাস্তবতা আর মায়া নিয়ে যার অস্তিত্ব—তার নাম সময়। সে একটি গতি। তবে বের্গসঁ থাক—আইনস্টাইন বলেছেন—সময় চিরবর্তমান। ছিল—আছে—থাকবে বলে আপেক্ষিক হিসেব মানুষের কাছে দরকারী—তার জীবনের জন্যে বা স্মৃতির জন্যে জরুরী; কিন্তু আসলে—সবই 'আছে।' কল্পনা করা যেতে পারে একই সময়রেখায় দাঁড়িয়ে আদিম মানুষ আর আজকের সভ্য মানুষ ঘর-গেরস্থালী করছে। ভাবতে পারো তুমি? একালের বিজ্ঞানী বলছেন—সময়ের বাস্তব অস্তিত্ব আছে। আছে বইকি। অনুভূতি দিয়ে তাকে পাওয়া যায়। এদিক থেকে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের অনেক সিদ্ধান্তে চমকে যেতে হয়! কোটি-কল্প-কল্পান্ত যুগের কথাও ঋষিরা ভেবেছিলেন! সময়ের ওই বিশালতাময় ব্যাপ্তির ধারণা তো মানুষের চেতনাতেই বাস্তব ব্যবহার ব্যতিরেকে ধরা পড়েছিল! হ্যাঁ, অনুভূতির জানালা দিয়েও সত্যের আলো এসে পৌঁছতে পারে। প্রাচীন হিন্দুরা এ ব্যাপারে অসম্ভব বুদ্ধিমান। ...আকবর—আকবরটা হঠাৎ অত ক্ষেপল কেন? রুবির প্রতিক্রিয়া? সে হিন্দুকে ভালবাসে বলে ওর হিন্দুদের ওপর এত রাগ? সাইকলজি এর ব্যাখ্যা দিতে এখনও পারছে না। এখনও এ বিদ্যাটা অনেকখানি অপজ্ঞানের বুড়ি ছুঁয়ে ঘুরছে। মন অংকের নিয়ম মানে না। রোবোট সবকিছুই করতে পারুক, হাসতে পারবে কি? হুঁঃ হুঁঃ হুঁ! আকবর একটা আস্ত রোবোট। কতকগুলো ছকবাঁধা অভ্যাসে বন্দী। কাণ্ট বলেছেন, আমাদের মনে কতকগুলো বস্তুনিরপেক্ষ ছাঁচ আছে—আমরা যা-কিছুই

দেখি বা জানি অর্থাৎ আমাদের জ্ঞান ওই ছাঁচের মধ্যেই রূপ নেয়। কাজেই প্রকৃত বাস্তবতা বা থিং-ইন-ইটসেলফ্ মানুষের চেতনার পক্ষে দুর্জ্ঞেয়!...মরুকগে! আরে! সেই কবিতাটা পুরো লিখিনি যে! একটা লাইন মাথায় এল। অসম্ভব 'দুর্জ্ঞেয় শব্দটার অনুষঙ্গে—সো দিস ইজ কল্‌ড্ দি এ্যাসোসিয়েশন অফ আইডিয়াজ—সরি—এসোসিয়েশন অফ ওয়ার্ডস! শব্দব্রহ্ম। উঃ, ভাবা যায়! ভারতীয়রা সে যুগে কী সব ভাবতেন! দূর ছাই! আমিও তো ভারতীয়। পূর্ববাংলার বদরুদ্দীনের ওমরের 'সংস্কৃতির সঙ্কট' বইটা কী সাংঘাতিক! 'বাঙালী মুসলমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন' চ্যাপটারটা দারুণ! হ্যাটস্ অফ বদরুদ্দীন সায়েব! ভাগ্যিস বইটা সেবারে নুরুভাই এনেছিল। নুরুভাইটা পাকিস্তানে গিয়েই এত বাঙালী হয়ে গেছে সম্ভবত। বাঙালী! মুসলমানকে হিন্দুরা বাঙালী বলে না কুসুমগঞ্জে। অথচ আমি—আমি তো হাড়ে হাড়ে বাঙালী। বাংলাদেশের...এই রে! লাইনটা গুলিয়ে গেল যে! কী এসেছিল যেন—হ্যাঁ, 'লাইন আসে,' কোন কবি কোথায় যেন ব্যাপারটা লিখেছিলেন! আচ্ছা, এত যে কবিতা পাঠাচ্ছি, ওরা ছাপছে না কেন? মুসলমান বলে? উঁহু! কলকাতায় রায়ট হোক আর যাই হোক, সাহিত্যে কোন হিন্দু মুসলমান নেই। এক ধরনের রাজনীতি ব্যাপারটা বাধিয়ে ছায়। মনের ভিতর থেকে খুঁচিয়ে ধর্মটাকে জাগায়—খাঁচায় গুঁতিয়ে সিংহ বের করার মতো। বাপ্‌স্, ধর্ম জিনিসটে কী ভয়ানক! তাই ভারি দুঃখ হয়, ভারতবর্ষে এমন কেউ তেজী পুরুষ নেই—যে গর্জে সবাইকে চুপ করিয়ে ছায়—ধর্ম সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার! খবর্দার, কেউ এ নিয়ে গোঁজিও না। একটা শক্ত মানুষ দরকার ছিল। হ্যাঁ—সুভাষ চন্দ্রের মতো। অবশ্য নেহেরু—না, নেহেরু খুব বেশি কালচার্ড মানুষ, কাজেই ভীতু, দোনামনা করেই মারা গেলেন! রাজনীতি দুধ দিয়ে পোষা সাপের মতো—পাকা বেদে না হলে তার হাতেই মৃত্যু ঘটে। আমার কি রাজনীতি করা উচিত হচ্ছে?

আমার মধ্যে ভীষণ দোনামনা ভাব আছে। ঝুনু বলে। আরে! একবার নুরুভাইয়ের সঙ্গে দেখা করে আসা দরকার ছিল। তাছাড়া ওদের এই বিপদ গেল। যাই, উঠে পড়ি।

পায়ে চটি গলিয়ে নেমে এল কবীর। নুরুদের বাড়ি আজ শোকের ঝড় বইছে। এই একটা মুসকিল! কিছু শোক প্রকাশ করতেই হবে। অবশ্য রুবির মা চমৎকার মানুষ ছিলেন। বেচারা হঠাৎ মারা গিয়ে কী কষ্টে ফেললেন রুবিকে!

কিন্তু বাইরে গিয়ে কবীর মতলব বদলাল। ধুর! গিয়ে কী হবে? তার চেয়ে···

কথা বলতে বলতে নুরু হঠাৎ গলা চড়িয়ে ডাকল, ঝুনু! শুনে যাও তো।

ঝুনু বেরিয়ে বলল, ডাকছ নুরুদা?

হ্যাঁ, আয়। আমরা গল্প করি।···বলে নুরু একটু হাসল সুনন্দর দিকে তাকিয়ে।

ঝুনু কাছে এসে দাঁড়াল।

নুরু বলল, মোড়াটা আন—ঘরে রয়েছে। এনে আরাম করে বোস। তারপর সুনন্দকে বলল, সুনু—ছাখ তো রুবি কী করছে! তুই ওকে একটু বললে-টললে মনে জোর পাবে। যা শীগগির!

সুনন্দ ভিজে চোখ দুটো মুছে বলল, আমি—যাব?

ঝুনু মোড়া আনতে আনতে একটু হাসল মাত্র।

নুরু ধমক দিল, যা না বাবা। তোরাই এ বাড়ির সুখে-দুঃখে চিরকাল সঙ্গে সঙ্গে থেকেছিস! আজ পর ভাবছিস কেন? যা।

সুনন্দ আস্তে আস্তে চলে গেল। রুবির ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত করল সে। দেখল, রুবি উবুড় হয়ে শুয়ে আছে। সে ফের নুরুর দিকে একবার তাকিয়ে মরীয়া হয়ে ঘরে ঢুকল। ডাকল, রুবি!

রুবি চমকে উঠেছিল। কিন্তু ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে যেমন শুয়ে ছিল, তেমনি থাকল। তারপর বলল, সান্ত্বনা দিতে এসেছ সুনুদা? দরকার হবে না—কারণ, নেবার জায়গা নেই। কুসুমগঞ্জের সবাই মিলে অত বেশি সান্ত্বনা দিলে আমাকেও মায়ের কবরে ঢুকতে হবে।

সুনন্দ বসল না—দাঁড়িয়ে রইল। বলল, আজ তোমার রাগ করতে নেই রুবি।

রুবি কিছু বলল না। তার পিঠটা সামান্য কাঁপল।

সুনন্দ একটু এগোল। একবার ভাবল—ঠিক সতর্কতা নয়, হয়তো আড়ষ্টতা—বিপত্তির সংশয়, তবু আজ ভিতরের চাপা আবেগটুকু বেরিয়ে আসার জন্য ছটফট করছে এবং একটি মৃত্যু তাকে এই সুযোগটা দিয়েছে—সে হাত বাড়িয়ে ছুঁল রুবির কাঁধটা। তারপর বলল, যে যাই বলুক রুবি—আমি যা ছিলুম, তাই আছি। অন্তত তোমার কাছে না থাকি, মাসিমার কাছে তো ছিলুমই। তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। কেন তোমাকে সান্ত্বনা দেব? বরং তোমার কাছেই আজ সান্ত্বনা পেতে এসেছি।...সুনন্দর চোখ ভিজে গেল। সে ধরা গলায় আরও বলল, নুরুর কাছে শুনলুম—মরার সময় মাসিমা বারবার আমার নাম করছিলেন। জানিনে, নিজের মা মারা গেলে আমি কতখানি সইতে পারব—মাসিমা আমাকে সত্যি সত্যি অনাথ করে গেলেন।

রুবি মুখ ফেরাল না। বলল, কাল দুপুরে যখন খাবার দিতে গেলুম, মা তোমার কথা জিগ্যেস করছিল। বলছিল, ও তো এল না একবার! ছেলেটাকে কদ্দিন দেখিনি—বড় সাধ হচ্ছে দেখতে।

সুনন্দ মুখ নামিয়ে বলল, কাল থেকে বাইরে ছিলুম—এইমাত্র ফিরেছি। কিন্তু সত্যি এ আমার অপরাধ রুবি। দেখতে যাওয়া আমার উচিত ছিল। পারিনি—ভয় হত—পাছে মাসিমা আমাকে ঘৃণা করেন।

রুবি একটু চুপ করে থেকে বলল, আচ্ছা সুনুদা, মা আমাকে এত ভালবাসত—শুধু ভালবাসত বলে নয়—সে তো আমারই মা!

লবেলা থেকে এ্যাদ্দিন ধরে তাকে মনে হত, আমার পায়ের নিচের
ট—হয়তো সবারই এরকম মনে হয়। অথচ কাল সন্ধ্যায়—
ং দেখলুম, মাকে আমি ঘৃণা করছি—ঘৃণা করেই এসেছি জ্ঞান
য়াঅব্দি। আশ্চর্য লাগল। পায়ের মাটিটা হঠাৎ সরে গেল
। আমার কী মনে হল জানো? আসলে কোনদিনই পায়ের
 মাটি ছিল না আমার—ওটা একটা ভুল অভ্যাস। নিছক ধরে
ছিলুম, যে আমি দিব্যি দাঁড়িয়ে আছি। অথচ কাল সন্ধ্যার
জানলুম, আমি চিরদিন ভেসে বেড়াচ্ছি শূন্যে। আমার কেউ
না—আমিও হয়তো কারো ছিলুম না। বিশ্বাস করো সুনুদা—
তো আমাকে ভাবুক মেয়ে বলতে—এ কি আমার মিথ্যে
? মা আমার শত্রু ছিল—সবচেয়ে বড় শত্রু।

সুনন্দ অবাক হল।...ছিঃ রুবি! ওঁর আত্মা কষ্ট পাবেন একথা
ল। কেন তোমার মা তোমার শত্রু হবে? তা কি কেউ হয়?
াড়া—

রুবি বাধা দিয়ে উত্তেজিত স্বরে বলল, তুমি টের পাওনি, তাই।
ীর সব মা স্বার্থপর—সব মা তার মেয়ের সঙ্গে শত্রুতা করে।
নিজেদের মনের সাজানো বাগানে মেয়েকে মালী বসিয়ে রেখে
চায়। কোন মেয়ে যেন মা হতে না চায়। আমি—আমি
দিন মা হবো না, তুমি দেখে নিও!

নন্দ ওর কাঁধে মৃদু চাপ দিয়ে বলল, চুপ করো রুবি। ছিঃ,
বলতে নেই।

বি বালিশে গাল রেখে মুখটা ওপাশে ফিরিয়ে রইল। তার
 জল চুইয়ে পড়ছিল। আস্তে আস্তে বলল, তবে একটা
মা হয়তো শিখিয়ে দিয়ে গেল। যাকে মেয়েরা ভালবাসে
চেয়েও মহৎ মানুষ দুনিয়ায় আছে। থাকে। দাদার কথাই

, সুরু খুব ভালো। সুরুকে আমি বরাবর শ্রদ্ধা করি।
বি কান্নার মধ্যে হাসবার চেষ্টা করল। আচ্ছা, তুমিই বলতো

সুনুদা—মহৎ মানুষকে শ্রদ্ধা করা যায়, ভালবাসা যায় নাকি? মেয়েরা কি পারে? কিংবা কেউ যদি বলে—ওই লোকটা মহৎ আমিও জানি সে মহৎ—ওকে ভালোবাসো—বলো, ভালবাসা সম্ভব?

সুনন্দ চমকে উঠেছিল। বলল, কী বলছ, বুঝতে পারছিনে। তবে শুনেছি, শ্রদ্ধা থেকেই নাকি ভালবাসা আসে।

মিথ্যে, মিথ্যে! রুবি ফুঁসে উঠল।…আমি তো জানি! যাকে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করি, তাকেই আমি ভালবাসি। যাকে ভালবাসিনে, তার ওপর ঘৃণা হয় না—তার আদিখ্যেতা দেখলে রাগ হয়। দুঃখ হয়। করুণা করতে ইচ্ছে করে।

সুনন্দ একটু ঝুঁকে বলল, রুবি—খুলে বলবে কথাটা?

দাদার কাছে শুনে নিও।

তুমি বলবে না?

পারতুম। কিন্তু মায়ের কথা মনে পড়বে। সইতে পারব না। খুব কষ্ট হবে, সুনুদা।

রুবি, এ সুযোগ হয়তো আর পাব না—একটা কথা জানতে ইচ্ছে করে। বলবে?

কী?

তুমি কি মুরুর সঙ্গে পাকিস্তানে চলে যাবে?

যাব, বলে সুনন্দাকে চুপচাপ দেখে রুবি এদিকে মুখ ফেরাল। ফের বলল, তারপর?

এমনি জিগ্যেস করলুম।

রুবি আস্তে বলল, গেলে তো তুমি আটকাতে পারবে না।

সুনন্দ বলল, না—পারব না, রুবি। তবে হয়তো…

রুবি ওর চোখের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে বলল, কী?

অপেক্ষা করব।

না।

কেন না রুবি?

তুমি এসো, সুনুদা। আমি একলা থাকতে চাই।

রুবি!

বলো।

আর তোমার সাথে আমার দেখা হবে না—হতে পারে না?

কেন?

আমার প্রশ্নটার জবাব দাও রুবি।

জানি না।

আচ্ছা।...বলে সুনন্দ উঠে দাঁড়াল। বেরিয়ে এল। বাইরে ঝুনুর সাথে মুরু তখনও কথা বলছে।

সুনন্দ মুরুর দিকে তাকিয়ে বলল, আসি মুরু। পরে দেখা হবে। আজ আছিস তো?

মুরু মাথা দোলাল শুধু।

এখানেই আমার কাহিনীর শেষ।

প্রাজ্ঞ পাঠিকা, আপনি কি ক্ষুব্ধ হলেন? মনঃপূত হল না এই পরিণতি? আমি দুঃখিত। জীবনের বাস্তব কথাগুলো মেনে নেওয়াই উচিত। প্রেমিক-প্রেমিকাদের মিলন হওয়া ভালো—তাদের সুখের ঘরকন্নায় আমাদের মনও সুখে ভরে ওঠে। কিন্তু তাহলে তো জীবনের প্রতি মিথ্যাচার করা হয়—অন্তত যে জীবনের কাহিনী আমি আপনাকে এইমাত্র শোনালাম। না—এই বিচ্ছেদের পিছনে কোন হিন্দু-মুসলমান ব্যাপার নেই। আমার এক হিন্দু বন্ধু পরমেশ খাঁটি হিন্দু মেয়ে শুভ্রাকে ভালবাসত। শুভ্রাও ভালবাসত তাকে। কিন্তু পরে জানলাম, শুভ্রা বিয়ে করেছে কোন কেন্দ্রীয় সরকারের বড় অফিসারকে। আর পরমেশ—সে এক অধ্যাপকের মেয়েকে বিয়ে করে দিব্যি সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করছে। স্মৃতির কষ্ট? পাগল! স্মৃতি নিয়ে থাকলে তো এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকাই যায় না!

অবশ্য একটা উপসংহার আমি দিতে পারি।

কবীর এখন ক্যানাডায় এঞ্জিনিয়ার। ঝর্ণা মফঃস্বলের এক স্কুলে দিদিমণি। সুনন্দর বরাতটা মন্দ। অনেককাল চাকরীবাকরী জোটাতে পারে নি। শুনে হাসবেন না—সে এখন অগত্যা এক রাজনৈতিক দলের মফঃস্বলী নেতা। পুরোদমে রাজনীতি নিয়ে আছে। সে পৃথিবীটা বদলে দিতে চায়।

আর রুবি?

আপনার যদি কোনদিন করাচী যাবার দরকার হয়—কলকাতা থেকে বোম্বে হয়ে করাচী—পাকিস্তান এয়ার লাইনসের কোন প্লেনে হয়তো বা দীর্ঘাঙ্গী, ফরসা, অসম্ভব সুন্দর এবং ববছাঁট চুল কোন এয়ার হোস্টেস আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। হ্যাঁ—সেই মিস্ রুবি খান। সে বলেছিল, আমি কোনদিনও মা হবো না। সেকথা রেখেছে সে।

ওদের মনে সেই নিষিদ্ধ প্রান্তরে ছোটাছুটির স্মৃতি এখনও কতখানি টিকে আছে আমি জানিনে। তবে—হয়তো বা—স্মৃতি দুর্মর। আমি না টের পেলেও সে হয়তো থাকে। সে হয়তো আছে। কিন্তু তাতে তো কিছু আসে যায় না!